
জয়দীপ চক্রবর্তী
অশরীরী
প্রহরী

অশরীরী প্রহরী

জ য় দী প চ ক্র ব র্তী

অশরীরী প্রহরী



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ রঞ্জন দত্ত

অলংকরণ প্রদীপ্ত মুখার্জি

ASHORIRI PROHORI

by Joydip Chakraborty

Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

E-mail patrabharati@gmail.com

visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-540-6

আমার চার কাকিমা

শ্রদ্ধেয়া

মিঠু চক্রবর্তী

প্রীতি চক্রবর্তী

দর্পণা চক্রবর্তী

রিঙ্কু চক্রবর্তী

যে চারজনেই চিরকাল আমার মুখে

ভূতের গল্প শুনতে বেজায় ভালোবাসেন।

লেখকের অন্য বই

জাদুকরের ল্যাবরেটরি

শুরুর আগে

ভূত আছে কি নেই, এই নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে তুমুল তর্কবিতর্ক। কেউ বলেন ভূত আলবাত আছে! আবার কেউ কেউ গলার শির উঁচিয়ে বলেন ভূত বলে কিছু থাকতেই পারে না।

আমি এই নিয়ে তর্কে যেতে রাজি নই। শুধু তোমাদেরই চুপিচুপি জানিয়ে রাখি, ভূতে আমার বেজায় বিশ্বাস। আমি জানি তাঁরা আছেন। এই পৃথিবীতে জলে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, সমতলে, শহরে, গ্রামে, বহুতল অট্টালিকা বা কুঁড়ে ঘর যে যে জায়গায় মানুষ থাকে, তাঁরাও থাকেন। এমনকী যে জায়গায় মানুষ সাধারণত থাকতে পারে না, সেইসব বেমক্কা জায়গাতেও দিব্বি মানিয়ে গুছিয়ে বাস করেন তাঁরা চিরকাল। তবে তাঁদের আমি ভয়-টয় তেমন পাই না। কেননা আমি এও জানি, সব ভূতই ভয়ংকর নয়।

আসলে আমাদের এই পৃথিবীতে সব মানুষ যেমন ভালো নয়, তাদের মধ্যে যেমন ভালো, মন্দ, অত্যাচারী, উপকারি, রাগী, শান্ত, গোবেচারা আবার হেঁকোডেকো ডানপিটে নানা প্রকারভেদ আছে, ভূতেদের মধ্যেও তাই। আমি দেখেছি কিছু ভূত যেমন ভয়ানক রাগী, সুযোগ পেলেই আমাদের ঘাড় মটকে দিতে চায়, তেমনি আবার কোনো কোনো ভূত ভারি সভ্য ভদ্র। মন্দ ভূতেদের হাত থেকে সবসময় তাঁরা আমাদের রক্ষা করতে চান। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে মিশে তাঁরা আমাদের চোখে চোখে রাখেন, যাতে দুম করে মন্দ ভূতেরা কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করে ফেলে।

এই বইটিতে আমার পরিচিত এমন নানান ধরনের ভূতের কুড়িটা গল্প তোমাদের জন্যে সাজিয়ে দিলাম। অবশ্য এগুলোকে গল্প না বলে ঘটনা বলতেই বেশি ইচ্ছে করছে আমার, কেননা ভূতেদের নিয়ে বানানো গল্পের থেকে তোমরা আসল ঘটনা শুনতেই বেশি ভালোবেসে এসেছ চিরকাল...।

সবশেষে চলো, পত্রভারতীর সমস্ত বন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি আমরা সবাই মিলে। কারণ তাঁরা না থাকলে আজ এই বইটা তোমরা পড়ার সুযোগই পেতে না। আর বইটা পড়তে না পেলে এই বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভূতেদের সঙ্গেও কিছুতেই আলাপ পরিচয় করার অবকাশ মিলত না তোমাদের।

জয়দীপ চক্রবর্তী

ঋষি অরবিন্দনগর, বারুইপুর
কলকাতা ৭০০ ১৪৪

সূচিপত্র



চরণদাস

অঙ্কের ভূত

শেষ রাতের ট্রেন

বংশীবটতলার ওদিকে

হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিক

ব্যবসায়ী বিপুলবাবু

পানু তান্ত্রিকের প্রায়শ্চিত্ত

জিতেন হেমব্রমের কলম

লাস্ট মিনিট সাজেশন

টমটম বাবার পাঠশালা

মাধো সর্দারের শেষ ডাকাতি

অশরীরী প্রহরী

ভূতবাবার মেলায়

নারায়ণগঞ্জে দু'রাত

হারায় না কিচ্ছুটি

একটু অন্তত ভয় পাওয়ান

নগেন গোঁসায়ের নিদান

ডায়মন্ডহারবার লোকালের সেই লোকটি

নতুন আনা রেডিও

অন্য ভূতের গল্প

চরণদাস



বাস থেকে যখন মাটিতে পা রাখলুম গাঁ জুড়ে তখন শাঁখের ফুঁক পড়ছে অনবরত। খুব হালকা ছাই ছাই সন্ধে নামছে হামাগুড়ি দিয়ে, চুপিচুপি। বাস থেকে নামলেই রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে যে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা ডালপালা উঁচিয়ে আড়াল করে দিয়েছে আকাশটা, তার নীচে দাঁড়িয়ে আমি ক্রমাগত চোখ ঘোরাচ্ছিলুম ডানদিক-বাঁদিক। আশা ছিল চিঠি দিয়েই আসছি যখন সুবিমল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে নিতে আসবে নিশ্চয়ই। অবশ্য আগে যতবার ও আমাকে ওর এখানে আসার কথা লিখে চিঠি দিয়েছে, প্রত্যেকবারই বার বার উল্লেখ করেছে যে একবার বাস থেকে নেমে যে কোনো লোককে জিগ্যেস করলেই নাকি আমি অনায়াসে বিমল মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে যেতে পারব। সুবিমল বেশ গর্ব করেই লিখেছিল শহরের দিকে মাস্টারদের অবস্থা যাই হোক গাঁয়ের লোকেরা এখনও তাঁদের দেবতা বলেই মানিগণ্যি করে।

লক্ষ্মণপুরের মতন অখ্যাত গ্রামের ততোধিক অখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমার আবাল্য বন্ধু সুবিমল চাটুজ্জের জনপ্রিয়তা নিয়ে আমার বড় একটা মাথাব্যথা ছিল না। আমার সমস্যাটা ছিল অন্য। বাস থেকে নামবার সময়েই দেখেছিলুম এখানে নামবার লোক আমি একাই। আর বাস থেকে নেমে দেখলুম রাস্তার আশপাশ একেবারে শুনশান-জনমানবশূন্য। বাসস্ট্যান্ডের ধারেকাছে কোনো চা-সিগারেটের দোকান থাকবে না এতখানি আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি আগে। এদিকে একটু আগেই আবছা আলোয় বাসরাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে যে রাস্তাটাকে দূরে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখছিলুম জলাজমির মাঝখান দিয়ে, সেটাও গা ঢাকা দিয়েছে অন্ধকারে। বেশ দূরে কয়েকটা খোড়ো চালের বাড়ি থেকে ফাঁক-ফোকর গলে যে দু'এক চিলতে মৃদু আলো এসে পড়ছিল পথের ওপর, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ বিরক্তি লাগছিল; সুবিমলের ওপর। কোথায় আমার সাত নম্বর অখিল মিস্তিরি লেন, আর কোথায় এই লক্ষ্মণপুর। ফিরে যাবো যে সে উপায়ও নেই আর।

সবে ভাবছি একটু পা চালিয়ে যে কোনো একটা বাড়িতে গিয়েই জিগ্যেস করি সুবিমলের কথা, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আপনি বুঝি মাস্টারবাবুর বন্ধু?'

চমকে পিছন ফিরতেই দেখলুম একজন বুড়োমতন লোক আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হাসি। কখন যে নিঃশব্দে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো লোকটা রাস্তা পেরিয়ে, খেয়ালই করিনি। অবাক হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টারবাবু, মানে আপনাদের বিমল মাস্টারের বাড়িটা যে কোনটা আমায় যদি একটু দেখিয়ে দেন—'

'সে কি কথা বাবু। আপনাকে নিয়ে যাব বলেই তো আমি এলাম। আপনি কিনা আমাদের মাস্টারমশায়ের বন্ধু... কদ্দূর থেকে কষ্ট করে এসে এখানে চরণের ধুলো দিলেন আজ্ঞে—' আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা বলে উঠল। তারপর দাঁত বার করে হাসল আমার দিকে চেয়ে। মনে মনে ভাবছিলুম কি বলে ডাকব লোকটাকে, অন্ততঃ সুবিমল কি বলে যে ওকে সম্বোধন করে যদি জানা যেত—

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন লোকটা বলে উঠল, 'আমার নাম চরণদাস, তা মাস্টারবাবু আমাকে চরণ বলেই ডাকেন।' তারপর হঠাৎ যেন একটু ব্যস্ত-সমস্ত হয়েই তাড়া লাগাল আমায়,

'আপনার দেরি হয়ে গেল বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, চলুন এবার একটু পা চালাই—'

চরণ অন্ধকার ভেদ করে দ্রুত পা চালাল, আঁকা বাঁকা পথ ধরে। আর আমিও নিঃশব্দে অনুসরণ করলুম ওকে। এখটুখানি হেঁটে যাবার পরেই দেখলুম আর কোনো বাড়িঘরের চিহ্ন নেই রাস্তার দু'পাশে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে সরু একফালি চাঁদ উঠেছে। সেই হালকা আলোয় দেখলুম রাস্তার দুদিকেই ধূ-ধূ করছে ধানজমি। এখন চাষ শেষ হয়ে গেছে তাই মাঠ একেবারে ফাঁকা।

মিনিট পাঁচ সাত হাঁটার পর কেমন যেন একটা অস্বস্তি শুরু হল মনের মধ্যে। এই অন্ধকারে আর কতদূর চলতে হবে অন্ধের মতন? এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ যদি কোনো সাপ-খোপের গায়ে পা তুলে দিই আচম্বিতে—

ভয়ে শিরশির করে উঠল গা-হাত পা। বললুম, 'আর কদ্দুর যেতে হবে চরণ?'

'এই তো এসে গেচি বাবু, ওই যে সামনে একটা আলোর রেশ দেখছেন ওইটেই মাস্টারবাবুর ঘর, আর তার পেছনেই ওই যে দেখছেন, অন্ধকারের মধ্যেই আর একটা যেন অন্ধকারের পাহাড় উঠেছে, ওইটে আমাদের ইস্কুলবাড়ি—'

সামনে তাকাতে এবার ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা বেশ পুরোনো ইঁটের বাড়ি। জানলা-দরজা বন্ধ, তবু তার ভেতরে টিমটিম করছে মৃদু আলোর আভা।

চরণ এগিয়ে এসে দরজা খুলল, চাবি ঘুরিয়ে। তারপর আমায় বলল, 'আসুন বাবু।'

এবার আমি বেশ অবাক হয়ে গেলুম। জিগ্যেস করলুম, 'চরণ, তোমার মাস্টারবাবু গেলেন কোথায়?'

চরণ হ্যারিকেনের পলতেটাকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'আজকের রাতটা মাস্টারবাবু থাকতে পারলেন না বাবু। বিশেষ কাজে তাঁকে একটু বাইরে যেতে হল, আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমি রইলুম, রাতটুকু একটু কষ্ট করে একা একা কাটিয়ে দিন, কাল সকালবেলাতেই মাস্টারবাবু ফিরে আসবেন বলে গেছেন।' চরণ দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম সন্তর্পণে। ঘরটা বেশ বড়সড়ই। মেঝে মাটির হলেও ছাদটা পাকা। ঘরের এক কোণে শোয়ানো রয়েছে একটা তক্তপোস, ধবধবে সাদা চাদর পাতা। পাশে বই-এর র‍্যাক, দেখলেই বোঝা যায় পড়াশুনার সেই পুরনো অভ্যাস সুবিমলের এখনও বজায় আছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে বেশ বড়সড় দুটো জানলা। এখন বন্ধ। অনেকক্ষণ বন্ধ থাকায় কেমন যেন গুমোট লাগছিল। আমি এবার এগিয়ে গিয়ে জানলাদুটো খুলে দিলুম হাট করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই চরণদাস সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলুম এক কোণে বালতি করে হাত-মুখ ধোওয়ার জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে চরণ। ওপরে দড়ির ওপর ধবধবে পরিষ্কার পাট করা গামছা। ঘরের মধ্যেও কুঁজোয় করে জল রাখা আছে দেখেছি। পাশে নতুন কাঁচের

গেলাস। সুবিমলের ওপর জমে থাকা রাগটা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল চরণদাসের ব্যবস্থাপনার গুণে। ভালো করে চোখে মুখে জল দিয়ে আমি বিছানায় এসে একটু লম্বা হলুম। সারাদিনের পথশ্রম আর ক্লান্তি কামড় বসাচ্ছে শরীরে। ছাদের কড়িকাঠ গুণতে গুণতে ফুরফুরে হাওয়ায় আমি ঘুমিয়েও পড়লুম একসময়।

ভয়ানক একটা বাজ পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলুম আমি। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখলুম রাত একটা। বাইরে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে বুঝতে পারিনি। এবার শুরু হল ভয়ানক ঝড়, চারদিকে থিকথিক করছে অন্ধকার। গ্রামের রাত যে এতখানি কালো জানা ছিল না। মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ আর জানলা দিয়ে আচম্বিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে খাঁ খাঁ প্রেতপুরীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণ স্কুলবাড়িটা। বাইরের হাওয়ায় ঘরের লন্ঠনের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে ক্রমাগত। আমি এবার জানলাগুলো বন্ধ করার জন্য বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালাম। জানলার পাশেই ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব চলছে আর কট-কট-কড়-ড়-ড়-আওয়াজ আছড়ে উঠছে ক্রমাগত।

মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সন্ধে থেকে পেটে কিছু পড়েনি। ক্ষিদেবোধটাও তীব্র হয়ে উঠল হঠাৎ। এদিকে ঝড়ের তাণ্ডব অব্যাহত। বাইরে অজস্র অজানা শব্দের ভিড় আর বৃষ্টির একঘেয়ে ঝমঝম গান। দমকা হাওয়ায় এক পশলা বৃষ্টি লাফিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তেই আমি তাড়াতাড়ি জানলার জীর্ণ পাল্লা ধরে টান মারলুম, বন্ধ করার জন্যে ; কিন্তু জানলা বন্ধ হল না। প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া এসে লণ্ডভণ্ড করে দিল সবকিছু, আর তিন-চারবার দপদপ করে উঠেই আমার ঘরের লন্ঠনটাও গেল নিভে।

অন্ধকার আমাকে এখন আঁকড়ে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। বাইরে ক্রমাগত পাক খাওয়া দমকা বাতাস— আর ঝমঝম বৃষ্টি। পুরো পৃথিবীটাকেই বুঝি এবার ওলোট-পালোট করে দেবে এই বন্য প্রকৃতি। অজানা এক আতঙ্কে আমি এবার চিৎকার করে উঠলুম, 'চর-ণ—চরণদা-স—'

এক ঝলক দমকা বাতাস হাহাকারের মতন তীব্র আওয়াজ তুলল ঘরময়, চরণদাসের কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকেই জামার পকেট থেকে বার করে দেশলাইটাকে বিছানার ওপর রেখেছিলুম। এখন অন্ধকার ঘরে পাগলের মতন দেশলাইটাকে খুঁজতে লাগলুম।

ঠিক এই সময়েই অন্ধকার চিরে আকাশের গায়ে ঝলসে উঠল আবার তীব্র গোলাপি বিদ্যুতের রোশনাই আর সেই আলোতেই জানলার গরাদের বাইরে মুহূর্তের জন্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন কার একটা ভয়াবহ মুখ। সাদা, বিবর্ণ, রক্তহীন সেই মুখ, কোটরাগত নিষ্পলক চোখ আর মাথায় কাঁচা-পাকা অবিন্যস্ত চুল—চরণ—

তীব্র আতঙ্কে ক্রমশই হিম হয়ে যাচ্ছে আমার শরীর। নিজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নিজের কানে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে ক্রমাগত, পালস বিট একশো ছাপিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। স্থির, নিস্পন্দ আমি

চুপচাপ বসে রইলুম বিছানার ওপর। বাইরে বৃষ্টির রেশ কমে এসেছে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো, আর হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কার অট্টহাসি, স্কুলবাড়ির ইঁটের পাঁজর বার করা ঘরগুলোর আনাচে-কানাচে।

প্রকৃতপক্ষে আমার এখন আর কিছুই করার নেই। আমি বন্দী, আমি নিঃসঙ্গ, আমি অসহায়—

আমি কি সত্যিই নিঃসঙ্গ? নিজের সাথেই লড়াই চলছে ক্রমাগত। যদি সত্যিই এ ঘরে আমি একা হই, তবে চারদিকে কাদের মৃদু ফিসফাস, মাঝে মাঝে কার নিঃশ্বাস পড়ছে আমার কাঁধের ওপর? সামনে, পিছনে ডানদিকে, বাঁদিকে—যেদিকেই হাত বাড়াই শুধু শূন্য। অন্ধকার নিবিড়, নিকষ, চটচটে। আলকাতরার চেয়েও গাঢ় অন্ধকার।

বুকের নীচের একটা হালকা রিনরিনে অনুভূতি আর শিরদাঁড়া বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসা একটা মৃদু শিরশিরানি— এছাড়া আমার শরীরে আর কোনো বাড়তি উত্তেজনা বা আতঙ্ক নেই এখন। বেশ বুঝতে পারছি যে ক্রমশঃ ভয় পেতেও ভুলে যাচ্ছি আমি। চরণকে ডেকে কোনো লাভ নেই। জানি সে আর আসবে না। অগত্যা আমি চুপচাপ। প্রতিরোধহীন। বসে রইলুম।

এভাবে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। সম্বিৎ ফিরল দরজার কড়া নাড়ার শব্দে। সঙ্গে বেশ কিছু বিস্মিত কণ্ঠস্বর যার মধ্যে একটা আমার খুবই চেনা। '...কিন্তু কাল তো আমি দরজার তালা লাগিয়ে গিয়েছিলুম, চাবি এখনও আমার পকেটে।'

কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলুম পুরোপুরি। এ কণ্ঠস্বর সুবিমলের।

'সুবিমল, সুবিমল—' বিছানায় বসেই আমি চিৎকার করে উঠলুম।

'আরে দীপ, কি আশ্চর্য তুই এখানে—' সুবিমলের কণ্ঠ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে সুবিমলের গায়ে এলিয়ে পড়লুম আমি। জড়িয়ে ধরলুম ওকে দু'হাত দিয়ে।

সুবিমল দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে আমাকে আবার এনে বসালো বিছানায়। তারপর আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোর কি হয়েছে দীপ?'

আমি কোনো জবাব দিতে পারলুম না।

সুবিমল দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আমার গায়ে তীব্র ঝাঁকুনি দিল এবার।

'দীপ বি ক্যাজুয়াল—ব্যাপারটা কী—আর, আর—বিমল একটু থামল তারপর আমার দিকে ফিরে অবাক গলায় জিগ্যেস করল, তাছাড়া তুই ঘরে ঢুকলি কি করে, ঘরে তো তালা দেওয়া ছিল—'

আমি তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিলুম না। থেমে থেমে বললুম, 'আমার চিঠি পেয়ে তুই যাকে আনতে পাঠিয়েছিলি আমায়, বাসস্ট্যান্ডে,—

সুবিমল বলল, 'কী যা-তা বলছিস। আমি তো তোর কোনো চিঠি পাইনি, তোকে নিয়ে আসার জন্যেও পাঠাইনি কাউকে বাসস্ট্যান্ডে—'

'তবে যে চরণদাস বলল—'

'চরণদাস!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবার সুবিমল।

'হ্যাঁ চরণদাস।' আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলুম। 'মাথায় কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল, কোটরাগত চোখ, বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখ—'

'তোর বিবরণে কোনো ভুল নেই দীপ, তবু এ হতে পারে না, এ মিথ্যে।' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে এখন সুবিমল।

আমি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুবিমলই কথা বলল আবার। 'চরণদাস আমাদের স্কুলের দারোয়ান ছিল দীপ। কাল সকালে রক্তাল্পতায় ভুগে ভুগে তার মৃত্যু হয়। ওকে দাহ করার জন্যেই কাল রাতে আমি —'

সুবিমলের কোনো কথাই আর কানে ঢুকছিল না আমার। হাত-পা দ্রুত অবশ হয়ে আসছে আমার, বেশ বুঝতে পারছি। মাথাটাও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালুম। জানলার বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়ে হালকা নীল আলো ফুটছে স্কুলের মাঠে। আকাশ জুড়ে হালকা গোলাপি রঙের উঁকিঝুঁকি। স্কুলের মাঠে দুটো দুধ-সাদা বক এতক্ষণ চুপচাপ ঘাড় গুঁজে বসে ছিল। আমি চোখ বুঁজে ফেলার আগেই এইমাত্র তারা নীল আকাশের দিকে পাখা মেলে দিল, যেখানে চরণের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই।



অঙ্কের ভূত



বরুণ স্যার বরাবরই বলতেন ভুতোটাকে ভূতে পেয়েছে। তা না হলে এই বাজারে অঙ্কে কেউ পঞ্চাশের মধ্যে পাঁচ পায়? এমনিতেই সিলেবাস এখন আগের চেয়ে অনেকটাই কমে গেছে, তার ওপরে নম্বর দেওয়ার যে বিধি সেই অনুযায়ী মাস্টারমশাইরা পরীক্ষার খাতার ওপরে হাত সবসময় উপুড়ই করে রেখেছেন। তা সত্ত্বেও এত নিখুঁতভাবে অঙ্কগুলোকে ভুলভাল কষার জন্যে বাস্তবিকই এলেম লাগে। ভুতো নিজেও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় নিজের কথা ভেবে। সে অনায়াসে সাঁতরে নস্করপুকুর এপার ওপার করতে পারে, ঢিল ছুঁড়ে গাছ থেকে আম পেড়ে ফেলতে পারে চোখ বুজিয়ে, এমনকি ফুটবল মাঠেও স্কুল টিমে সে অপরিহার্য। কোনো কিছুতেই দক্ষতার তার অভাব নেই। যা কিছু মুশকিল শুধু তার অঙ্কের খাতায়।

ভুতোর বাবা খুব একটা অর্থবান নন। তার ওপরে মানুষটাও তিনি সহজ সরল। গ্রামের একপ্রান্তে একচিলতে একটা দোকানঘরে দিন কেটে যায়। সকালে খেয়ে দেয়ে টিফিন কোটোয় খাবার নিয়ে বেরোন, ফিরতে ফিরতে রাত্তির। সারাদিন চা তৈরি করা, ঘুগনি বানানো, আটা মেখে রুটি ভাজা এসব করে খদ্দের সামলাতে হয় তাঁকে। সারাদিন কাজ নিয়ে থাকেন আর ভাবেন ভুতোটা মানুষ হলে সব কষ্ট সার্থক হয় তাঁর। বাড়ির খবরাখবর সারাদিন বড় একটা রাখা হয় না তাঁর। ভুতোর পড়াশোনার ব্যাপারেও বোঝেন কম বলে মাথা গলান না তিনি। ভুতো স্কুলে যায়, বছর বছর নতুন ক্লাশে ওঠে এটুকু তিনি জানেন আর এটুকুতেই যতটা সম্ভব খুশি থাকার চেষ্টা করেন তিনি।

এভাবেই চলছিল বেশ। কিন্তু, গোল বাঁধল কাশীপুর শ্মশানের তারাতান্ত্রিকের কথায়। লোকটা অন্য ধরনের। কাজকর্ম তেমন কিছুই করে না। শ্মশানে বসে কী সব মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে নাকি রাত জেগে। ইদানীং শ্মশানের পাশে চট প্লাস্টিক দিয়ে শ্মশান কালীর মন্দির বানিয়েছে একটা। পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকে। রোজই প্রণামী বাবদ মন্দিরে টাকা-পয়সা কিছু পড়ে। তাছাড়া শ্মশানযাত্রীরাও দু-পাঁচ টাকা করে দিয়ে যায় তাকে মাঝে মধ্যে। তাই দিয়েই চলনসই গোছের জীবন কেটে যায় লোকটার। গ্রামের সাধারণ মানুষ নানা কারণে লোকটাকে এড়িয়ে চলে। কেউ কেউ বলে লোকটা ভণ্ড। কেউ বলে ডাকাতদলের স্পাই। আবার কেউ আরো এককাঠি বাড়িয়ে তাকে একবারে ডাকাত দলের সর্দারই ভাবে মনে মনে। হরিপদর অবশ্য লোকটাকে অতখানি ভয়ঙ্কর মনে হয় না। তার দোকানে এসে প্রায়ই চা বা এটা ওটা খায় লোকটা। হরিপদর সঙ্গে গল্প করে। ধর্ম-কম্মের কথাও হয় দু-পাঁচটা। হরিপদর মন্দ লাগে না। এমন কি খাওয়ার জন্যে লোকটার থেকে পয়সাও নেয়-না সে। সেদিনও হরিপদর দোকান বসে চা আর মুড়ি খাচ্ছিল তারাতান্ত্রিক। আর হরিপদকে বোঝাচ্ছিল এ জগতে ভীতু আর দুর্বল মানুষের কী দুর্গতি। এই কথার রেশ ধরেই হরিপদ বলে উঠেছিল হঠাৎ, 'ভয়-ডরের কথা যদি বলেন ঠাকুর, মানুষকে আমি ভয় পাইনি কখনও—'

'তবে কাকে ভয় তোমার, সাপ না বাঘ?'

'তাও না।'

'তবে কি কুকুর? অনেকে টিকটিকি আরশোলা এসবেও ভয় পায় শুনেছি। তোমারও কি—'

'আজ্ঞে না ঠাকুর।' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে হরিপদ, 'এই বয়েসে বলতে লজ্জা লাগে, তবে আপনাকে বলতে তো সঙ্কোচ নেই, আমার বড্ড ভূতের ভয়—'

প্রথমটা তার কথায় হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে তারাতান্ত্রিক। তারপর হঠাৎ ভারী গম্ভীর হয়ে—তারপর বলে, 'এখন তো আর ভয় পাই বলে চোখ বুজিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সামনে অনেক কাজ—'

'কাজ—' অবাক হয়ে বলে হরিপদ।

'ছেলেটাকে সুস্থ করতে হবে না?'

'ছেলে, মানে ভুতো—ক্যানো কী হয়েছে ওর? এই তো সকালে দেখে এলাম দিব্বি, রয়েছে, বেরোনোর সময় বলল পাঁচটা টাকা দিতে, ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জা কিনবে নাকি—'

'আচ্ছা আলাভোলা মানুষ তো তুমি। ছেলেটাকে যে ভূতে পেয়েছে সে খবরই রাখো না? আমি তো লোক মুখে শুনে ছুটে এলাম তোমার কাছে—'

'ভারী সাব্বোনেশে কথা শোনালেন তো—'

'কথাটা যে সে লোক বলেননি বাপু, খোদ বরুণ মাস্টার বলছেন এ কথা। অঙ্কের লোক। খুব বলতেন ভূতটুত সব মিথ্যে—এবার কী হল বাপু!' ঘোর কলি হোক আর যাই হোক সত্যিটা তো শেষমেশ বেরোলো মুখ দিয়ে—ভূতের কারসাজিতেই ছেলেটা অঙ্কে ফেল করছে ফি বছর—'

'ছেলেটার তাহলে কী হবে এখন ঠাকুর' ভারী উদ্বেগের সঙ্গে বলে ওঠে হরিপদ, ছেলেটার অঙ্কে মাথা খেলে না বলে কত লোকের কত কথাই তো শুনলাম বলুন। ব্রাক্ষিশাক, হোমিওপ্যাথি গুলি—এখন আপনিই বলুন দিকিনি ভূতের ওষুধ কোত্থেকে জোগাড় করি আমি—'

'আহা অত ভাবনার কী আছে, আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে তারাতান্ত্রিক, আমি তো আছি। মন্ত্রে কী না হয়। একটু খরচ খরচা করতে হবে এই যা। তা তুমি গরিব মানুষ। তাছাড়া আমার বড় কাছের জনও বটে। তোমার জন্যে না হয় ইন্সটলমেন্টের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবেখন—সামনের শনিবার সন্ধেবেলা ছেলেটাকে আমার মন্দির নিয়ে এসো। ভূতটাকে বের করে বেঁধে ফেলবখন আমি, চিন্তা নেই।'

'খুব চিন্তামুক্ত করলেন আমায় ঠাকুর—' বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হরিপদ।

বরুনবাবু নিজের ঘরে বসে নিবিষ্টমনে অঙ্ক করছিলেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিছানায় বসে অঙ্ক কষা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। না হলে ঠিকমতন ঘুম আসে না। আজ অঙ্কে মশগুল হয়ে গিয়ে খেয়ালই ছিল না তাঁর যে রাত রীতিমতন গভীর হয়েছে। বাইরে অন্ধকার থমথম করছে। ঘর এবং ঘরের বাইরে, দুই-ই এমন চুপচাপ যে দেওয়ালে বসা একটা টিকটিকি ঠিক ঠিক বলে বলে তাঁর অঙ্ককে তারিফ করে উঠতেই চমকে খাতা থেকে মুখ তুললেন তিনি। আর তখনই লোকটাকে দেখতে পেলেন বরুণবাবু। বই-এর র‍্যাকটার পাশে দেওয়ালের সঙ্গে লেপটে ক্যামন যেন

চ্যাপ্টা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। লোকটাকে দেখে ভারী অবাক হয়ে গেলেন বরুনবাবু। এতরাতে এ লোকটা তাঁর ঘরে ক্যানো? তাছাড়া ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ। এ লোকটা ঘরে ঢুকল ক্যামন করে। চুরি-টুরির মতলবে আগে থেকেই কি ঘরে ঢুকে বসেছিল নাকি? বরুনবাবু ভীতু নন। শরীর স্বাস্থ্যেও তাকত আছে। মনে মনে লড়াই এর প্রস্তুতি নিয়েই বেশ ভারিক্কি গলায় লোকটাকে জিগ্যেস করলে তিনি, 'কী চাই?'

লোকটা ভারী মিহি করে হাসল। বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা ছিল—'

'দরকারি কথা, আমার সঙ্গে—' সন্দেহ গলায় বললেন বরুণবাবু, 'এই এত রাতে?'

'রাতটাই আমাদের যথার্থ সময় যে। দিনের আলোয় শরীর তৈরি করতে খুব কসরৎ করতে হয় আমাদের—' লোকটা রিনরিনে গলায় বলল বিনয়ের সঙ্গে।

'বুঝলাম না—'

'আসলে শরীরটা তো সত্যি এখন আর নেই আমাদের। খুব প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এটা তৈরী করতে হয় কিছুক্ষণের জন্যে।'

'আমায় পাগল ঠাউরেছো?'

'আজ্ঞে না। সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসা। আমাদের বিশ্বাস বুঝিয়ে বললে নিশ্চিত বুঝবেন, আপনি। হাজার হোক বুঝদার মানুষ আপনি—'

'কিন্তু তুমি কে বাপু?'

'নাম বললে কি আর চিনবেন? আপনার ঠাকুর্দা চিনতেন আমায়। ছোটবেলায় একসাথে কত খেলেছি। তারপর আমার তিরিশ-বত্রিশবছর বয়েসে কলেরা হল। মরে গেলাম। তোমার ঠাকুর্দা, মানে আমাদের ত্রিলোচন দুঃখু পেয়েছিল খুব—'

'ইয়ার্কির জায়গা পাওনি ছোকরা—' বলে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটার ঘাড়টা বাগিয়ে ধরতে গেলেন বরুনবাবু। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটার শরীরের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাতটা গলে গেল। আর লোকটাও যেন বাতাসে ভেসে তাঁর থেকে একটু তফাতে সরে দাঁড়ালো।

বরুণবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। থম মেরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর লোকটার দিকে চেয়ে, আত্মসমর্পনের ভঙ্গীতে বললেন তিনি, 'সত্যিই তাহলে আপনি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূত—'

'বিশ্বাস করতে সত্যি কষ্ট হয়।'

'কষ্টের কী আছে। ভূত মানে অতীত। অতীতকে কি অস্বীকার করা যায় নাকি—'

'না মানে আগে বিশ্বাস করতাম না তো—'

'ওতে লজ্জার কী আছে। আজকালকার পড়াশুনাও তো হচ্ছে ওইরকম। কীসব ছাঁইপাঁশ শিখিয়ে মানুষকে অবিশ্বাসী করে তুলছে দিন দিন। ত্রিলোচনও খুব দুঃখ করছিল এই নিয়ে—'

'আমার দাদু?'

'হ্যাঁ। এ বাড়িতে দু'জনে একসঙ্গেই থাকি কিনা—'

'তাহলে তিনি কোথায়—'

'আপনি যা বলে বেড়াচ্ছেন ভূতেদের নামে, লজ্জায় তিনি তো মুখ দেখাতে পারছেন না আর ভুতসমাজে—'

'ক্যানো?'

'ভুতো অঙ্ক কষতে পারে না, এই দোষটা কোনো এভিডেন্স ছাড়াই আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপালেন। জানেন, কেসটা ভূতাধিকার কমিশন পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে—কোন আক্কেলে আপনি বললেন ভূতেরা অঙ্ক কষতে জানে না—'

'ভূতেরা অঙ্ক জানে?'

'চেষ্টা করুন—'

বরুণবাবু জুতসই ক'টা অঙ্ক দিলেন ভূতটাকে। সে মুখে মুখে অঙ্কগুলো কষে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে। কাগজকলমে হাতই ছোঁয়াল না। উল্টে বরুণবাবুর দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল, 'ছোঃ এই তো আপনাদের অঙ্কের স্ট্যান্ডার্ড। এই নিয়েই খামোখা গর্ব করেন এত। বরুণবাবু মাথা নামিয়ে বললেন, 'মানছি হে কাজটা আমার ঠিক হয়নি।'

'কিন্তু ভূতেরা এত সহজে মানবে ক্যানো। যে অপমান আপনি করেছেন। তাছাড়া অবস্থার সুযোগ বুঝে তারাতান্ত্রিক তো আবার আর এক চাল চেলেছে—'

'কী রকম?'

'শোনেননি কিছু?'

'না—বলে একটু চুপ থাকেন বরুণস্যার। তারপর বলেন, আমায় আর আপনি বলবেন না প্লিজ। আপনি আমার দাদুর বন্ধু হাজার হোক—'

'আসছে শনিবার সে যে ভুতোর ভূত ছাড়ানোর জন্যে যজ্ঞের আয়োজন করছে। বেচারা হরিপদ গরিব মানুষ। শুধুমুধু তার কিছু অর্থ গচ্চা যাবে।' ভূতটা গোমড়া মুখে বলে।

'ছি! ছি!—তারাটা এতখানি ভন্ড হয়ে উঠেছে আজকাল—'

কথাটা আপনি হয়তো বুঝলেন। অন্যেরা তো বুঝবে না। তারা ভাববে তারাতান্ত্রিক সত্যিই এলেমদার মানুষ। আর আমাদের আরো কিছু মিথ্যে হজম করে যেতে হবে মুখ বুজিয়ে। আমরা পুরোনো ভূত, অনেক কিছু সহ্য করতে পারি। কিন্তু সদ্য যারা ভূত হয়ে আসছে, তারা একালের ছোঁড়া। তারা এ অপমান মুখ বুঁজে সাইবে কি আর—'

'তাহলে সত্যিই তো বিপদ হল—'

'তা তো হলই। আর ওদের প্রথম টার্গেটই তো তুমি। ওরা বলছে তোমার ঘাড়ে বসে সত্যি সত্যি তোমায় অঙ্ক ভুলিয়ে দেবে। পরিস্থিতি দেখে ত্রিলোচন তো শয্যাশায়ী। ভাগ্যিস আগে একবার মরেছিল তাই মরার ভয়টা শুধু নেই—'

'তাহলে উপায়?'

'প্রকাশ্যে তোমার কথা উইথড্র করো। বলো ভূতেরা মানুষের চেয়ে ভালো অঙ্ক কষে।

'কিন্তু হাতের সামনে একটা ভালো উদাহরণ তো চাই—'

'কী করতে বলো—'

'আজ্ঞে ভুতোর মাথায় একটু অঙ্ক ঢুকিয়ে দিন দয়া করে। তাতে আমার বলতেও সুবিধা, আর তারাতান্ত্রিকের যজ্ঞেরও প্রয়োজন রইল না আর—'

ভূতটা খুক খুক করে হাসল। বলল, 'আমায় মান্যিগন্যি করে, আপনি-আজ্ঞে শুরু করে দিলে যে দেখছি। হম্বি-তম্বিগুলো গেল কোথায়—'

'আর লজ্জা দেবেন না আমায়—'

ঠিক আছে, ঠিক আছে—'বলতে বলতে ভূতটা মিলিয়ে গেল বই-এর আলমারির পিছনে।

ভুতোর অঙ্কের মাথা খুলে গেছে হঠাৎ করে। অঙ্ক কষায় উৎসাহও হয়েছে খুব। তারাতান্ত্রিকের কাছে তাকে আর নিয়ে যেতে হয়নি। তারাতান্ত্রিক এ গ্রামে নেই আর। গ্রামের কিছু লোক তাকে ভূত ভূত বলে অবস্থানে চিৎকার করতে করতে প্রাণভয়ে দৌড়তে দেখেছিল গ্রামের রাস্তা ধরে দু-একদিন আগে। বরুণবাবু এখন ঘোরতর ভূতবিশ্বাসী। ভূতের প্রশংসায় তিনি এখন পঞ্চমুখ। এলাকায় এমন গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে যে আজকালকার অঙ্কের নানা জটিল সমস্যার সমাধানে তিনি নাকি ভূতেদেরই শরণাপন্ন হচ্ছেন রাতে-বিরেতে গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।



শেষ রাতের ট্রেন



হলফ করে বলতে পারি, গল্পটা আমার মনগড়া নয়। যদিও নয় নয় করে বিশ বিশটা বছর পেরিয়ে গেছে, তবু সে রাতটার কথা দিব্বি মনে আছে আমার। এই কুড়ি বছরে সাকুল্যে একজনকেই এই অভিজ্ঞতার কথা বলে উঠতে পেরেছি মন খুলে। চট করে কাউকে গল্পটা বলতে ইচ্ছে করেনি এইজন্যেই যে, জানি তারা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। নানা যুক্তি খাড়া করে আমায় বোঝাতে চেষ্টা করবে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমার। হয় আমি ইয়ার্কি করছি, নাহলে গাঁজাখুরি মনের ভুলকে সত্যি বলে চাউর করতে চাইছি। আমি সেদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই অহেতুক তর্কাতর্কি খুব সচেতনভাবেই এড়াতে চেয়েছিলাম।

আমার গাদা বন্দুকটাকে ঘাড়ে করে সেদিন সকাল থেকে শখের শিকারের নেশায় উত্তর ইংল্যান্ডের নির্জন পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নেমে গেলেও একটা শিকারও ভাগ্যে জোটেনি আমার তখনও। ডিসেম্বর মাস। পুব দিক থেকে হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া ঠান্ডা কনকনে হাওয়া বইছিল হু হু করে। আমার খেয়ালই ছিল না কোনোদিকে। যখন সম্বিৎ ফিরল, ঘষা কাঁচের মতন অস্বচ্ছ আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর মতন নরম আর হাল্কা বরফের গুঁড়ো নেমে আসতে শুরু করেছে। সূর্যের আলো মরে এসেছে তখন। চারদিক কালো করে সন্ধে নেমে আসছে হুড়মুড় করে।

পাহাড়তলির গ্রামে আমার হোটেলে ফেরার জন্যে ফেলে আসা পথে ফিরতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম পাহাড়ি রাস্তায় আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খানিক দাঁড়ালাম। ভাবলাম যদি লোকজন কাউকে চোখে পড়ে তাহলে ফেরার পথটা জিজ্ঞেস করে নেব। কিন্তু চারদিকে তাকিয়েও জনমনিষ্যির চিহ্ন দেখতে পেলাম না। অন্ধকার তখন আরো ঘন হয়েছে। আকাশ থেকে নেমে আসা বরফের পরিমাণও বাড়ছে ক্রমাগত। অগত্যা নিজেই নিজেকে বোঝালাম এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ তো নেই কিছু। কাজেই চলা যাক। চলতে চলতে নিশ্চিত মানুষের বসতি চোখে পড়ে যাবে একসময়। তারা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিয়ে দেয় তাহলে মাঝরাতে হলেও অন্তত নিজের হোটেলে গিয়ে উঠতে পারব।

অতএব আমি আবার হাঁটতে লাগলাম। আমার গিন্নির জন্যে মন কেমন করে উঠল এবার। বেচারা হোটেলে একা রয়েছে। সকালের টিফিন খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় বলে এসেছিলাম সন্ধে নাগাদ ফিরে আসব। নিশ্চিত আমার জন্যে দুর্ভাবনা শুরু করে দেবে সে একটু পর থেকেই। কিন্তু আরো খানিক হেঁটেও জনবসতির কোনো চিহ্ন আমার চোখে পড়ল না। এবার আমি ভয় পেয়ে গেলাম। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তেষ্টাও পেয়েছে বিস্তর। সঙ্গে খাবার নেই। জলও যেটুকু ছিল শেষ হয়ে গেছে অনেক্ষণ আগেই। ঠান্ডা বাতাস হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে একেবারে। পথের ওপরে পড়া বরফে পা ঢুকে যাচ্ছে এবার। হাঁটতে হাঁটতে সেইসব মানুষের কথা মনে আসতে লাগল আমার, যাঁরা এমনি করেই পাহাড়ি পথে রাস্তা হারিয়ে ফেলে চলতে চলতে একসময় হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলে এই সাদা বরফে ঢাকা পৃথিবীর ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে চিরতরে...

আমি নিজেই মনে মনে নিজেকে ভরসা দিলাম। আমি এ ভাবে মরতেই পারি না। যে করে হোক এ রাতটুকু কাটানোর জন্যে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় জোগাড় করতেই হবে। হাঁটতে হাঁটতেই প্রাণপনে চিৎকার করতে লাগলাম আমি। যদি কেউ সেই আওয়াজ শুনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম প্রতিউত্তর ভেসে আসে কিনা, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমার নিজের কণ্ঠস্বরই ফিরে ফিরে আসতে লাগল বার বার। হাওয়ার শব্দও আরো জোরালো হতে লাগল। খিদে, তেষ্টা, প্রবল ঠান্ডা আর ক্লান্তিতে বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে এল যখন ঠিক তখনি মনে হল কে যেন আমার চিৎকারে সাড়া দিয়ে উঠল আর তারপরেই দূর থেকে একটা হলদেটে গোল আলো এগিয়ে আসতে দেখলাম আমি। প্রথমটা চোখের ভুলই ভেবেছিলাম, কিন্তু ক্রমশ আলোটাকে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে দেখে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করতে শুরু করলাম আমি আবার।

লণ্ঠন হাতে বয়স্ক মানুষটা একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। তাকে দেখে আনন্দে বার বার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম আমি। লোকটা মনে হল যেন খুব বিরক্ত হল। হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে সে আমার মুখটা দেখল ভালো করে। তারপর রুক্ষস্বরে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার মতন কী এমন ঘটল?'

'এই যে এমন ভয়ংকর রাতে আর ঘোর বিপদের মধ্যে আমি আপনাকে পেয়ে গেলাম, এ তো তাঁরই দয়া বলুন', আমি আনন্দে বলে উঠি, 'আমি তো বলতে গেলে মরার জন্যেই তৈরি হচ্ছিলাম মনে মনে একটু আগে'।

আমার কথাগুলোকে পাত্তাই দিল না লোকটা। কঠিন, ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'তা যাবেন কোথায় আপনি?'

'ডুলডিং', উৎসাহের সঙ্গে বললাম আমি, 'আচ্ছা ও গ্রামটা এখান থেকে কতখানি বলতে পারেন?'

'প্রায় বিশ মাইল' ঠান্ডা গলায় বলে উঠল লোকটা, 'এই বরফ পড়া রাতে সেখেনে পৌঁছনো যে অসম্ভব তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাজেই মরণই নাচছে আপনার কপালে'।

আমি ভীষণই দমে গেলাম লোকটার কথা শুনে। মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আশেপাশে পাহাড়ি গ্রাম নেই কোনো, যেখানে রাত্তিরটা মাথা গোঁজা যায় কোনোক্রমে?'

'গ্রাম?' খসখসে শুকনো মুখে হেসে উঠল লোকটা, 'এখান থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রাম ওয়াইকি অন্তত বারো মাইল'।

'তাহলে আপনি থাকেন কোথায়?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম আমি।

'ওই তো ওইদিকে', বলে লণ্ঠনশুদ্ধু হাতটা তুলে কোনদিকে যে দেখালো লোকটা কে জানে!

আমি নিরুপায় হয়ে বলে উঠলাম, 'তাহলে আজ রাতটুকু আপনার বাড়িতেই যদি থাকতে দেন...একটু তেষ্টার জল আর সামান্য কিছু খাবার হলেই চলবে...শুধু রাতটুকু, অন্ধকার ফিকে হলেই বেরিয়ে পড়ব আমি...'

'অসম্ভব', আকাশ থেকে ক্রমাগত খসে পড়া বরফেরই মতন ঠান্ডা গলায় বলে উঠল লোকটা।

'কেন?'

'কত্তামশাই কিছুতেই রাজি হবেন না। বাইরের মানুষ একেবারেই পছন্দ করেন না উনি'।

'কত্তা মানে? কৌতূহলী হয়ে বলি, 'তিনি আবার কে?'

'এত কিছু জানার দরকারটা কী বাপু...' বেশ বিরক্ত হয়ে বলে লোকটা।

'আপনি আমায় নিয়েই চলুন না একবার তাঁর কাছে', প্রায় অনুনয় করে বলি আমি, 'আমার দুরবস্থার কথা বুঝিয়ে বললে দেখবেন কিছুতেই আপত্তি করবেন না তিনি। আমি নিশ্চিত'।

'দেখুন', বলে পিছন ফিরে লোকটা হাঁটতে শুরু করল মুখ বুজিয়ে। আমিও নাছোড়বান্দার মতন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো অনুসরণ করে হাঁটতে লাগলাম তার পিছু পিছু।

বেশ কিছুক্ষণ একনাগাড়ে হাঁটার পর অন্ধকারের মধ্যে আরো জমাট অন্ধকারের মতন একলা দাঁড়িয়ে থাকা একটা উঁচু বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বাড়ি?'

'হুঁ', গম্ভীর গলায় উপর নীচ মাথা দোলায় লোকটা।

'এই নিকষ অন্ধকার বাড়িটার মধ্যে সত্যিই মানুষ থাকে?' সংশয় নিয়ে আমি বলি। লোকটা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। প্রকান্ড একটা কুকুর ভয়ংকর গর্জন করে ছুটে আসছে তখন অন্ধকার চিরে। বুড়ো লোকটা হাত তুলে থামতে ইশারা করল কুকুরটাকে। তারপর লম্বা কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে পাক মারতে শুরু করল। দরজাটা বিশাল। ভারীও। দেখলে মনে হয় জেলখানার দরজা। একবার ঢুকে পড়লে যেন আর বেরোবার উপায় নেই এখান থেকে। কুকুরটা আমার দিকে চেয়ে ভীষনই রাগী গলায় গরগর করছিল। লোকটা মৃদু ধমক দিল তাকে, 'আঃ রাজা, চুপ'। আমি দরজার দিকে নজর রাখছিলাম। ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি তখন। দরজাটা একটু ফাঁক হতেই বুড়ো লোকটাকে এক ঠেলা মেরে সটান ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি।

২

ঘরটা বেশ বড় আর উঁচু। হাল্কা আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখছি যখন হঠাৎই ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল। বুড়ো লোকটা আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল। সে হাসি দেখে আমার সারা শরীর অজানা আতঙ্কে যেন শিউরে উঠল। লোকটা হিসহিসে গলায় বলে উঠল, 'এই ঘন্টা আপনার জন্যে। প্রভু আপনাকে ডাকছেন। চলুন', বলে ঘরেরই আর একদিকে একটা নীচু কাঠের দরজার দিকে হাত বাড়ালো। মাথা নামিয়ে ঘরে ঢুকে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। এ ঘরটা বই পত্তরে ঠাসা। লোকটার সামনের টেবিলটাতেও হরেক বই এমন অগোছালোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেন হুড়মুড় করে নীচে পড়তে শুরু করে দেবে ওগুলো। বইগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়েছে লোকটা। শনের মতন লটপটে অবিন্যস্ত চুল মুখের চারদিকে লুটিয়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই

লোকটা মুখ তুলল। আমি তার দিকে চেয়ে একেবারে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম। তার চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলছিল।

গনগনে গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? এখানে এলে কীভাবে? কী চাও তুমি?' তারপর অন্য লোকটার দিকে চেয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জ্যাকব, একে কেন ঢুকতে দিয়েছ এখানে?'

জ্যাকব হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, 'আমি একে আনিনি স্যার। এ নিজেই আমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে। এমনকি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে জোর করে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভেতরে।

'কেন এমন করেছ?' আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে ধমকে উঠল লোকটা।

'প্রাণ বাঁচাতে', কাঁপা স্বরে উত্তর দিলাম আমি।

'মানে?' ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল সে।

'বাইরে যে হারে বরফ পড়ছে আজ, আমি সারারাত বাইরে থাকলে বরফের নীচে চাপাই পড়ে যেতাম। তাছাড়া খিদে আর তেষ্টায় এমনিতেই আধমরা হয়ে আছি আমি'।

লোকটা গম্ভীর মুখে জানালার পাল্লা খুলে বাইরের জমে থাকা বরফের দিকে তাকিয়ে নিল একবার। তারপর একটু নরম গলায় বলল, 'থাকো কোথায়?'

'আজ্ঞে ডুলডিং', ওখানে একটা হোটেলে আমার স্ত্রী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। শিকারে এসে অন্ধকার পাহাড়ি পথে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমি। আমার নাম জেমস। পেশায় ডাক্তার'। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ক্লান্তিতে হাঁফাতে লাগলাম আমি। লোকটা আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। আপনমনে বলে উঠল, 'ডুলডিং। হ্যাঁ জায়গাটা দূরই বটে। সত্যিই কুড়ি মাইলের পথ'। তারপর জ্যাকবের দিকে চেয়ে বলল, 'জ্যাকব ও আজ রাতে এখানে খাবে। আমাদের খাবার টেবিলে দাও'।

জ্যাকব কিছুটা মাংস, রুটি আর জল এনে রাখল আমাদের সামনে। লোকটা রুক্ষ গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'ঝটপট খেয়ে ফ্যালো। এর বেশি আর কিছু খাওয়াতে পারলাম না তোমাকে'। খেতে খেতে লোকটাকে মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছিলাম আমি। কে এই লোকটা? মস্ত মাথা। মুখে বলিরেখা। সেখানে বৈদগ্ধ আর গাম্ভীর্য। লম্বা চুল। আচরণ রহস্যময় ও ভয়জাগানো। এ আদৌ মানুষ তো? খাওয়া শেষ করতে না করতেই তাড়া দিয়ে তুলে দিল আমায় লোকটা, 'তুমি ডুলডিং যাবে বলছিলে না?'

'হ্যাঁ', মাথা নাড়লাম আমি।

'তাহলে শিগগিরি বেরিয়ে পড়তে হবে তোমায়'।

'এখন, এই রাতে!' আতঙ্কিত হয়ে বলি আমি, 'এই তুষারপাতের মধ্যে এত পথ কীভাবে যাব আমি?'

'তুমি না বলছিলে তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছে?'

'হ্যাঁ', বিহ্বল হয়ে বলি, 'নিশ্চিত এতক্ষনে সে আমার জন্যে মারাত্মক দুশ্চিন্তা করছে'।

'পাহাড়ি পথের চড়াই উতরাই পেরিয়ে কিছুটা এগোলে একটা রাস্তা আছে। ওল্ড কোচ রোড। রোজ শেষ রাতে সেই পথে কয়েকটিমাত্র কামরা নিয়ে একটা ট্রেন যায়। কোথাও থামুক না থামুক, ডুলডিং-এ সে ট্রেন থামবেই', বলে আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল লোকটা, 'হাতে আরো সোয়া ঘন্টাটাক সময় আছে। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়লে সে ট্রেন পেয়ে যাবে তুমি'। আমি ইতস্তত করে বলি, 'এই দুর্যোগের রাতে...'

'বরফ পড়া থেমে গেছে', কঠিন গলায় বলে ওঠে লোকটা, 'জ্যাকব ওল্ড কোচ রোড পর্যন্ত সঙ্গে যাবে তোমার। আশা করি তারপরের রাস্তাটুকু তুমি নিজেই চিনে নিতে পারবে। মনে রেখো, ওল্ড কোচ রোডের পাঁচিল বরাবর খানিকটা হেঁটে গেলেই সাইনপোস্ট স্টেশন। ওখানে ট্রেন থামলে উঠে পোড়ো তুমি'। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে তখন। জ্যাকব আমার হাতে হাত রাখল, 'চলো। বেরিয়ে পড়তে হবে। আর সময় নেই। এরপর দেরি হয়ে যাবে...' আমি চমকে তাকালাম জ্যাকবের দিকে। উঃ কী অসম্ভব ঠান্ডা তার স্পর্শ।

৩

জ্যাকব সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে খসখসে গলায় বলে উঠল, 'ওই যে ওল্ড কোচ রোড। একটা কোমর সমান উঁচু ভাঙা ভাঙা পাঁচিল দেখছেন?'

'হ্যাঁ', আমি বললাম। আকাশ আগের চেয়ে কিছুটা পরিস্কার হয়েছে এখন। আবছা কুয়াশামাখা আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। সেই কুয়াশার চাদরের ওপাশে পাঁচিলটা চোখে পড়ল আমার। ওই পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে রেললাইন এগিয়ে গেছে। সোজা, উঁচুনীচু পথ বেয়ে। জ্যাকব হঠাৎই হেসে উঠল। হালকা হাওয়ার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল সেই হাসি। আমার কেমন ভয় করে উঠল।

জ্যাকব বলতে লাগল, 'কুড়ি বছর আগে এই লাইনে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা হয়েছিল। দুদিকের পাঁচিলের মধ্যিখানে যে রাস্তাটা সেটা সরু। প্রায় পাঁচিলের গায়ে লেগে লেগেই চলে ট্রেনটা। ওখানে পাঁচিল ভেঙে গিয়েছিল। লাইনটাও একটা ধস নেমে আচমকা নেমে গিয়েছিল অনেক অনেক নীচে। এই ধরুন প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মতন। এই পথ দিয়েই আরো এগিয়ে ট্রেনটা বাঁ পাশের ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল সেই ভাঙা রাস্তা ধরে নীচে। সেইদিন সে ট্রেনে কত্তার ছেলে ছিল। তারপর আরো অনেকে...কেউই বাঁচেনি। বাঁচা সম্ভবই ছিল না, বুঝছেনই তো বলুন...তারপর থেকেই আমার কত্তা অমন', বলে থেমে গেল জ্যাকব। তারপর আবার একবার সেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা হাসিটা হেসে বলল 'আসি। বাকি পথটুকু একলাই চলে যান ডানদিকে পাঁচিলটাকে নিশানা করে। শুধু মনে রাখবেন সাইনপোস্ট...' জ্যাকব আর ফিরে তাকাল না। ফিরতি পথে হাঁটতে লাগল হনহন করে।

একা হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গা শিরশির করে উঠল আমার। ভয় ক্রমশই চেপে বসতে লাগল মনের মধ্যে। এই নিঝুম রাত্তিরে এই রহস্যময় রেলপথ যেন গিলে খেয়ে নিতে আসছিল আমাকে। পা ভারী হয়ে আসছিল ক্রমশ। অথচ এগোতে আমায় হবেই। আমি নিজেই প্রাণপনে নিজেকে ভরসা যোগাতে যোগাতে পাঁচিলটাকে ডানহাতে রেখে হাঁটছিলাম।

পাঁচিলটা অধিকাংশ জায়গাতেই ধসে পড়েছে। বরফে জমা পুরনো রেলপথ চুপিসাড়ে শুয়ে আছে সেই বরফের নীচে। কেন যেন মনে হল এই পথ কখনও শেষ হবে না। শেষ হবে না আমার পথ চলাও। ডুলডিং গ্রামে অপেক্ষায় থাকা স্ত্রীর কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল আর কখনও কোনোদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল দূর থেকে ঠিকরে আসা কুয়াশা চেরা আলোর রেখা পথে এসে পড়ায়। সঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা একটা ঝমাঝম ঝমাঝম শব্দে। ট্রেন আসছে। চমকে রেললাইনের ওপর থেকে সরে এলাম আমি। দূরে ট্রেনের আলো দেখতে পাচ্ছি এখন। অবাক হয়ে গেলাম। বেখেয়ালে সাইনপোস্ট স্টেশন কি তবে ফেলে এলাম আমি? ট্রেনটা কাছে চলে এসেছে। গতি কমার লক্ষন নেই তার এতটুকু। তারমানে আশেপাশে স্টেশন থাকার সম্ভাবনাই নেই কোনো। তাহলে সাইনপোস্ট স্টেশন? কখন ছেড়ে এলাম তাকে? প্রানপনে হাত নেড়ে আর চিৎকার করে ট্রেনটাকে থামানোর চেষ্টা শুরু করলাম আমি। সম্ভবত চালক দেখতে পেয়েছেন আমায়। গতি কমে এল ট্রেনের। আমার সামনে দিয়ে একটা একটা করে অন্ধকার নিঝঝুম কামরাগুলো সরে সরে যাচ্ছে ধীর গতিতে। আমি প্রাণপনে একটা কামরার দরজার হাতলটাকে আঁকড়ে ধরে টান দিলাম গায়ের জোরে। দরজা খুলতেই লাফিয়ে উঠে পড়লাম কামরার মধ্যে। আর কী আশ্চর্য, আমি সেই অন্ধকার কামরায় উঠে পড়তেই গাড়ির গতি বেড়ে গেল। দুলে উঠল কামরাগুলো প্রবলভাবে। মনে হল যে কোনো সময় তারা যেন দুলুনির চোটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ট্রেন থেকে।

ট্রেনের মধ্যেটা এমনই নিস্তব্ধ যে আমি ভেবেছিলাম এই কামরায় যাত্রী আমি একা। ভেতরে ঢুকে সিটে বসে পড়লাম আমি হেলান দিয়ে। চোখ বুজে এল। কিন্তু একটা মারাত্মক অস্বস্তি ক্রমশই ঘিরে ধরল আমায়। একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে আসছে। মাংস পচা গন্ধ। মাটির নীচে দীর্ঘদিন আটকে থাকা সোঁদা গন্ধ। আমার মনে হল ভুল করে কোনো প্রাচীন গোরস্থানে ঢুকে কবরের মুখগুলো যেন ভুল করে খুলে দিয়েছি আমি। আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে আমি চোখ মেললাম। আর তখনি চোখে পড়ল কামরার মধ্যে আমি একা নই।

বাইরে আকাশে চাঁদ উঠেছে তখন। চাঁদের আলো চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছে জানালার শার্সি টপকে রেলগাড়ির কামরার মধ্যে। সেই আলোয় আমার সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম আমি। সংখ্যায় তারা তিন জন। ওরা সকলেই চুপ করে বসেছিল। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলাম।

বললাম, 'আজ বড্ড ঠান্ডা পড়েছে'। তারা আমার দিকে তাকাল কিন্তু উত্তর দিল না। আবার বললাম, 'বাইরেটা খুব ঠান্ডা আজ'। এবারেও তারা সাড়া দিল না কেউ। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে।

এবার আমি ভালো করে চেয়ে দেখলাম তাদের দিকে। প্রত্যেকেরই মুখ কাগজের মতন সাদা আর খসখসে। মুখে অভিব্যাক্তি নেই কোনো। শুধু তাদের চোখদুটো যেন জ্বলছিল। একটা অদ্ভুত অপার্থিব আলো ঠিকরে আসছিল তাদের স্থির, পাথুরে চোখগুলো থেকে। সেই বদখত গন্ধটা যেন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে কামরার মধ্যে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসছে ক্রমশ, তবু আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'আমি কি জানলার কাচটা একটু তুলতে পারি?' এবারেও নিরুত্তর রইল তারা।

অসহায়ের মতন চিৎকার করে বার বার একই প্রশ্ন করতে লাগলাম আমি। কিন্তু কামরার অসহ্য নীরবতা ভেঙে তারা কথা বলে উঠল না। আমি নিজেই কামরার জানলা খুলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলাম। জানলার কাচে বহু বছরের নোঙরা জমে শক্ত হয়ে আছে। কাচ নাড়ানোর উপায় নেই।

আমি এবারে ভালো করে তাকালাম কামরার ভেতর দিকে। সেখানেও সর্বত্র আবর্জনা আর আবর্জনা। কামরাটাও জীর্ণ, নড়বড়ে, ভাঙ্গাচোরা। মেঝের ওপরে জঞ্জালের স্তুপ। দেখলেই বোঝা যায় যে কোনো মুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়বে পুরো কামরাটাই। এবার আমার কাছে সব যেন স্পষ্ট হতে লাগল। আমার সহযাত্রীদের রক্তহীন ঠোঁট, শুকনো সাদা মুখ, জ্বলন্ত চোখজোড়া সবকিছু থেকেই মৃত্যুর স্পষ্ট গন্ধ উড়ে আসছে। তাদের গা থেকে, চুল থেকে কবরের গন্ধ উঠে আসছে তখন। একটুক্ষন খুঁটিয়ে দেখে তাদের অন্তত দুজনকে বেশ চিনেও নিতে পারলাম আমি। আমাকে তাদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে একসাথে হো হো হি হি করে হাসতে শুরু করল তারা। হাসির দমকে দমকে তাদের হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে খটাখট শব্দ হতে লাগল।

আমার এতটুকুও সংশয় রইল না যে আমার সহযাত্রীদের একজনও আর বেঁচে নেই। বেঁচে আছে শুধু তাদের ভয়ানক আগুনে চোখগুলো। ঝমঝম শব্দ তুলে দুলতে দুলতে তীব্র গতিতে সেই ভাঙাচোরা পুরনো ট্রেনটা ছুটে চলেছে অজানা গন্তব্যের দিকে। আমার সহযাত্রীরা গোল হয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। হাওয়ায় হাওয়ায় আহ্বান বাজছে, 'আয়, আয়, আয়...' আমি সিট থেকে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। একটানে খুলে ফেললাম দরজা। আর তখনই চোখে পড়ল একটা পরিত্যক্ত প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে যাচ্ছি আমরা দ্রুত গতিতে। প্ল্যাটফর্মের গ্যাসের আলো নিভে আছে, তবুও চাঁদের আলোয় দিব্বি স্টেশনের নামটা পড়তে পারলাম। একটা বোর্ডের ওপরে আবছা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া অক্ষরে লেখা রয়েছে 'সাইনপোস্ট'। খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁপ দেব মনস্থ করছি তখন। হঠাৎই খেয়াল করলাম সামনে রেললাইন বলে কিছু নেই আর। রাস্তাটা দুম করে অনেক, অনেক নীচে নেমে গেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। এরপর একটা ভয়ংকর কান ফাটানো আওয়াজ হয়েছিল মনে আছে। আর কিচ্ছুটি মনে ছিল না আমার। আজ অব্দি মনে করতে পারিনিও আর কিছু।

যখন জ্ঞান ফিরেছিল, আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার পাশে ঝুঁকে রয়েছে আমার স্ত্রীর উদ্বেগমাখা মুখ। ক্লান্ত রুগণ গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী হয়েছিল আমার?'

'তুমি পড়ে গিয়েছিলে গো', আমার স্ত্রী আমার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'সেই যেখানে পরিত্যক্ত রেলপথ শেষ হয়ে গেছে তার নীচের পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিলে তুমি। নেহাত কাল রাতে প্রচুর বরফ পড়েছিল তাই বেঁচে গেছ তুমি। ওই নরম বরফে পড়েও হাত ভেঙে গেছে তোমার, মাথায় আঘাত...কাল যদি অত বরফ না পড়ত...' কথা না বলে মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না আটকেছিল সে। আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'আর এখানে এলাম কীভাবে?'

'দুজন মেষপালক হারিয়ে যাওয়া ভেড়া খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল তোমায়', ও বলেছিল, 'ভাগ্যিস তোমার পকেটে আমাদের হোটেলের নাম ঠিকানা আর তোমার নাম লেখা কাগজ ছিল...'

আমার অ্যাকসিডেন্টের আসল কারণ ওকে বলিনি, কিন্তু ডাক্তারকে বলেছিলাম। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষুধার্ত মস্তিস্কের এ এক অলীক স্বপ্ন। মাথায় আঘাত লাগার জন্যেও এমন ভ্রম হতে পারে বলে তাঁর অভিমত। আমি তর্ক করিনি। করার প্রয়োজনও তো ছিল না। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, কীই বা যায় আসে আমার। আমি নিজে তো জানি, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে পরিত্যক্ত ওল্ড কোচ রোডের ভূতুড়ে কামরায় সত্যি সত্যিই আমি সেই শেষ রাতের অলৌকিক যাত্রায় অংশ নিয়েছিলাম।

(এমিলিয়া বি এডওয়ার্ডস এর THE GHOST COACH গল্পের ছায়া অবলম্বনে)



বংশীবটতলার ওদিকে



১

ভুবনপুরে রঞ্জন দত্তর কোনও কালেই সুনাম ছিল না। পড়াশোনায় কোনওদিনই খুব একটা মতি ছিল না তার। ছেলেবেলা থেকেই সে নিদারুণ বখাটে আর দুরন্ত। তা ছাড়া তার দৌরাত্ম্যে আশপাশের বাড়ির বাগানে আম-কাঁঠাল পাকার জো থাকত না। রঞ্জনের মা নিতান্ত ভালোমানুষ। কম বয়সে স্বামীকে হারিয়ে এমনিতেই শোকে-তাপে কাতর। তার উপর ছেলের এই দস্যিপনায় শরীরে, মনে আরও ভেঙে পড়লেন তিনি। রঞ্জনের যখন বছর পনেরো বয়স, তখন দেহ রাখলেন। রঞ্জন ছিল দস্যি। মা মারা যাওয়ার পর সে হয়ে গেল দুর্বৃত্ত। দুষ্কৃতীদের দলে ভিড়ে কী একটা খুনখারাপির মামলায় ফেঁসে গিয়ে কিছুকাল পর জেল হয়ে গেল তার।

জেল থেকে ফেরার পর রঞ্জন দত্ত মানুষটা কেমন যেন পালটে গেল। চুপচাপ। কথা বলে না কারও সঙ্গে। কারও ক্ষয়ক্ষতি তো করেই না, উপরন্তু বিপদে-আপদে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে প্রাণপণে। এমন করে ক'দিন চলার পর রঞ্জন আবার একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল। সারা ভুবনপুর জুড়ে হইচই পড়ে গেল। কেউ বলল, ও ব্যাটা আবার নিশ্চয়ই কোনও কুকর্ম করে শ্রীঘরে ঢুকেছে। কেউ-কেউ আবার দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, 'আহা রে, রঞ্জনটা নিজের ভুল বুঝতে পেরে শুধরনোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর পুরনো সাঙ্গো-পাঙ্গরা কি আর ছাড়ে ওকে? নির্ঘাত গুমখুন করে দিয়েছে ওরা ছেলেটাকে।

তবে এত জল্পনা-কল্পনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মাত্র দু-চারমাস পরেই ফিরে এল রঞ্জন। তবে যে ফিরল, সে আর রঞ্জন দত্ত নয়, দস্তুরমতো রঞ্জনতান্ত্রিক। পরনে রক্তবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল। কোথাকার কোন এক ভয়াবহ শ্মশানের জাঁদরেল তন্ত্রসাধক নিজে ডেকে এনে নাকি মন্ত্র দিয়েছেন রঞ্জনকে। তারপর পাশে বসিয়ে একের পর এক শিখিয়ে দিয়েছেন মারণ উচাটন, বশীকরণের সব গুহ্যতত্ত্ব। রঞ্জন নিজের চোখে নাকি তার গুরুবাবার আশ্চর্য সাধনক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে এসেছে সেই অমাবস্যার নিশুতি রাতে।

দাসবাবুর বাড়িতে কাজ করতে আসে মানকের মা। সে তো এখন রীতিমতো রঞ্জনবাবার ভক্তই হয়ে গিয়েছে। জনে-জনে বলে বেড়াচ্ছে যে, রঞ্জনতান্ত্রিকের অসীম ক্ষমতা। ইচ্ছে করলেই দিনকে রাত করে ফেলতে পারে সে। মৃত মানুষরা তার চারপাশে অনুগত ভৃত্যের মতো ঘুরঘুর করে সারাক্ষণ। যে-কোনও লোকের, যে-কোনও সমস্যায় রঞ্জনঠাকুরের দ্বারস্থ হলে পাঁচ মিনিটেই প্রতিকার। একটা তেল-সিঁদুর মাখানো মড়ার মাথার খুলি আছে তার। ওর উপর ফুল দিয়ে কী সব মন্ত্র আওড়াতে থাকে সে, আর সঙ্গে-সঙ্গে দুলে ওঠে খুলিটা। ব্যস, কাজ শেষ। রঞ্জনবাবার মাথার মধ্যে ঢুকে সব সমস্যার সমাধান বলে দিয়ে যেতে থাকে প্রেতাত্মারা।

মানকের মায়ের কথা প্রথমটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু রঞ্জনের নামে অকথা-কুকথা বলার ক'দিনের মধ্যে যখন হরেন দুধওলার গাভীন গোরুটা হঠাৎ মরে গেল মাঠে চরা খেতে গিয়ে, তখন থেকে এলাকার লোক আর বিশেষ ট্যাঁ ফোঁ করে না রঞ্জনকে নিয়ে। বরং সকলে মিলে চাঁদা তুলে

একটা মন্দির তৈরি করে দিয়েছে রঞ্জনের আবদারমতো। আজকাল ভালো ভিড়ও হচ্ছে সেখানে নিত্যদিন। তবু লোকজনের মনে সন্দেহ ও প্রশ্নের অন্ত নেই, রঞ্জনের এই সব কাণ্ডকারখানাকে ঘিরে।

২

রঞ্জন চিরকালই ডাকাবুকো। ভূতের ভয় তার কোনওকালেই ছিল না, আজও নেই। রাত-বিরেতে শ্মশানে-মশানে বিস্তর ঘোরাঘুরি করেছে সে। ডাকাতের দলে ভিড়ে ডাকাতিও করেছে এক সময় অনেক। রঞ্জনের ভগবানে বিশ্বাস নেই। অতএব পাপ-পুণ্যের পরোয়াও সে করে না। রঞ্জন মানুষ খুন করে জেল খেটেছে। মানুষকে ঠকিয়ে পথে বসিয়েছে অনেকবার। এসব নিয়ে কোনও অনুশোচনা নেই তার। বরং তার স্থির বিশ্বাস, ইদানীং তাকে তান্ত্রিকের ভেক ধরতে হয়েছে খানিকটা বাধ্য হয়েই। আসলে, এখনও তো বেশ কিছু মানুষের এই সব তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের উপর একেবারে অন্ধ আস্থা। তো, সেই বিশ্বাসটাকে কাজে লাগিয়ে বেশ সহজেই দু'পয়সা করে নেওয়া যায়। খাওয়া-পরার কোনও অভাব থাকে না। আর, বেশ একটু মান্যিগণ্যিও করে লোকে। এই মান্যিগণ্যির ব্যাপারটায় খুব লাভ আছে রঞ্জনের। সে জানে যে, এই লাল পোশাক আর ধর্মের নাম বুজরুকির আড়ালে তার মাঝরাতের যে আসল ব্যবসাটা, সেটাকেও যদি চালিয়ে নেওয়া যায় সন্তর্পণে, তা হলে পুলিশও চট করে সন্দেহ করতে পারবে না তাকে।

রঞ্জন বরাবরই ধড়িবাজ। তান্ত্রিক হিসেবে পসার জমানোর জন্য হরেন দুধওলার গোরুটাকে সে-ই মেরেছে ঘাসের সঙ্গে বিষ খাইয়ে। মড়ার খুলির নড়াচড়াটাও তারই হাতের কারসাজি। রঞ্জনের কারবার বেশ ভালোই চলছিল। লোকজনও আসছে ভালোই। মন্দিরে টাকা-পয়সাও মন্দ পড়ছে না। তবু আজ দিন-দুই হল, একটা ব্যাপারে ভারী খটকা লাগছে রঞ্জনের। ঠিক ভয় না পেলেও একটা অস্বস্তি জমা হচ্ছে মনের মধ্যে। প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পারলেও এখন রঞ্জনের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজকাল মড়ার খুলিটা মাঝেমধ্যে সত্যি-সত্যিই যেন আপনা থেকে নড়ে উঠছে তার হাতের নীচে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করছে রঞ্জন। ইদানীং রাতে শুতে গেলেই তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, কারা যেন সব ফিসফাস করছে তার বিছানা ঘিরে। রাতে কখনও ঘুম ভেঙে চোখ খুললেই মনে হয় দপদপে আগুন-চোখ নিয়ে কারা যেন মশারির বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সত্যি বলতে কী, গত তিন-চার রাত ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি রঞ্জন।

এখন শীতের সময়। বেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ঠান্ডার জন্য এদিকটা লোকজন বেশি আসে না। আসলে, নির্জনতা আর গাছপালার জন্য ঠান্ডাটা এদিকে যেন একটু বেশি গায়ে লাগে। তা ছাড়া তাকেও লোকজন একটু ভয়-টয় পায়। তার নামে এলাকায় অনেক গল্প-টল্পও রটেছে ইদানীং। সে নাকি সন্ধের পর ভূতেদের নিয়েই পড়ে থাকে। মৃত লোকদের ডেকে নিয়ে কথা বলে তাদের সঙ্গে। ছোট্ট মন্দির কাম বসতবাড়ির বারান্দায় বসে আপনমনে হাসে রঞ্জন। ভাবে, সত্যি-সত্যিই যদি ভূত-

প্রেত বলে কিছু থাকে, তা হলে তাদের বাগ মানাতে পারলে মন্দ হয় না। রাতের অন্ধকারে তাদের দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নিয়ে কোটিপতি হয়ে যেত সে রাতারাতি। নিজের হাতে খুন-খারাপি, ডাকাতি-টাকাতির ঝামেলা নিতে হত না আর। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রঞ্জন। অনভ্যাসে হাত বসে যাচ্ছে তার। পুরনো ব্যবসাটা এবার নতুন করে শুরু করলে মন্দ হয় না।

কথাটা ভাবতে-ভাবতেই একটা হালকা পায়ের শব্দে চমকে সামনে তাকাল রঞ্জন। আর তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। একটা বছর বারো-তেরোর বাচ্চা ছেলে শুকনো মুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। রঞ্জন সেদিকে তাকাতে ছেলেটা আরও একটু সামনে এগিয়ে এল। বেলাশেষের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। সেই আলোয় রঞ্জন তাকে একটু জরিপ করে নিল। ছেলেটার পরনে হাফপ্যান্ট, পা খালি আর গায়ে একটা কালচে চাদর জড়ানো। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো। চেহারার স্পষ্ট দারিদ্রের ছাপ। সরু চোখে তার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভারী গলায় জিগ্যেস করল রঞ্জন, 'কী চাই? এখানে এসেছিল কেন, সন্ধেবেলা?'

'আমার বড্ড বিপদ বাবা', কাঁপা-কাঁপা গলায় উত্তর দিল ছেলেটা।

'কী বিপদ?' আবার জিগ্যেস করে রঞ্জন।

'আমার মায়ের ভারী অসুখ...'

'অসুখ তো ডাক্তারের কাছে যা। আমার কাছে এসেছিস কেন?'

'অসুখটা যে অন্যরকম। হালদার ডাক্তার বললেন যে, ওষুধ-বিষুধে কাজ হবে না। ওঝা ডাকতে হবে অসুখ সারাতে গেলে', বলতে-বলতে কষ্টে গলা বুজে আসে ছেলেটার।

'হালদার ডাক্তার। নাম শুনিনি তো কখনও।' অবাক গলায় বলে রঞ্জন, 'চেম্বার কোথায়? মানে, কোথায় বসেন?'

'ওই তো, ওই দিকে' আঙুল তুলে বলে ছেলেটা। কিন্তু ঠিক কোন দিকে যে দেখায়, বুঝতে পারে না রঞ্জন। ছেলেটার কাছে একটু সরে এসে কৌতূহলী গলায় জিগ্যেস করে সে, 'তোর মায়ের হয়েছেটা কী?'

'মাথার গন্ডগোল। রাত গভীর হলেই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।'

'সে কী? তোর বাবা কিছু বলেন না।'

'বাবা তো নেই আমার।'

'নেই মানে?'

'হারিয়ে গিয়েছে', বলেই ছুটে এসে রঞ্জনের পায়ের উপর পড়ে ছেলেটা। কাঁদতে-কাঁদতে বলতে থাকে, 'মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আপনি একবার আমার সঙ্গে চলুন আমাদের বাড়ি। আমার মাকে আপনি যেভাবেই হোক ঠিক করে দিন বাবা।'

রঞ্জন ছেলেটাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করায়। ছেলেটার হাত দুটো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে শীতে। একটু মায়া হয় রঞ্জনের, ছেলেটার জন্য। কিন্তু পরক্ষণেই সামলেও নেয় নিজেকে। যে পেশায় নিজেকে সে জড়িয়েছে, সেখানে দয়ামায়ার লেশও যদি মনে থেকে যায়, তা হলে কাজের খুব

মুশকিল। কাজেই একটু চুপ করে থেকে সে বলে, 'দ্যাখ, তোর মায়ের উপর যে অশুভ শক্তি ভর করে আছে, মায়ের কৃপায় তাকে এখনই দূরে সরিয়ে দিতে পারি ঠিকই, কিন্তু তাতে তো খরচ অনেক। যজ্ঞ করতে হবে সারারাত।'

'খরচ,' বলে বিষণ্ণ মুখে কী যেন খানিক ভাবল ছেলেটা। তারপর তার মলিন হাফপ্যান্টের পকেট থেকে দুটো চকচকে গোল চাকতি বের করে বাড়িয়ে দিল রঞ্জনের দিকে।

চাকতি দুটো হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল রঞ্জন। খাঁটি রুপোর টাকা ওগুলো।

রঞ্জনকে টাকা দুটোর দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসে ছেলেটা। তারপর থেমে-থেমে বলে, 'আমরা তো গরিব, কী আর দেব আপনাকে বাবা। তবে এরকম খুচরো টাকা আমাদের কাছে অনেক আছে। ক'দিন আগে উঠোনের একধারে মাটি কোপাতে-কোপাতে পেয়েছি। একটা মাটির কলসিতে রাখা ছিল মুখবাঁধা অবস্থায়!'

শুনতে-শুনতে চোখ দুটো চকচক করে ওঠে রঞ্জনের। টাকা-পয়সার কথা সে তুলেছিল ছেলেটাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই। কিন্তু রুপোর টাকাগুলো দেখার পর এত দ্রুত সিদ্ধান্ত বদল করল সে। রুপোর বাকি টাকাগুলো আজ রাতেই নিজের হাতে নিয়ে নিতে হবে। তার জন্য যে কাজই করতে হোক না কেন, কোনও কিছুতেই পিছপা হওয়া যাবে না। হোক উন্মাদ, তবু রুপোর টাকাগুলো হাতানোর সময় ছেলেটার মা যদি কোনও ঝামেলা-টামেলা পাকানোর চেষ্টা করে। ঝুঁকি না নিয়ে ঘরে ঢুকে ওর মাঝারি মাপের ছোরাটাকে লাল পোশাকের আড়ালে কোমরে গুঁজে নেয় রঞ্জন। কতদিন হয়ে গেল ব্যবহার করা হয়নি ছোরাটা। আজ অনেকদিন পরে ওটাকে মুঠোয় ভরে মনের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়। উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে রঞ্জনের চোখ দুটো।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে সে ছেলেটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভারী গলায় বলে, 'তোর বাড়িটা কোন দিকে?'

'আমার বাড়িতে আপনি তা হলে যাচ্ছেন বাবা?' ছেলেটা খুশি হয়ে জিগ্যেস করে।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' বলে নিচু হয়ে মড়ার মাথার খুলিটা হাতে তুলে নেয় রঞ্জন।

'আমার বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। ওই যে ঋষি বঙ্কিমনগর, ওটা পেরিয়ে বেদেপাড়া, তারপর রেললাইন পেরিয়ে খানিক হাঁটলেই পৌঁছে যাব আমরা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।' বলে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে ছেলেটা। রঞ্জন অনুসরণ করে তাকে নিঃশব্দে।

৩

বেদেপাড়া পার হয়ে রেললাইনটা টপকে দাঁড়াল ছেলেটা। রঞ্জন বলল, 'কী রে, দাঁড়ালি কেন?'

'সোজা রাস্তায় গেলে আমাদের বাড়ি বেশ ঘুরপথ। ডান দিকে বেঁকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শর্টকাট রাস্তায় যাব?' ছেলেটা সরলভাবে জিগ্যেস করে রঞ্জনকে।

'তাড়াতাড়ি হয় যদি তো চল', রঞ্জন নির্বিকারভাবে জবাব দেয়।

আর কোনও কথা না বলে ওকে নিয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বাঁক নেয় ছেলেটা। তারপর পায়ে-হাঁটা পথ ধরে আম আর পেয়ারা গাছের বাগানের মধ্যে ঢুকে যায়। গাছগুলো বেশিরভাগই বড় বড়। ভিতরটা ঝুপসি অন্ধকার। রঞ্জনের মনে হল, তার হাতে ধরে থাকা মড়ার মাথার খুলিটা যেন থিরথির করে কেঁপে উঠল হঠাৎ। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রঞ্জনের। আর তখনই তার কাঁধের উপর কে যেন বড় করে নিশ্বাস ফেলল একটা। চমকে উঠে থেমে গেল রঞ্জন। পিছনে তাকাল। কিন্তু অন্ধকার আর কালো-কালো গাছপালা ছাড়া কিচ্ছু চোখে পড়ল না তার।

ছেলেটার হাসির শব্দে চমক ভাঙল রঞ্জনের। ছেলেটা হাসতে-হাসতেই জিগ্যেস করল, 'কী, ভয় পেলেন?'

'ধুস', বলে ওর কথাটা উড়িয়ে দিতে গেল রঞ্জন। কিন্তু হঠাৎ খুকখুক করে তার ঘাড়ের পাশ থেকে কে যেন হেসে উঠতে কথা আটকে গেল তার।

'কী হল?' ছেলেটা আবার জিগ্যেস করল।

'কে হাসল বল তো আমার কথা শুনে?' কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করে রঞ্জন। তারপর কেমন বিভ্রান্তের মতো ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুই হাসিসনি তো আমার কথা শুনে?'

'আমি হাসব কেন?' অবাক গলায় বলে ছেলেটা।

'তা হলে আমি কি...'

'হ্যাঁ, আমার হাসিই শুনেছ রঞ্জন,' রঞ্জনের কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ওর সামনে উঠে দাঁড়ানো একটা লোক।

রঞ্জনের হাতে ধরে থাকা খুলিটা হঠাৎ যেন বড় বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভীষণ ভয় পেয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কোমর থেকে একটানে ছোরাটাকে বাইরে বের করে আনে সে। তারপর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটা চালিয়ে দেয় লোকটার শরীরে। আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুই হল না লোকটার। রঞ্জনের মনে হল, ছোরাটা যেন বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে গেল।

লোকটা আবার হাসতে শুরু করল হাঃ হাঃ করে। হাসিটা যেন অন্যরকম, হিংস্র, ভয়ংকর।

লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে জীবনে এই প্রথমবার অন্য রকম এক আশঙ্কায় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে রঞ্জন। আর কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'কে আপনি?'

'চিনতে পারছ না? আর একটু ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো তো আমার মুখের দিকে,' হিসহিসে গলায় বলে ওঠে লোকটা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে তখন। গাছের ফাঁক-ফোকর গলে টুকরো-টুকরো আলো এসে পড়েছে লোকটার মুখে। সেই আলোয় লোকটার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়েই চিৎকার করে ওঠে রঞ্জন,

'এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। জেলে যাওয়ার অন্তত দেড় বছর আগে নিজের হাতে খুন করেছিলাম তোমায়।'

লোকটা আবার হাসে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, 'এই পৃথিবীতে কী সম্ভব আর কী অসম্ভব, তার কী-ই বা জানো তুমি রঞ্জনডাকাত? না হলে আমার মৃত্যুর চার বছরের মধ্যে না-খেতে পেয়ে মরে যাওয়া আমার একমাত্র ছেলেটার ডাকে কি তুমি এত সহজে এসে পড়ো আমার খপ্পরে?'

লোকটার কথায় চমকে উঠে ছেলেটার দিকে তাকায় রঞ্জন, আর আতঙ্কিত চোখে দ্যাখে, ছেলেটার বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু দোল খাচ্ছে একটা ছোট্ট কঙ্কাল, যার শূন্য চোখের কোটরের মধ্যে ধকধক করে জ্বলছে প্রতিশোধের তীব্র আগুন।

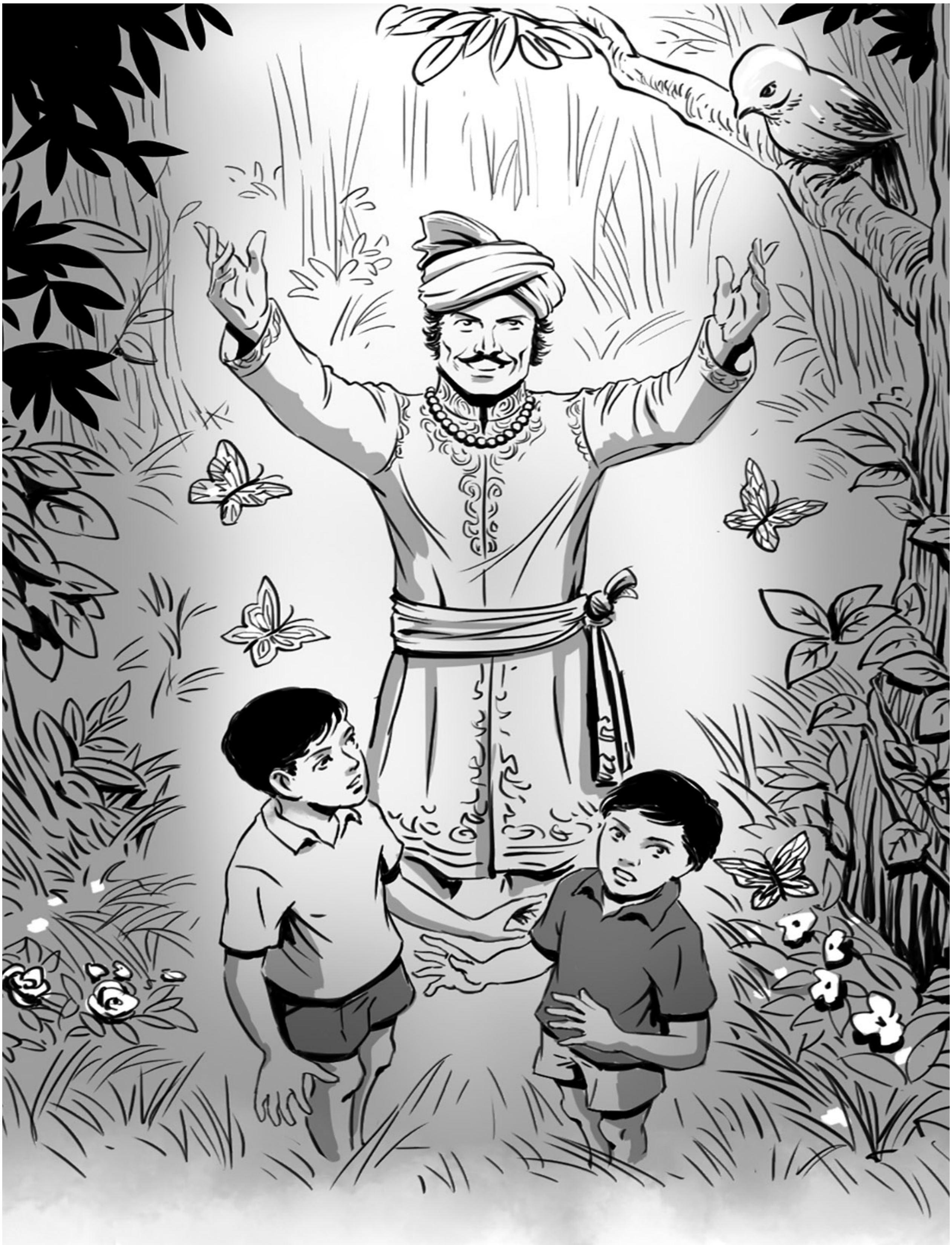
৪

সারা ভুবনপুরে প্রবল হই চই পড়ে গিয়েছে সকাল থেকেই। বঙ্কিমনগর পেরোলে যে বেদেপাড়া, তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে রেললাইন, তার পাশে ভারী রহস্যজনকভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে রঞ্জনতান্ত্রিককে। শরীরের কোথাও একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই। শুধু তার চোখ দুটো বিস্ফারিত এবং আতঙ্কগ্রস্ত। সারা এলাকা প্রায় ভেঙে পড়েছে রেললাইনের ধারে। সকলেই অবাক। রঞ্জনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে চতুর্দিকে হাজার আলোচনা। শুধু বেদেপাড়ার পিছন দিকে বংশীবটতলা ফেলে যে নস্করপাড়া, সেই নস্করপাড়ায় বহুদিন আগে খুন হয়ে যাওয়া নগেন নস্করের পাগল বউটা নাকি সকাল থেকে বারবার ছুটে এসেছে রঞ্জনের মৃত শরীরটার কাছে। আর চিৎকার করেছে গলা ফাটিয়েছে, 'এতদিনে মুরোদ হল? বলি এতদিন কি হাতে জোর ছিল না তোমার?'

তার কথাগুলো পুলিশও নাকি শুনেছে। কিন্তু মাথার ঠিক নেই বলে সেগুলো পাত্তা দেয়নি কেউই।



হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিক



নবীন স্যার যথারীতি আজও দেরি করে ছাড়লেন। ঋক বলেছিল, 'স্যার অংকটা মিলছে না যখন, আজ থাক না। পরের দিন দেখা যাবেখন'।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নবীন স্যার অংকটার দিকে চেয়ে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। বসে রইলেন তো বসেই রইলেন। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় হাতে ধরা ফাউন্টেন পেনটার কালি শুকিয়ে গেল, তবু তাঁর সম্বিৎ ফিরল না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত পথ হাঁটছে। সুতনু নিশ্চিত ওর বাড়ির কাছে এসে গেছে এতক্ষনে। মা কে বলে এসেছে যদিও সুতনু এসে গেলে একটু বসতে বলতে। কিন্তু কতক্ষনই বা বসবে। অধৈর্য হয়ে শেষে যদি একা একাই চলে যায় ও। মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে ঋক। আর বোধহয় দেখা হবে না অমন আশ্চর্য ম্যাজিক।

হরেন সমাদ্দারের কথা ও আগে জানত না। সুতনুই ক'দিন আগে বলেছে ওকে তাঁর আশ্চর্য জাদুর খেলার কথা। সুতনু নিজেও অবশ্য তাঁর খেলা দেখেনি। চেনেও না লোকটাকে। ও আবার হরেন সমাদ্দারের কথা শুনেছে ওর ছোটকাকার কাছে। সুতনুর ছোটকাকা দেশে বিদেশে ঘোরা মানুষ। লেদার গুডস এর ব্যবসা। কত দেশ ঘুরেছেন। মানুষ দেখেছেন কত রকম। ঝুলিতে তাঁর হরেক কিসিমের গল্প। কোনো গল্প শুনলে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তো কোনো গল্প শুনলে হাসতে হাসতে খিল ধরে যায় পেটে। সেই ছোটকা যখন খোলা গলায় হরেন সমাদ্দারের জাদুর খেলার প্রশংসা করেন তখন সে কথা তো মানতেই হয়। সুতনু চোখ বড় বড় করে বলছিল, 'ছোটকা কী বলে জানিস?'

'কী?' আগ্রহ নিয়ে জিগ্যেস করেছিল ঋক।

'ছোটকা বলে কোথায় লাগে তোদের কলকাতার মস্ত মস্ত সব ম্যাজিশিয়ানের খেলা। হরেন সমাদ্দারের কাছে সব নস্যি'।

'তাই?' ঋকের মুখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়।

'তাই না তো কী', সুতনু উত্তেজিত ভঙ্গীতে বলে, 'ছোটকা বলছে মানে তুই বুঝতে পারছিস না... অন্য জাদুকরেরা তো চোখে ধুলো দেন দর্শকদের, উন্নত প্রযুক্তিরও সাহায্য নেন অনেক সময় চিত্তাকর্ষক সব খেলা দেখাতে, কিন্তু হরেন সমাদ্দারের জাদুর খেলায় কোনো ফাঁকি নেই। যা দেখবি সবটাই আসল, সবটাই খাঁটি'।

এই হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিক দেখারই হঠাৎ করে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে সুতনু আর ঋকের। এ খবর আর সুযোগ দুটোই অবশ্য এসেছে সেই ছোটকারই সৌজন্যে। কালিকাপুর উদয়ন সংঘের উদ্যোগে সমাজসেবী কালিদাস কংসারী মেমোরিয়াল হলে আজ সন্ধে ছটা থেকে জাদুকর হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিক শো। প্যাট্রন বলে ছোটকা একটা গেস্ট কার্ড পেয়েছে। দুজন শো দেখতে যেতে পারে সেই কার্ড নিয়ে। তা তিনি সুতনুকে বলেছেন, 'আমি তো হরেন জাদুকরের খেলা দেখেছি কয়েকবার। এবার বরং তোরা দুজনেই যা। তুই আর ঋক মিলে দেখে আয় সত্যিকারের জাদু প্রদর্শনী কাকে বলে'। সেই কার্ডটা সুতনু আর ঋক অন্তত পঞ্চাশ বার দেখেছে গত তিন দিনে। যতবার দেখেছে বুকের মধ্যে অন্য রকম অনুভূতি হয়েছে একটা। মাথায় জরির কাজ করা পাগড়ি

আর পরনে ঝলমলে পোশাক, কার্ডের ওপরের হরেন সমাদ্দারের রঙিন ছবিটা যেন সম্মোহিত করে দিচ্ছিল তাদের।

ঋক বাড়ি ফিরল যখন ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছাড়িয়ে গেছে। সুতনু বসেছিল মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে। ঋককে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল সুতনু, 'এত দেরি করলি তুই। এদিকে এমন গন্ডগোল যে ম্যাজিক শো টা দেখতে পেলে হয়...'

'কেন, কী হয়েছে?' একরাশ উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করে ঋক।

কদমতলার মোড়ে বেলার দিকে কী একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে আজ। ওদিকের সব গাড়ি বন্ধ। নো বাস, নো অটো...'

'সেকি রে তাহলে যাব কী করে?' মাথায় হাত দিয়ে বলে ঋক।

'কী করে আবার, হন্টন...'

'হেঁটে যেতে তো অনেক্ষণ লেগে যাবে রে, প্রায় চল্লিশ মিনিট। এখনই তো সাড়ে পাঁচটা বাজে'। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায় ঋক।

'সেইজন্যেই তো তাড়া দিচ্ছি তোকে', মুখ ভেংচে বলে সুতনু, 'দেরি না করে চল। নাহলে পৌঁছনোর আগেই শো শুরু হয়ে যাবে'।

রাস্তায় বেরিয়ে আর একবার হাতঘড়ির দিকে তাকায় সুতনু। মাথা নেড়ে বলে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল রে ঋক। এক কাজ করি চল। পাকা রাস্তা ধরে না গিয়ে আমরা বরং দীনবন্ধুদার দোকানের পাশ দিয়ে যে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তাটা রেললাইন টপকে কালিঝোরার জঙ্গলের দিকে চলে গেছে ওদিক দিয়ে চলে যাই। সময় আর পথ অনেকটাই কম হবে ওই রাস্তা দিয়ে গেলে।'

'কালিঝোরার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবি এখন, এই অবেলায়?' থতমত খেয়ে বলে ঋক।

'অবেলা আবার কী', ভরসা দেয় ওকে সুতনু, 'গরমের বেলা। সন্ধে হতে প্রায় সাতটা। তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা নির্জন ঠিকই, কিন্তু চলার একেবারে অনুপযুক্তও তো নয়। অন্য লোক যদি ওই রাস্তায় ঢুকতে পারে, আমরা পারব না! আমরা কি অতই ভীতু নাকি? ছোটকা কী বলে জানিস?' দীনুদার দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বুক চিতিয়ে বলে সুতনু।

'কী বলে?' মিনমিনে গলায় বলে ঋক।

'ছোটকা বলে ভয় মানুষের মনে। বাইরের জগতে ভয় বলে কিছু নেই। তুই যদি মনে মনে ভয় পেয়ে যাস, গুচ্ছের ভয় পাওয়ানোর জিনিস এসে ঘিরে ধরে ব্যতিব্যস্ত করে দেবে তোকে। আর যদি ভয়টাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে চলিস, দেখবি ভয় নিজেই ভয় পেয়ে তোর কাছে ঘেঁষতে সাহসই পাবে না আর। আমি তাই সহজে আর ভয় পাই না আজকাল। তুই কি এখনও ছুতোয় নাতায় ভয় পাস নাকি?'

এ কথার উত্তরে তো আর হ্যাঁ বলা যায় না। কাজেই চেষ্টা করে মুখে হাসি টেনে আনল ঋক। সুতনুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'ধ্যাত, কথায় কথায় ভয় পাওয়ার মতন অত বাচ্চা আছি নাকি আর আমরা', তারপর হাঁটতে লাগল নিঃশব্দে।

২

কালিঝোরার জঙ্গল বেশ ঘন। বহু প্রাচীন গাছ আকাশ অন্ধকার করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এই জঙ্গলে। কবে থেকে কে জানে। তাদের গায়ে শেওলা। পরগাছারা তাদের শরীর আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। উঁচু উঁচু গাছের নীচে ঘন ঝোপ ঝাড়। নানারকম ফুল ফুটে আছে সেইসব ঝোপেঝাড়ে। দু একটা লতানো গাছে পাকা লাল টুকটুকে ফল ঝুলে ঝুলে আছে। একটা বুনো জামগাছের ডালে বসে থাকা পাখি ওদের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে দেখতে খিক খিক করে ডেকে উঠল। ঋকের মনে হল পাখিটা যেন বিচ্ছিরি আওয়াজ করে হেসে ওদের উপহাস করছে। কড়া চোখে সে একবার তাকালোও পাখিটার দিকে, কিন্তু পাখিটা পাত্তাই দিল না তাকে। ওদের গায়ের প্রায় পাশেই যে আশশ্যাওড়ার ঘন ঝোপটা তার মধ্যে থেকে দুটো শেয়াল বেরিয়ে এসে ছুট্টে চলে গেল অন্যদিকে।

পায়ে চলা যে পথটা ধরে যাবার কথা বলেছিল সুতনু, সে পথটা চোখেই পড়ে না প্রায়। শুরুতে রাস্তাটা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু জঙ্গল ঘন হয়ে যাবার পরে পথ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বলতে গেলে আন্দাজেই এগোচ্ছে এখন তারা। সুতনুর গলাতেও আগের সেই আত্মবিশ্বাসটা এখন আর নেই। সামনের আরো গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সে এবার কাঁপা গলায় বলেই ফেলল, 'ঋক যদি পথ হারিয়ে ফেলি...এই জঙ্গলের শুনেছি তিনটে মুখ। একমুখে গেলে কালিকাপুরের পথ, অন্যমুখদুটো গিয়ে উঠেছে বারুইপাড়া আর দারিকবাড়ির দিকে। ভুল করে অন্য দিকে চলে গেলে আজ আর কিছুতেই ম্যাজিকটা দেখা হবে না আমাদের'।

'সে তো বটেই, সে তো বটেই', যে গলাটা বলে উঠল সেটা ঋক নয়। সুতনু আর ঋক দুজনেই চমকে উঠল গলাটা শুনে। আর তখনই একেবারে যেন জঙ্গল ফুঁড়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল তাদের সামনে। গায়ে একটা রঙচঙে ঢিলে আলখাল্লা আর পরনে চোপা প্যান্ট। প্রথমটা লোকটাকে দেখেই বেজায় ঘাবড়ে গেল দুজনেই। কিন্তু লোকটা এমন অমায়িক মুখে হাসতে লাগল তাদের দিকে চেয়ে যে ভয়টা ক্রমশ যেন থিতিয়ে এল। সেই লোকটাই কথা বলে উঠল প্রথম, 'তোমরা বুঝি দুই বন্ধু মিলে কালিদাস কংসারি মেমোরিয়াল হলে চলেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'। ইতস্তত ভঙ্গীতে উত্তর দেয় সুতনু।

'কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ কেন? এ রাস্তায় তো চট করে কেউ আসে না!' লোকটা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'বাধ্য হয়ে', ঋক মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিকের আমরা যাকে বলে একেবারে অন্ধ ভক্ত। কিন্তু আজ রাস্তায় কী একটা অ্যাকসিডেন্টের জন্যে গাড়িঘোড়া বন্ধ। দেরি হয়ে যাবার ভয়ে এই রাস্তা ধরেছিলাম আমরা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা ভুল হয়ে গেছে। আমরা বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছি'।

'আসলে হরেন সমাদ্দারের জাদু দেখা আমাদের কপালেই নেই', হতাশ গলায় বলে সুতনু।

'মন খারাপ লাগছে?' লোকটা একগাল হেসে জিজ্ঞেস করে। এ কথায় হাসির কী আছে ভেবে পেল না ওরা দুজনে। মনে মনে বরং রাগ হল। ওদের কষ্টে লোকটার হাসি পাচ্ছে...'

'মন খারাপ করার বোধহয় দরকার নেই', লোকটা আবার বলে উঠল হাসি মুখে।

'কী বলছেন আপনি', প্রতিবাদ করে ওঠে এবার সুতনু, 'জানেন, কত বড় ম্যাজিশিয়ান উনি...ছোটকা বলেছে...'

'জানি। অনেক লোকেই এ কথা বলে। কথাটা শুনতে আমারও বড় ভালো লাগে। কিন্তু কী করি বলো, আজ যে আমার ওখানে পৌঁছনোই হল না...'

'মানে', বিস্মিত ঋক আর সুতনু ভালো করে তাকায় লোকটার মুখের দিকে। কে জানে কেন লোকটাকে যেন বড্ড চেনা চেনা ঠেকছে এখন। কোথায় যেন দেখেছে আগে...হঠাৎ সুতনু পকেট থেকে ছোটকার দেওয়া সেই গেস্ট কার্ডটা একটানে বাইরে বের করে আনল। কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল খানিক অপলকে। তারপর অবাক হয়ে বলে উঠল, 'একি, আপনিই...'

'হ্যাঁ। আমিই জাদুকর হরেন সমাদ্দার'।

'আপনি এখন এখানে?' ঋক জিজ্ঞেস করল।

'আমারও যে বড় রাস্তা দিয়ে পৌঁছনো হল না। রাস্তা তো বন্ধ। গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই আমিও ভাবলাম... কিন্তু এখন শুনছি শো টাই নাকি ক্যানসেল হয়ে গেছে আজ। উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছেন অনিবার্য কারণবশত...'

'ইশ...' হরেন সমাদ্দারের কথা শেষ হবার আগেই আক্ষেপে বলে ওঠে ঋক আর সুতনু। খুব মন খারাপ হয়ে যায় ওদের। এতদিনের আশা, উত্তেজনা... তারপর আজকের এই এত কষ্ট সব, সমস্ত কিছু একেবারে জলে চলে গেল।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে হরেন জাদুকর বোধহয় মনের অবস্থাটা পড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'মন খারাপ কোরো না। এই তো আমাদের দেখা হয়ে গেল কেমন হঠাৎ করে। এখানে, এই জঙ্গলের গোপন মঞ্চে দাঁড়িয়েই আমি যদি আজ জাদুর খেলা দেখাই কেমন হয় তাহলে? এই খেলায় মাত্র দুজনই দর্শক থাকবে আজ। শুধু তোমরা। আর কেউ এই ম্যাজিক দেখার সুযোগ পাবে না। আমার জীবনের সেরা জাদু আজ তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে যাব আমি।'

'সত্যি?' আনন্দে ঝকমক করে উঠল ঋক আর সুতনুর চোখগুলো।

'একশ বার', বলে একটু দাঁড়ালেন জাদুকর সমাদ্দার। তারপর বললেন, 'এই পোশাকে কী জাদুর খেলা মানায়?'

'ঠিক', মাথা নাড়ে ঋক। সুতনুও সমর্থন জানায় তাকে। হরেন সমাদ্দার আকাশের দিকে দু-হাত তুলে তিনবার তালি মারলেন। তারপর আশ্চর্য গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জাদুর পোশাক'—

মুহূর্তের মধ্যে কী জানি হয়ে গেল। হরেন সমাদ্দারের গায়ে ঝলমল করে উঠল রাজপুত্রের মতন উজ্জ্বল চোখধাঁধানো পোশাক। ঋক আর সুতনু একেবারে অবাক হয়ে গেল। এমন ঘটনা তারা

দেখেছিল গুপি গায়েন বাঘা বায়েন সিনেমায়। সত্যিই যে এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে কল্পনাই করতে পারেনি তারা কোনোদিন। স্বতস্ফুর্তভাবে হাততালি দিয়ে উঠল তারা দুজনেই। জাদুকর হরেন সমাদ্দার কোমর থেকে ওপর দিকটা তাদের সামনে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন গ্রহন করলেন। বললেন, 'যে ম্যাজিক কখনও কেউ দেখেনি আমার থেকে, দেখতে পারবেও না হয়ত আর কক্ষনও, তাই দেখিয়ে দিচ্ছি আজ তোমাদের। আমি নিশ্চিত, এই জাদুর খেলা তোমরা ভুলতে পারবে না কোনোদিন'। বলেই তিনি আকাশের দিকে হাত বাড়ালেন। ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই অরণ্যে আলোর বড় অভাব। আমাদের অনেকের জীবনেরই মতন...'

'মানে?' অবাক হয়ে বলে ওঠে ঋক আর সুতনু।

'আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে তোমরা', হরেন সমাদ্দার দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, 'মানুষের মন অন্ধকারে ভরে গেলে সে আলোকে ঠিকমতন চিনতে পারে না আর। তখন তারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি। এসো আমরা এই অরণ্যে আজ আলোর জন্যে প্রার্থণা করি। নাও আমার মতন তোমরাও আকাশের দিকে হাত বাড়াও। প্রার্থনা করো যেন কাঙ্ক্ষিত সেই আলো আজ ধরা দেয় তোমাদের কাছে। অন্ধকার মাড়িয়ে তোমরা সেই আলোর পথে যেন যাত্রী হতে পারো'। তাঁর কথায় যেন সম্মোহনের সুর।

ঋক, সুতনু দুজনেই হাত বাড়িয়ে দেয় আকাশের দিকে। আর অমনি আকাশ ফুঁড়ে আলোর ঝরনা নেমে আসতে থাকে গাছের পাতার ফাঁক গলে, গাছের কান্ড গড়িয়ে...লাল, নীল, হলুদ, বাদামি, কমলা, সবুজ নানান রঙের আলো লাফাতে লাফাতে, গড়াতে গড়াতে, উড়তে উড়তে ক্রমশই ঘিরে ফেলে তাদের। আর সেই অদ্ভুত আলোকিত নতুন এক দুনিয়ায় হাজার হাজার পাখি এসে বসতে শুরু করে উঁচু উঁচু গাছের ডালে ডালে। তাদের গায়ের পাশ দিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে রং বেরঙের প্রজাপতি উড়তে আরম্ভ করে, জঙ্গলের শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায় হরিণের পাল, ময়ূরের দল। এমনকী একটা প্রকান্ড বাঘ এসেও দাঁড়িয়ে পড়ে হরিণগুলোর গা ঘেঁষেই। অথচ হরিণগুলোর মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র নেই। এখানে কোথাও যেন হিংসা শব্দটাই নেই। সকলের জন্যে সকলের শুধু অফুরান ভালোবাসা।

সুতনুর মনে হচ্ছিল তার শরীর যেন কেমন হালকা হয়ে গেছে। চাইলেই সে যেন উড়ে বেড়াতে পারবে এখন। আর মনের মধ্যেটাও একেবারে ঝকমকে। ক্লাশে তার সবচেয়ে অপছন্দের সহপাঠী রক্তিমের জন্যেও যেন মন ভালোবাসায় ভিজে উঠছে ক্রমাগত। ঋকের মনেও যেন ভালোলাগা আর ভালোবাসার একটার পর একটা ঢেউ উঠতে শুরু করল। সেই ভালোবাসায় সব খারাপ সুন্দর হয়ে যায়। সব মন্দ আনন্দময় হয়ে ওঠে আপনাআপনিই। কতক্ষণ যে এভাবে থাকল তারা কে জানে। হরেন সমাদ্দারের ভারি অথচ সুরেলা কন্ঠস্বরে সেই আলোর জগত থেকে ফিরে এল তারা আবার। হরেন সমাদ্দার দুজনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনে রেখো, এই অনুভূতিগুলো স্বপ্ন নয়, মিথ্যে নয়। এই আলোর ভাবটাই ফুটিয়ে রেখে দিতে হবে জীবনভর। নাহলে মন থেকে ওই আশ্চর্য

আলো কিন্তু হারিয়ে যাবে নিজের অজান্তেই। সাবধানে বাঁচিয়ে রেখো এই আলোটাকে। কী পারবে তো?'

'পারব', ঘোরের মধ্যেই বলে উঠল তারা দুজনে।

'চলো এবারে আমরা যাই। সন্ধে নেমে এসেছে। তোমরা সত্যি বিপদে পড়ে যাবে আরও দেরি হয়ে গেলে'। হরেন সমাদ্দার দু-হাতে দুজনকে ধরে জঙ্গল মাড়াতে মাড়াতে জঙ্গলের প্রায় কিনারে চলে এলেন। বললেন, 'আর ঠিক দশ পা সামনে হেঁটে গেলেই দারিকবাড়ির মোড়। ওখান থেকেই বাড়ি যাবার অটো পেয়ে যাবে। কালিকাপুরের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ বলে অটোগুলো এখন দারিকবাড়ি হয়েই তোমাদের ওদিকে যাচ্ছে।'

'আপনি যাবেন না?' ঋক জিগ্যেস করেন জাদুকরকে।

জাদুকর হাসেন, 'আমি তো জাদু বলেই উড়ে যেতে পারি একনিমেষে। হাওয়ায় হাওয়ায় এই শরীরকে মিশিয়ে দিয়ে।'

'সত্যি?' অবিশ্বাসী গলায় জিগ্যেস করে সুতনু।

হরেন সমাদ্দার নিঃশব্দে হাসেন, 'দেখ তাহলে। আজ তাহলে এটাই হবে আমার শেষ ম্যাজিক।' দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে চোখ বুজিয়ে দাঁড়ান তিনি একটা ঝুপসি জলপাই গাছের নীচে। তারপর ঋক আর সুতনুর চোখের সামনেই তাঁর পালক লাগানো জরির পাগড়ি আর ঝলমলে জাদুকরের পোশাক সমেত মিলিয়ে গেলেন আতসবাজির মতন একবার হুউশ করে জ্বলে উঠেই।

৩

ঋক আর সুতনু খবরটা পেল দারিকবাড়ির মোড় থেকে অটোয় উঠে। অটোকাকুই তাঁর পাশে বসা বয়স্ক প্যাসেঞ্জারটিকে বলছিলেন উত্তেজিত গলায় কালিদাস কংসারি হলে আজ খেলা দেখানোর কথা ছিল জাদুকর হরেন সমাদ্দারের। বেলার দিকেই হলে চলে আসছিলেন তিনি তাঁর টিমের কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে। স্টেজ সাজাতে নাকি অনেকক্ষণ সময়ের ব্যাপার আছে তাঁদের। পথেই কদমতলার কাছে একটা প্রাইভেট বাস ব্রেক ফেল করে তাঁদের গাড়িটাকে...খুব আক্ষেপ করছিলেন অটোকাকু। 'মস্ত জাদুকর ছিলেন হরেন সমাদ্দার। কী সব খেলাই না দেখিয়েছেন। নিজের হাতে মানুষ কেটে পাঁচ টুকরো করে জোড়া লাগিয়ে দিতেন আবার জাদুমন্ত্রে। কিন্তু লোকটাকে আজ হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়টুকুও পাওয়া গেল না। তার আগেই সব শেষ।'



ব্যবসায়ী বিপুলবাবু



বিপুলবাবু ব্যবসায়ী মানুষ। লাভ ক্ষতির কথা না ভেবে একটি পা-ও তিনি কখনো ফেলেন না। ব্যবসা ঠিকমতন সামলাতে গেলে সব রকম লোকজনের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখতে হয়। কখন কী কাজে লেগে যায় বলা যায় না। সরাসরি কাজে নাও যদি লাগে অন্তত প্রয়োজনীয় কাজের সময় বাগড়া না দেয় যাতে সেটা নিশ্চিত করাটাও জরুরী। এ সব কাজে খানিকটা অর্থ অনর্থক খরচা হয়ে যায় মাঝে সাঝে। মনে মনে খুব কষ্টও পান তখন বিপুলবাবু। কিন্তু উপায় নেই। এসব মেনে না নিয়ে কাজেকম্মে উন্নতি করা মুশকিল এই বাজারে।

কদিন ধরেই একজন লোক ঘোরাঘুরি করছেন তাঁর কাছে। দেখলেই বোঝা যায় পয়সার অভাব নেই তাঁর। বিপুলবাবুর বাড়ি ছাড়িয়ে আধ মাইলটাক গেলেই পুরোন মজা খালটার পাশে বিঘে খানেক জমি আছে তাঁদের। ভদ্রলোক সেই জমিটা কিনে ওখানে একটা বহুতল বানাতে চান। আগে এসব অঞ্চলে ফ্ল্যাট বাড়ির চল ছিল না। ইদানীং আর পাঁচ জায়গার মতন এখানেও দোকান পাট লোক-লস্কর বাড়ছে। নতুন রাস্তা-ঘাট গাড়ি-ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাপও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। কাজেই জায়গার ঘাটতি অনিবার্য। আজ না হোক কাল নিজস্ব জমি বাড়ির চেয়ে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে থাকবার চল এখানেও নিশ্চিত শুরু হয়ে যাবে।

বিপুলবাবু বোঝেন একটু গ্রামের দিকে জমি কিনে প্রোমোটারির ব্যবসা করার আইডিয়াটা মন্দ নয়। ঠিকঠাক টাকা ঢাললে ভালো লাভ পাওয়া যাবে। তাঁর নিজের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে নিজেই হয়তো নেমে যেতেন এই লাইনে। ভদ্রলোক দর দাম মন্দ দিচ্ছেন না। উপরন্তু দোতলায় একটা ফ্ল্যাটও তাঁকে দেবার কথা। কিন্তু তবু একটা বিষয়ের কথা ভেবে কিছুতেই মন স্থির করতে পারছিলেন না বিপুলবাবু। বিপুলবাবু এমনিতে যথেষ্ট ডাকাবুকো মানুষ। চোর-ডাকাত-কুকুর-আরশোলা কোনোকিছুতেই ভয়-ডর নেই তাঁর। ভয় শুধু তাঁর একটি জিনিসেই। আর এই বস্তুটির সঙ্গে কোমর বেঁধে লড়াই করাও যায় না। খালের পাশের যে জমিটা তাঁর ঠাকুরদার আমল থেকেই প্রায় অব্যবহৃত পড়ে আছে সে জমিটি নাকি তাদেরি বাসস্থান। আজ তিন পুরুষে কেউ তাদের কখনও বিরক্ত করার চেষ্টা করেন নি। তাদেরকে তাদের মনের মতন করেই থাকতে দিয়েছেন এতকাল ধরে।

বিপুলবাবু যখন ছোট, একবার তাঁর মা ওই জমিতে শান্তি স্বস্তেন করার কথা তুলেছিলেন। বিপুলবাবুর স্পষ্ট মনে আছে তাঁর বাবা এবং ঠাকুমা দুজনেই একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন সেই প্রস্তাব শুনে। একটু বড় হবার পরে বিপুলবাবু বাবার মুখে শুনেছিলেন ওই জমিতে দীর্ঘদিন যারা বাস করছে তারা নাকি সব বাস্তুভূত, ওদের তাড়ানোর কথা ভাবতে নেই। সূক্ষ্মে থেকে তারা নাকি এই পরিবারের মঙ্গল সাধন করে সকলের অজান্তে। কাজেই ওদের বাস্তু থেকে উৎখাত করলে গৃহস্তের অকল্যান অবশ্যম্ভাবি। আজকাল অনেকেই এসব কথা বিশ্বাস করে না। বিপুলবাবুর ছেলে পর্যন্ত হাসাহাসি করে এই নিয়ে। কিন্তু বিপুলবাবু নিজে কথাটাকে চেষ্টা করেও মন থেকে সরাতে পারেননি কিছুতেই। অতএব আর্থিক লাভের হাতছানি সত্বেও জমিটা বিক্রির ব্যাপারে ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন বিপুলবাবু।

বিপুলবাবুর একটিই ছেলে। সেও ব্যবসায়ী। শহরের দিকে নানারকমের ব্যবসা আছে তার। বাবার ব্যবসায় বড় একটা গরজ তার কোনোদিনই ছিল না। বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়িতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিপুলবাবুর সামনে সে বলে যাচ্ছে তার নাকি ব্যবসার কাজে কয়েক লক্ষ টাকার দরকার। জমিটা বিক্রি হলে টাকাটার বন্দোবস্ত হতে পারে। তাছাড়া নতুন ফ্ল্যাটটার ওপরেও বেশ লোভ আছে তার। কাজেই মায়ের কাছে দরবার করে বিপুলবাবুকে বোঝানোর জন্যে ঝুলে পড়ল সে। বিপুলবাবুর স্ত্রী প্রথমটা গাঁই গুঁই করলেও ছেলের কথাটাও খুব ফেলনা মনে হল না তাঁর। কাজেই রাত্রিবেলা বিপুলবাবুর কাছে কথাটা পেড়ে ফেললেন তিনি। রাতের খাওয়া সেরে পান মুখে দিয়ে বিপুলবাবু সবে বিছানায় এসে বসেছেন, সুজাতা পাশে এসে বসলেন, একটু কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'কী ঠিক করলে তাহলে?'

'কী ব্যাপারে বলো দিকিনি?' বিষয়টা ধরতে না পেরে বললেন বিপুলবাবু।

'কী আবার', মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠেন সুজাতা, 'ওই পোড়ো জমিটার কথা বলছি। এই বাজারে অতখানি জমি অমন অবহেলায় পড়ে আছে, কাজেই লাগছে না কোনো। বিক্রি বাঁটা যদি সত্যিই করে ফেলতে পারো তাহলে লাভ বই তো লোকসান নয়। ছেলেটারও টাকার দরকার বলছে। মুখ ফুটে বলতে পারছে না হয়ত তোমায়। তাছাড়া একটা তিন ঘরঅলা ফ্ল্যাট'—

'তা টাকাটা তার কিসে দরকার শুনলে কিছু?' একটু বিরক্তি নিয়েই বললেন বিপুলবাবু।

'কিসে আবার, ব্যবসারই কাজ নিশ্চয়ই, দুম করে হয়ত বড় অর্ডার ধরেছে কিছু। হাতে অত টাকা নেই এখন'—

'সবই তো বুঝলাম', পানের পিক ফেলে বলেন বিপুলবাবু, 'কিন্তু জমিটার ব্যাপার তো সবই জানো, সেই কবেকার বাস্তু-ভূত সব। হুট করে তাদের যদি ভিটে ছাড়া করি রেগেমেগে এ বাড়িতেই হয়ত উঠবে এসে।'

কথাটা শুনে বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ছাঁৎ করে উঠল সুজাতার। 'কী সব অলুক্ষণে কথা বলো না' বলে চারদিকে একবার তাকিয়ে নেন তিনি। তারপর নীচু গলায় বলেন সন্দেহের চোখে, 'সত্যি সত্যিই কি আর ওরা ওখানে আছে এতদিন ধরে। সেই কবেকার ভূত, তোমার ঠাকুরদার আমলের। এখনও কি আর টিকে আছে তারা, দেখগে যাও কবেই মরে হেজে গেছে'—

'তোমার যা বুদ্ধি,' বিপুলবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'মরবে কি গো, মরেই তো ওরা ভূত হয়েছে। ভূতেরা আর দ্বিতীয়বার মরে না।'

'যাই বলো বাপু, আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। ভূতেরা যদি আর কখনও না মরে তাহলে ভূতে ভূতে পৃথিবীটা ছেয়ে যেত অ্যাদ্দিনে, মানুষ থাকারই জায়গা থাকত না আর।'

'তবু আমার এ ব্যাপারটায় একটু ভয় করে। মানুষের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায়, কিন্তু ওদের কথা ভাবলে আমার এখনও হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়।'

'তাহলে কচি ছেলের মতন ভূতের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো। এত বড় সুযোগটা ফস্কেই যাক তাহলে। ও জমি আর তোমার থাকলে হয়। কোনদিন দেখবে জবর দখল হয়ে বে-হাত হয়ে

যাবে সবকিছু। সবাই তো আর তোমার মতন ভূতের ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। নিজের লাভের কথা আজকাল সকলেই ভাবে'।

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতন নয়। জমি বে-দখল হচ্ছে না যে এমনটিও নয়। তবু শেষ চেষ্টা করলেন বিপুলবাবু, 'জেনেশুনে ভূতুড়ে জায়গাটা লোকগুলোকে গছিয়ে দেব, কাজটা কি ভালো হবে?'

'তুমিও যেমন, যারা জমিটা কিনতে চাইছে তারা কি আর খবর না নিয়ে কিনতে চাইছে ভাবছ, ওরা জেনেশুনে যদি নিতে চায় তোমার কি? ভূত থাকলে তাদের সঙ্গে ওরাই বোঝাপড়া করে নেবেখন।'

বিপুলবাবু মুখ নীচু করে ভাবলেন খানিক। সুজাতার কথাগুলো যুক্তিসঙ্গতই মনে হল তাঁর। জমিটা পড়েই আছে কবে থেকে। আয় ইনকাম কিছুই দিচ্ছে না জমিটা। তাছাড়া জবর দখলের আশঙ্কাটাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেনা। এই তো বাস রাস্তার পাশে সুবল নস্করের একটা কাঠা চারেকের জমিতে এলাকার ছেলে-ছোকরারা ক্লাব ঘর বানিয়ে ফেলল কদিন আগে। সুবল অনেক চেষ্টা করেও তুলতে পারল না তাদের। সুবলের জমিতে ইটের ঘর তুলে দিব্বি সকাল সন্ধে একদল ছেলে ক্যারম পিটছে দু-বেলা। কথাটা মনে পড়ে যেতে গা রি কি করে উঠল বিপুলবাবুর। বলা যায় না এসব ছেলেদের ভূতেও ভয় পায়। এ জমিটাও কোনোদিন নিয়ে নিতে পারে ওরা। তখন আর করার কিছুই থাকবে না। আইন আদালতে দমবার পাত্তর ওরা নয়। অতএব দ্বিধা ঝেড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বিপুলবাবু। সামনের সপ্তায় আসার কথা আছে লোকটার। বোকার মতন ভূতেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এত বড় ক্ষতি স্বীকার করার মানেই হয় না।

২

ব্যবসার কাজ সেরে পা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বিপুলবাবু। খিদে পেয়েছে। তাছাড়া সন্ধেও পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এদিকটা এমনিতেই নির্জন। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। এলাকাটা গাছ-গাছালিতে ভরা। দিনের বেলা এ পথে চলতে মন্দ লাগে না। কিন্তু রাতে গাছপালার আড়ালে আকাশের আলো এমন আটকে যায় যে পুরো অঞ্চলটাই অন্ধকারে যেন মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে থাকে চুপটি করে। সেই চুপচাপ থমথমে অন্ধকার বুকের মধ্যে ভারি অস্বস্তি বয়ে আনে। বিপুলবাবুরও অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে আশপাশ থেকে। নির্জন পথে তিনি একা, তবু বার বার মনে হচ্ছে বুঝি তিনি ঠিক একা নন। জিভটা শুকনো মনে হল বিপুলবাবুর। শিরদাঁড়ার কাছটা শির শির করছে ক্রমাগত। তিনি আরো জোরে পা চালালেন। আর তখনি লোকটা যেন ম্যাজিকের মতন অন্ধকার ফুঁড়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। লোকটা বেশ রোগা, লম্বা এবং চটপটে। অন্ধকারে এমন মিশে আছে যে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে তার গায়ের রঙ যথেষ্ট

কালো। লোকটা বিপুলবাবুর দিকে চেয়ে মিহি করে হাসল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'বিপুল, বাধ্য হয়েই প্রায় তোমার সামনে আসতে হল বাবা। তা নইলে সামনে তো আমরা আজকাল বড় একটা আসি না কারো'—

বিপুলবাবু সরু চোখে লোকটার দিকে চাইলেন। সটান নাম ধরে কথা বলছে লোকটা তাঁর সঙ্গে। অথচ মানুষটাকে একটুও চেনা ঠেকল না। বিপুলবাবু সতর্ক হলেন। দিন কাল ভালো নয়। কে কখন যে কী মতলব নিয়ে ঘোরে বোঝা যায় না। আজ একজন পাওনাদারের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা পেয়েছেন। সে টাকাও পকেটে রয়েছে। টাকার পরিমানও নেহাত কম নয়। আলতো করে প্যান্টের পকেটে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন তিনি। চোর-ছিনতাইবাজ হয় যদি লোকটা তাহলে একা ওর মোকাবিলা করাও কঠিন। বিপুলবাবু বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা তাঁর মনের কথা পড়ে ফেলেই যেন অভয় দিয়ে উঠল হাত নেড়ে, 'চোর টোর ভাবার দরকার নেই বাপু আমায়। সারা জীবন মাস্টারি করে খেয়েছি যদ্দিন দেহে ছিলুম। চিরকাল ছেলেপুলেকে শিখিয়েছি বাঁকা কথা বোলো না, বাঁকা পথে চোলো না। সবাই যে কথা শুনেছে তা নয় অবিশ্যি। এই তো আমাদের প্রাণকৃষ্ণের ছেলে বিশু আমার কথায় আমল না দিয়ে গুন্ডা হল। ফলও পেল। বোম বাঁধতে গিয়ে ফেটে অকালে প্রাণটা গেল। এখন খুব আফশোস করে'—

'এখন আফশোস করে মানে?' বিস্মিত হয়ে বলেন বিপুলবাবু, 'আপনি কী ঠাউরেছেন আমায় বলুন দেখি, মরার পরে সে আপনার কাছে এসে আফশোস করছে। ইয়ার্কির জায়গা পাননি মশাই'—

'আহা না বুঝে অমন ভাষায় কথাটা বলা কি তোমার ঠিক হচ্ছে বাছা, হাজার হোক তোমার বাবার গৃহশিক্ষক ছিলুম আমি। পড়াশোনায় সে অবিশ্যি খুব গবেট ছিল, তবু তোমার ঠাকুদ্দার কথায়—বড় ভালোবাসতেন আমায়। সমবয়েসি ছিলাম তো, বন্ধুই ভাবতেন তাই আমায় মনের কথা সব বলতেন। আমিও আর কথা ফেলতে পারতুম না। তা মরার পরেও আমায় ছাড়লেন না। বললেন 'কোথায় যাবে আর এদিকে সেদিকে। আমার খালের ধারের জমিটা পড়ে রয়েছে বন জঙ্গল হয়ে, ওখানেই বরং একসাথে থেকে যাই দুজনে' বেঁচে থাকতে পড়াশুনোকে বড় ভালোবাসতুম তো, তাই ওই জমিতে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভূতেদের জন্যে স্কুল বানালেন উনি। প্রথম প্রথম ছেলে-ছোকরা ভূতগুলো আসতেই চাইত না। ক্রমে ওরাও বুঝেছে মুখ্যু হয়ে ভূতুমি করার কোনো মানেই হয় না। আধুনিক শিক্ষা ছাড়া ভূতেদের অগ্রগতি কিছুতেই আর সম্ভব নয় এ বাজারে।

বিপুলবাবুর মনের মধ্যে সব ক্যামন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। লোকটা সত্যি ভূত হলে তাঁর এখন বিষম ভয় পাওয়ার কথা। এমনকি দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি বা ভিরমি খাওয়ারও অত্যন্ত মানানসই সময় এটা। কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর এসব কিছুই হল না। স্বাভাবিকভাবেই লোকটার ভূতত্বে ঠিক বিশ্বাস এল না বিপুলবাবুর। অন্ধকারে চোখটা সয়ে আসাতে লোকটাকে আরো ভালো করে নজর করলেন তিনি। গড়নটা রোগাটে ঠিকই, কিন্তু লোকটাকে খুব একটা অসমর্থ মনে হল না। মনে মনে নিজেকে বকা দিলেন তিনি। কাজটা ঝুঁকিরই হয়ে গেছে। এত টাকা পকেটে নিয়ে একা এ রাস্তায়

আসাটা মোটেও বুদ্ধিমানের মতন কাজ হয়নি। অনেকক্ষণ আগেই একবার মনে হয়েছিল কে বুঝি পিছু নিয়েছে। ব্যাপারটা আমল দেননি তখন।

লোকটা একই রকম মিহি গলায় আবার বলতে শুরু করল, 'বাবার কাছে আমার নাম হয়ত শুনেছ তুমি। আমায় এককালে এ গ্রামে একডাকে সবাই চিনত মহিমমাস্টার নামে'—

বিপুলবাবুর বুকটা এই প্রথম ধড়াস করে উঠল একটু। নামটা সত্যিই শোনা লাগছে। কিন্তু এও কি সম্ভব? মরিয়া হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'ক্যানো শুধুমুধু ভূতটুতের কথা তুলছেন মশাই, রাত হয়েছে, এলাকাটা এমনিতেই সুবিধের নয়—বিশ্বাস করুন শ-দুই টাকা পকেটে আছে। বোঝেনই তো ব্যবসার বাজার মন্দা। পাওনাদার টাকা দিতে চায়না, তা এই টাকা কটা নিয়ে আমায় ছেড়ে দিন আজকের মতন—'

লোকটা বিষাদের সঙ্গে হেসে উঠল, 'আমার কথাটা কি বিশ্বাস হল না হে?'

'বিশ্বাস কি করা যায় বলুন'—

'আচ্ছা এই দেখ', লোকটা নীচু সুরে বলে উঠল, 'খুব দরকার ছাড়া এসব আমরা আজকাল আর দেখাই না যদিও, তবু তুমি আমাদের ঘরেরই লোক যখন' বলেই হাতটা হঠাৎ সামনে বাড়িয়ে দিল লোকটা। হাতটা বড় হতে হতে বড় হতে হতে এতখানি লম্বা হয়ে গেল যে বিপুলবাবু বাস্তবিক হাঁ হয়ে গেলেন একেবারে। লোকটা বিপুলবাবুর দিকে তাকাল একবার। তারপর স্নেহের সুরে বলল, 'এতেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই কেরামতিটা দেখে নাও একবার। আমাদের স্কুলে প্রাইমারি সেকশনে এসব শেখানো হয় আজকাল'—বলেই গলার ওপর মাথাটাকে দু-পাক ঘুরিয়ে নিয়েই শরীরটাকে হাওয়ার সঙ্গে একেবারে যেন মিশিয়ে দিয়ে চ্যাপ্টা আর স্বচ্ছ হয়ে গেল লোকটা।

বিপুলবাবুর পক্ষে ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল বোধহয়। চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে এল তাঁর। মাটিতে পড়ে যেতে যেতেই তাঁর মনে হল কে যেন ভারি সন্তর্পণে তাঁর শরীরটা দু-হাতে ধরে ফেলল। খানিক বাদে ধাতস্ত হবার পর যখন চোখ খুললেন বিপুলবাবু, তখন মহিমমাস্টারকে দেখে আর ততটা ভয় লাগল না। আসলে ভয় পেতে পেতে ভয়টা বেশ সয়ে গেছে এতক্ষণে।

মহিমবাবু মুখে চুক চুক করে আওয়াজ করলেন একটু। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'যাই বল বাপু আমাদের কালে এমন কথায় কথায় ভয় পাবার চল ছিল না। এ অঞ্চল তখন তো আরো ঝোপে-ঝাড়ে ভরা ছিল। ভূত-প্রেতেরও অভাব ছিল না। পথে চলতে ফিরতে হরবখত দেখা হয়ে যেত ওনাদের সঙ্গে। কী ভাব খাতির ছিল তখন ভূতে-মানুষে। সেই সব পুরোনো দিনের ভূতেদের সঙ্গে দেখা হলে এখনও দুখ্যু করে সে সব কথা বলেন। তোমাদের দেখলে মনে মনে আবার মরে যেতে ইচ্ছে করে লজ্জায়।'

মহিমবাবুর কথায় লজ্জা পেয়ে গেলেন বিপুল। কান চুলকোতে চুলকোতে ভারি লাজুক ভঙ্গীকে তিনি বললেন, 'আর এমন হবে না। ফস করে অমন ভয় পেয়ে যাওয়াটা সত্যিই বড় অনুচিত হয়েছে।'

মহিমমাস্টার খুশি হলেন। চওড়া করে হেসে বললেন, 'বাদ দাও। যে কারনে আসা আমার তোমার কাছে সেটা এবার বলি।'

'আজ্ঞে, বলুন'। খুব বংশবদ ভঙ্গীতে বললেন বিপুলবাবু। লোকটাকে মহিমমাস্টার বলে মেনে নিতে আর সন্দেহ হল না তাঁর। মহিমমাস্টারও ব্যাপারটা বুঝে খুশি হলেন। তারপর বললেন, 'শুনলুম খালপাড়ের জমিটা তুমি নাকি প্রোমোটারের হাতে দিতে চাচ্ছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই বাজারে অতখানি জমি বে-ফালতু জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। আয় ইনকাম নেই। ওই জামিতে চাষ আবাদও হয় না'—

'তাই বলে আমাদের এতদিনের বাস তুলে দেবে তুমি, কত নমস্য মানুষ ভূত হয়ে আলো করে রেখেছেন জায়গাটা। শক্ত পোক্ত পা নেই বলে তাঁদের পদধূলি হয়ত সে মাটিতে মিশছে না, কিন্তু তাদের ছায়া শরীরের হাওয়া তো মিশছে ওই জমির বাতাসে। তাছাড়া তাদের আশীর্বাদেরও একটা জোর আছে। তারপর ধরো আমার স্কুলটা—এতগুলো নিষ্পাপ ভূতশিশুর শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন পন্ড করবে তুমি, ধম্মে কি সইবে এসব? তোমার বাপ ঠাকুদ্দার মনের অবস্থাটাই বা কী হবে ভেবে দেখেছ কখনও?'

'এমনভাবে সত্যিই ভাবিনি, সঙ্কোচের সঙ্গে জানালেন বিপুলবাবু, 'বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার জমিটা বেচার ইচ্ছেও খুব ছিল না। কিন্তু'—

'ছেলে বউ চাপ দিল'—তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন মহিমমাস্টার।

'কথাটা মিথ্যে নয়, তবে ওদের প্রস্তাবটাও আবার পুরোপুরি অযৌক্তিক নয়। ব্যবসায়ী মানুষ তো, অর্থ ক্ষতি সইতে পারি না। এই বাজারে অতখানি জমির অনেক দাম। টাকাটা ছাড়া বোকামিই হয়ে যায় বুঝলেন না?'

'তোমরা এই টাকা টাকা করেই মরলে বাপু', একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন মহিমমাস্টার, 'যতই দেখচি তোমাদের অবাক হয়ে যাচ্ছি হে। বলি বাপু টাকাটাই কি দুনিয়ার সব যার জন্যে ভূত ভবিষ্যৎ সকলের কথা ভুলে বসে থাকতে হবে?'

'কিছু মনে করবেন না স্যার' বিপুলবাবু হাসলেন, 'আপনি সেকেলে মানুষ তো সবটা তাই ধরতে পারবেন না। তবে কি জানেন টাকা পয়সার ব্যাপারটা সত্যিই এ বাজারে আর ফেলনা নয়, টাকা যত মান্যিগন্যিও তত। ভূতেদের কথা ভেবে ভবিষ্যতটাকে জলাঞ্জলি দেওয়াটা বোকামিই হয়ে যাবে'—

'শোনো বাবা বিপুল, ভূত মানে অতীতও। এটা অস্বীকার করতে যেও না, অতীতকে স্বীকার না করলে ভবিষ্যতটা বড় গোলমেলে হয়ে যায়।'

কথাটা বিপুলবাবুর কাছে বেশ কঠিন শোনালো। তবে ক্যানো যেন কথাটা তাঁর ঠিক মিথ্যে বলেও মনে হল না। অসহায়ের মতন মুখ করে তিনি বললেন, 'তাহলে কী করতে বলেন আমায়?'

'ও জমিটায় আর হাত দিও না বাবা। বরং লোক দিয়ে পরিষ্কার-টরিষ্কার করিয়ে খেলার মাঠ বানাও। এলাকায় খেলার মাঠের বড় অভাব। সব খোলা জমিগুলোয় বাড়ি ঘর দোকান-পাঠ উঠে যাচ্ছে হু-হু করে। পরের প্রজন্মের ছেলেগুলো আর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারবে না এরপর।

আমাদের স্বপ্ন দেখতে নেই, তবু তোমার কাছে বলতে দ্বিধা নেই, মাঝে সাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে আমি একটা স্বপ্ন খুবই দেখি—'

'কী স্বপ্ন?' অবাক হয়ে বলেন বিপুলবাবু।

'তোমাদের খালপাড়ের জমিটায় সত্যি একটা স্কুল হবে। সেখানে ভারী ব্যাগ আর গুচ্ছের বই পত্তরের বাহ্যাড়ম্বর থাকবে না, ছেলেরা মাঠ দাপিয়ে হই হই করে খেলবে, গান গাইবে, ছবি আঁকবে, আবার জীবনে সত্যিকারের বড় হবার শিক্ষাটুকুও কুড়িয়ে নেবে। গাছে গাছে পাখি ডাকবে। সকালের সোনালি রোদ আর রাত্তিরের রূপোলি চাঁদের আলো গায়ে মেখে স্কুলবাড়িটায় সকালে মানবশিশু আর রাতে ফুলের মতন কচি কচি ভূতগুলো শিক্ষার আলো পেয়ে ঝলমল করে উঠবে—'

'সে না হয় হল। কিন্তু আমার লাভ কী হবে তাতে' অসহায় গলায় জিগ্যেস করলেন বিপুলবাবু, 'মানে আমার ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন, বাড়ির লোকগুলোকে কিছু একটা লাভের কথা বলে রাজি করাতে হবে যে—'

'আবার সেই লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষছ বাছা?' দুঃখিত হয়ে বললেন মহিমবাবু।

'কী করি বলুন, উপায় নেই যে—'

'দেখ স্কুলের নাম যশ যত বাড়বে তোমার নাম, খ্যাতিও বাড়বে। লোকে ধন্য ধন্য করবে তোমায়।'

'আজ্ঞে ব্যবসায়ী মানুষ তো, ওতে আমার ঠিক মন উঠছে না।'

'শুধু এই এলাকার মানুষের কল্যানের জন্যে নয়, ভূতেদের কল্যানে যারা আন্তরিক কাজ করেছেন সেই ভূতুড়ে ইতিহাসে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।'

'সোনার অক্ষর কাজে লাগে না যে মাস্টারমশাই, যদি তার বদলে সোনার টাকা কিছু দিতেন তবু কাজে আসত সংসারে। তাছাড়া এ বাজারে আপনার স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতেও তো কম টাকা লাগবে না—'

'তা টাকা পয়সা তো কম নেই বাপু তোমার। তবু হিসেবি মানুষ তুমি, এমনি কিছু সহজে করবে না বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, লেগে পড় এ কাজে, টাকার যোগান আমরা দেব। তোমার কাজের শেষে সোনার টাকাও দেব মাসে মাসে। ভেবে দেখ এবার চুক্তিটা লাভজনক হল কিনা—'

'সোনার টাকার নমুনা দিন তাহলে—'

'তুমি বড্ড হিসেবি আর পয়সা-পিশাচ বাপু। নাও হাত পাতো', বলে দুখানা সোনার টাকা বিপুলবাবুর হাতে দিলেন মহিম মাস্টারমশাই। তারপর বললেন, 'কাল খালপাড়ে দেখা কোরো। বুড়ো বয়েসে তোমার পিছনে এদিক সেদিক ঘুরতে পারব না বাছা।'

বিপুলবাবুর মনটা এখন বেশ খুশিই। পকেটে সোনার টাকা। খালপাড়ের জমিটারও দিব্বি বিলি বন্দোবস্ত হল। বাপ পিতামহর কথামতন বাস্তু ভূতেদের চটানোর দরকার হল না। আবার আমদানিরও পথ হয়ে গেল একটা। বাড়ি ফিরে পাওনাদারের টাকাগুলো গিন্নির হাতে দিয়ে দরাজ গলায় বললেন তিনি, 'ভালো এক কাপ চা খাওয়াও দেখি কড়া করে।'

সুজাতা কথা না বলে চা আনতে চলে গেলেন। বিপুলবাবুর ক্যামন বেসুরো ঠেকল সুজাতার চলে যাওয়ার ভঙ্গীটা। চা নিয়ে তিনি ফিরে আসতেই আবার বললেন তিনি, 'জমিটার অন্য ব্যবস্থা করার সুযোগ এসে গেল গিন্নি, লাভ মন্দ নয়, মাসে মাসে গিনি। স্কুল দাঁড়ালে তার লাভ তো আছেই। তাছাড়া জমিটাও হাতছাড়া হল না—'

সুজাতা উৎসাহ দেখালেন না। বিপুলবাবু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার বল তো—'

'ছেলে বউমা ছুটকুকে নিয়ে শহরে চলে যেতে চাইছে নতুন ফ্ল্যাট কিনে—'

'অ্যাঁ, সে কি, কে বলল?'

'ওই জন্যে টাকার দরকার ওর। নাহলে ফ্ল্যাটটা নেওয়া হবে না। ব্যাঙ্ক লোন পেতে কী নাকি অসুবিধা আছে ওর। বউমাকে বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি।'

কিন্তু চলে যেতে চাইছে ক্যানো?'

'বলছে ছুটকু একটু বড় হলেই তাকে তো পড়াশুনো শেখাতে হবে ঠিক করে। আর এ গ্রামে থেকে তা সম্ভব নয়। ছুটকুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওদের গ্রাম ছাড়তেই হবে এক বছরের মধ্যে —'

'বটে'—সুজাতার কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন বিপুলবাবু, 'ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি। দাঁড়াও না যাওয়াচ্ছি ওদের'—

ছুটকুটা চলে গেলে আমি এ বাড়িতে থাকতে পারব না, বাড়িটা খাঁ খাঁ করবে সবসময়, তুমি বরং ওই জমিটা বেচো না। তাহলে টাকার অভাবে শহরের ফ্ল্যাটটা আর কিনতে পারবে না ও'—

'এটা কোনো কাজের কথা নয় গিন্নি,' বলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিপুলবাবু, 'কেনার কারণটা যদি থেকে যায় তাহলে আজ না কিনতে পারলেও কাল কিনবে ফ্ল্যাটটা। কাজেই আমি ওভাবে ব্যাপারটা আটকাতে চাই না। আমার সঙ্গে মহিম মাস্টার আছেন। শুধু দেখে যাও কী করি। এ গ্রামের মধ্যেই এমন স্কুল বানাব যে তাক লেগে যাবে সবার। শুধু তোমার ছেলে ক্যানো, এ গাঁয়ের একজনও আর পড়াশুনোর অসুবিধার জন্যে ভিটে ছাড়া হবার চিন্তা আনবে না মনে। একটা রাত্তিরের মামলা। কালই খালপাড়ে গিয়ে কথা দিয়ে দেব মহিম মাস্টারমশাইকে। আর সোনার টাকা দুটোও ফেরত দিয়ে দেব তাঁকে। টাকার চেয়েও অনেক দামি আর দরকারি জিনিস আছে আমাদের, যেগুলোকে যত্ন করে আগলে রাখতে হবে। পয়সার কথা ভেবে সেগুলোকে হাতছাড়া হতে দেওয়া যাবে না কোনো ভাবেই।'

সুজাতা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বিপুলবাবুর দিকে। তাঁর কথাগুলো অদ্ভুত ঠেকছে। মানে বুঝতে পারছেন না। তবু কী ভীষণ ভালো লাগছে যে কথাগুলো। মনে ক্যামন যেন ভরসা আসছে নতুন করে। তিনি বিপুলবাবুর দিকে তাকিয়েই রইলেন চুপটি করে। মানুষটাকে আজ একেবারে অন্যরকম লাগছে। অচেনা, মায়াবী আর ভারি আপনজনের মতন।



পানু তান্ত্রিকের প্রায়শ্চিত্ত



কালীপুরের মানুষ বিপদে পড়লে বা বিষাদে থাকলে পানু তান্ত্রিকের পোয়া বারো। ঝাড়ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ, উচাটন কিছু একটা করে চট জলদি সমাধান সে ঠিক বের করে দেবেই। সবসময় তার ফন্দি-ফিকিরে যে ষোলো আনা কাজ হয় তা নয়, কিন্তু কালীপুরের মানুষ তাতেই খুশি। যুক্তি-টুক্তি দিয়ে কষে ভেবে তার বিরুদ্ধে দু-কথা বলবার মতন ফুরসত বা সাহস কোনোটাই তাদের নেই। পানু তান্ত্রিক, মানে পান্নালাল ডাকসাইটে মানুষ। এলাকার প্রবীন মানুষেরা বলেন, 'পান্নালাল আমাদের সহজ মানুষ নয় বাপু। বিস্তর এলেমদার লোক সে। আসামের গভীর জঙ্গলে কঠিন সাধনা করে অনেক সিদ্ধাই-টিদ্ধাই জড়ো করে রেখেছে পান্নালাল তান্ত্রিক। ভূত প্রেতের দল মেনি বেড়ালের মতন দিন রাত্তির পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় তার। পানু তান্ত্রিকের হুকুম কে আগে তামিল করবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে নাকি রীতিমতন প্রতিযোগিতা এখন।'

কাজেই এ মানুষকে চটানোর মতন আহাম্মকি কে করবে? অতএব পান্নালাল সকলেরই নমস্য। তার প্রতি মানুষের এই যে একটা গা ছমছমে ভক্তিভাব, সে সম্পর্কে পানু নিজেও বেশ ওয়াকিবহাল। মানুষের মন থেকে এই বিশ্বাসটা যাতে ফিকে হয়ে মিলিয়ে না যায় তার জন্যে সবসময় সতর্কও থাকতে হয় তাকে। মাথার লম্বা জটাটায় উকুন বাসা বেঁধেছে অনেক দিন। সারাদিন বেজায় চুলকোয়। তবু জটাটা কাটতে পারে না সে। কালীপুরের মানুষ জানে জটাই তার শক্তি। ওই জটার চুল ঘরে রাখলে অপদেবতার ভয় থাকে না। প্রতি অমাবস্যায় গঞ্জ ছাড়িয়ে শহর থেকেও ভক্তেরা আসে মোটা প্রণামির বিনিময়ে সেই জটার চুল নেবার জন্যে। তাছাড়া হাত গুনে গ্রহদোষ বিচার করে গ্রহশান্তির মাদুলি দেবার ব্যবসাটা তো আছেই।

আজকের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। কাজটা ঝুঁকির, তবু দায়িত্বটা ঘাড়ে নিয়েছে পানু। কাজে ঝুঁকি থাকলে আমদানির অংকটাও বাড়ে। সে জানে, ফন্দিটা কাজে লেগে গেলে এলাকায় প্রতিপত্তি বাড়বে। তাছাড়া এই কাজটার বিনিময়ে শোকগ্রস্ত লোকটার থেকে যে টাকাটা বাগিয়ে নিতে পারবে তা দিয়ে কয়েকমাস পায়ের ওপরে পা তুলে বসে খেতে পারবে পানু আর ফড়িং।

ফড়িং পানুর নিত্য সহচর। ভারি ভক্তি করে তাকে। পান্নালালকে একরকম গুরু বলেই মানে সে। ছেলেটার বয়েস কম, কিন্তু বেশ করিতকর্মা। সত্যি বলতে কি আজকের এই ক্লায়েন্ট ফড়িং এর হাত যশেই ছুটে আসছে পানুর কাছে। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে ফড়িং এর দেখা হয়েছিল গত শুক্কুরবার শহরে সন্তাপহারিনী মন্দিরের চাতালে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দুজনেই তখন আকুল হয়ে বিলাপ করছিলেন বিগ্রহের সামনে। বার বার বলছিলেন, 'ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল...একটিবারও যদি আবার দেখা হত তার সঙ্গে...'

ফড়িং এই সুযোগটা লুফে নিয়েছিল একেবারে। মন্দির চত্বর থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় বলেছিল তাঁদের পানু তান্ত্রিকের কথা। যতটা সম্ভব বাড়িয়েই বলেছিল। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল, 'ওনার সম্পর্কে কীই বা বলি বলুন। যাই বলি কম বলা হবে। মৃত্যুর ওপারের জগতটা বলতে গেলে আজকাল উনি একা হাতেই সামাল দিচ্ছেন। সকলের সঙ্গেই নিবিড় যোগাযোগ তাঁর। কিন্তু ও পারের মানুষদের সঙ্গে এই যে তাঁর এমন হলায় গলায় সম্পর্ক, সে কথা কাউকে

বুঝতেটি দেন না কিছুতেই। আমার সৌভাগ্য, অথবা পূর্বপুরুষের পুণ্যি বলতে পারেন যে এমন মস্ত মানুষটা বড্ড স্নেহ করেন আমায়। সেই স্নেহের বশেই গুহ্য কথাটা কথায় কথায় মুখ ফসকে একদিন আমার সামনে বলে ফেলেছিলেন। অবশ্য পই পই করে বারণও করে দিয়েছেন যাতে কথাটা আমি পাঁচকান না করি।'

ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার মুখের ওপর দিয়ে একবার আলতো চোখ বুলিয়ে নেয় ফড়িং। তাঁদের প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করে। তারপর তাঁদের মনের ভাবটা খানিক পড়ে নিয়ে আর একটু চড়িয়ে দেয় সে তার গল্পটাকে, 'একদিন খুব বায়না করায় আমার মৃত বাপের সঙ্গে দেখাও করিয়ে দিতেও তিনি রাজি হয়ে গেলেন এক অমাবস্যায়'।

'সত্যি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন মহিলা।

'নইলে আর বলছি কী', ফড়িং মাথা চুলকে বলে, 'আজ অব্দি এ সব কথা পেটের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলাম, আপনাদের দেখে আজ এত মায়া লাগল যে কথাটা আর চাপতে পারলাম না। কে জানে তিনি অপরাধ নেবেন কিনা। তিনি যে আবার সর্বজ্ঞ। এখানকার কথা নির্ঘাত তাঁর কানে তুলে দেবে পানুবাবার পোষা ভূতগুলো'। চোখেমুখে যতটা সম্ভব ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে মিনতি করে বলে ফড়িং, 'বিশ্বাস করে বলে ফেললাম। আপনারা কাউকে যেন গপ্প করতে যাবেন না আবার...'



কাজ যা হবার এইটুকুনিতেই হয়ে গেল। টোপটা নিখুঁতভাবে কাজে লেগে গেল। এক্কেবারে পরিকল্পনা মাফিক। ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দার মতন ধরে বসলেন, তাঁকে মৃত ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। প্রথমটা রাজি না হবার ভান করে শেষে নিমরাজি হয়ে পানুকে ফোন করেছিল ফড়িং। পরে একটু আড়ালে সরে গিয়ে প্ল্যানটাও জানিয়েছিল সংক্ষেপে। বুদ্ধিটা মনে ধরে গিয়েছিল পানুর।

আজ তাঁরা আসছেন। রাত আটটায় টাইম দিয়েছে ফড়িং। সাতটা তেইশ মিনিটে অমাবস্যা লাগছে। আত্মা আনয়ন ক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গোছগাছে আরো আধঘন্টাটাক। পাক্কা আটটায় জপে বসবেন পানু তান্ত্রিক। এই সময়েই আসতে বলা হয়েছে ওঁদের। এখন আটটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। নিজেকে আয়নায় একবার দেখে নিল পানু। খোলা জটা, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ, পরনে লাল টুকটুকে কাপড়, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা...নাহ, ঠিকই আছে। একেবারে পাকা তান্ত্রিকের মতনই লাগছে তাকে। নিজেই নিজেকে তারিফ করে ওঠে পানু। আর তখনই দরজার কড়াটা খট খট শব্দে বার তিনেক নড়ে ওঠে। বড় বাতিটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেয় পানু। ঘরের মধ্যে শুধুই একটা তেলের ছোট প্রদীপের আবছা ম্যাড়মেড়ে আলো। ছায়া ছায়া ঘরে তামার যজ্ঞবেদির ওপরে খানকতক বেল কাঠ অল্প শিখায় জ্বলছিল। দরজা খুলে আগন্তুকদের বসতে বলে জ্বলন্ত বেলকাঠের টুকরোগুলোর উলটো দিকের আসনে বসল পানু। চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে খানিক মন্ত্র পড়ল। তারপর জলদ গম্ভীর স্বরে মহিলার দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কী চাস মা?'

'সবই তো জানো বাবা', অদ্ভুত খসখসে গলায় বিড়বিড় করে উঠলেন মহিলা। ও টুকু বলতেই গলা কেঁপে উঠল তাঁর। পানু তাকায় তাঁর দিকে। মনে মনে হাসে। আবছা ছায়া ছায়া আলোয় মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছেন তিনি। খুশি হয় পানু। এ সময় ভয় পাওয়া ভারি ভালো। ভেল্কি দেখাতে বেজায় সুবিধে হয় তাহলে। প্রায় নিভে আসা কাঠে একটু ধুনো ছড়িয়ে আবার বাজখাই গলায় সে বলে ওঠে, 'ছেলেকে দেখতে চাস?'

'হুঁ', ওপর নীচ মাথা দোলান মহিলা। তাঁর পাশে বসা ভদ্রলোকও মাথা নাড়ান নিঃশব্দে।

'তার প্রেত রূপ তোদের সহ্য হবে তো?'

'ভয় পেলে তুমি তো আছো বাবা'।

'হুঁ', আশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ায় পানু, 'কী নাম ছেলের?'

'অনি, অনিকেত'।

ম্লান আলোয় আবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে যজ্ঞকুন্ডের ওপারের মানুষদুটির মুখ পড়ার চেষ্টা করল পানু। কিন্তু ম্যাড়মেড়ে আলো আর ধুনোর ধোঁয়ায় ঠিক ঠাওর করতে পারল না। তাদের আবছা মুখদুটোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নিভে আসা আগুনে আরো খানিকটা ধুনো ছড়িয়ে দিয়ে পানু বলে, 'দুজনে নাম ধরে একসঙ্গে ডাকো এবার ছেলেকে। সে ডাক যেন অন্তর থেকে উঠে আসে। খেয়াল রেখো'।

তাঁরা ডাকতে থাকেন, 'অনি, সোনা আমাদের, আয় বাবা...আয়, নেমে আয়...'

তাঁদের আহ্বান যেন হাওয়ার মতন ফিসফিসে স্বরে বাজতেই থাকে ঘরের মধ্যে। ক্রমাগত পাক খেতে খেতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সেই ডাক। শব্দটা ক্রমশ পানুর শরীরকে পেঁচিয়ে ধরতে শুরু করে। গায়ে কাঁটা দিয়ে শীত করে ওঠে পানুর। শ্বাস রোধ হয়ে আসে। গা ছম ছম করে ওঠে তার। এমন অস্বস্তি হচ্ছে কেন আজ? এমন তো হবার কথা নয়? আর ফড়িংই বা আসছে না কেন এখনও? পিছন দিকের খোলা দরজা দিয়ে তার তো চলে আসার কথা এতক্ষনে মেক আপ নিয়ে...

হঠাৎই পানুর পাশে এসে দাঁড়ায় ফড়িং। আড়চোখে তার দিকে তাকায় পানু। তাকিয়ে চমকে ওঠে। ফড়িংকে একদম অন্যরকম লাগছে আজ। চেনাই যাচ্ছে না। ফড়িং খুব ধীরে বাতাসের মতন স্বরে বলতে থাকে, 'আমি এসেছি। কিন্তু এইভাবে আমার কাছে আসার কী দরকার ছিল বলো তো...'

'তবু তো আবার একসঙ্গে হলাম আমরা অনি...'

ধুনোর গন্ধ ছাপিয়ে একটা বিচ্ছিরি পচা পচা গন্ধ এসে লাগছে পানুর নাকে। বাতাস ভারি হয়ে যাচ্ছে সেই গন্ধে। ফড়িং বলেই চলেছে, 'বাবা, তুমি তো এসবে বিশ্বাস করতে না। ভন্ড প্রতারকদের ক্ষমাও করতে না কোনোদিন। তাহলে একেই বা ছাড়ব কেন আমরা? যারা পয়সার জন্যে মানুষ ঠকায়, ভন্ড সেজে মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত...'

খুব রাগ হয়ে গেল পানুর। কী আজেবাজে কথা বকে যাচ্ছে ফড়িং? বাঁ হাত বাড়িয়ে তার পায়ে চিমটি কাটে পানু। কেটেই থতমত খেয়ে যায়। ফড়িং এর পা টা এত ঠান্ডা কেন? তাছাড়া চিমটি কাটার সময় তার আঙুলগুলো যেন নরম গলে যাওয়া মাংসের মধ্যে ঢুকে গেল একেবারে। সেই পচা গন্ধটাও যেন আরো তীব্র হয়ে উঠল ঘরের মধ্যে। পানু আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বড় বাতিটা জ্বালিয়ে দেয়। লাল চোখে তাকায় ফড়িং এর দিকে। আর তাকিয়েই ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে বলে, 'কে তুমি?'

'চিনতে পারলে না, আমি অনিকেত। আমাকে দেখাবে বলেই তো মিথ্যে কথা বলে আমার বাবা মাকে ডেকে এনেছ এখানে', বলতে বলতেই গায়ের চাদরটা একটানে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ছেলেটা। মুহূর্তে মাথা ঘুরে গেল পানু তান্ত্রিকের। ফড়িং নয়, ঘরের মধ্যে যে দাঁড়িয়ে আছে তার গা থেকে পচা গলে যাওয়া মাংস খসে খসে পড়ছে। হাড় বেরিয়ে গেছে শরীরের বিভিন্ন অংশে। ছেলেটির বাবা মায়ের দিকে তাকিয়েও হাড় হিম হয়ে গেল পানুর। তাদের মাথা থেকে, মুখ থেকে গড়িয়ে নামছে কালচে রক্তের স্রোত। মাথার একদিক ফেটে ঝুলে গেছে...আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল পানু। উদ্দেশ্যহীন। মনে হল তাকে শাস্তি দিতে পিছন পিছন ওরাও যেন দৌড়ে আসছে। ছুটতে ছুটতেই দুহাতে কান ধরে তাদের উদ্দেশ্যে প্রাণপনে বলে চলল পানু, 'এবারের মতন মাপ করে দাও। কথা দিচ্ছি জটা কেটে ফেলব। হাতের, গলার রুদ্রাক্ষের মালাগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেব একেবারে। লাল কাপড় পুড়িয়ে দেব দরকার হলে। লোক ঠকানো ব্যবসার ধারও মাড়াব না আর এ জীবনে।'

কতদূর ছুটেছিল খেয়াল নেই। সামনে মস্ত জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল পানু। খেয়াল হল বড় রাস্তায় এসে পড়েছে সে দৌড়তে দৌড়তে। জটলার মধ্যে ফড়িংকেও চোখে পড়ে গেল। পানুকে

অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো সে। জিগ্যেস করল,'কী হয়েছে গুরু?'

হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে শুরু করল পানু তান্ত্রিক, 'ফড়িং, তোর সেই ক্লায়েন্ট...'

'আর আসবে না', বলে ভিড়ের দিকে হাত বাড়ায় ফড়িং, 'ওই যে ওইখানে রাস্তার ওপরে রক্তে মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে। নিজেদের গাড়ি নিয়ে ঠিক সময়েই আসছিল দুজনে আমাদের কাছে। ড্রাইভার না নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করছিলেন ভদ্রলোক। অন্যমনস্ক ছিলেন বোধহয়। বাঁ-হাতের রাস্তা থেকে লরিটা আসছিল খেয়ালই করেননি। লরি এসে ধাক্কা মেরে... মাথাদুটো পুরো থেঁতলে গেছে...স্টিয়ারিংটা দুমড়ে ঢুকে গিয়েছিল ভদ্রলোকের শরীরে। কী বীভৎস পরিস্থিতি...এক্কেবারে স্পট ডেড...'



জিতেন হেমব্রমের কলম



ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মা-বাবা দুজনেই যে সময়টা ঘুমিয়ে পড়েন, সেইসময়টা ভারি আনন্দে কাটে প্রীতমের। এই সময়টা তার। কেবলমাত্র তারই। তার ওপরে খবরদারি করার কেউ নেই। নিজের ইচ্ছে মতন খেলাধুলো, বাগানে ঘোরা, পুকুর পাড়ে বসে জলের ওপর থেকে ছোঁ মেরে মাছরাঙার মাছ তুলে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখা কিংবা খোলামকুচি দিয়ে ব্যাংবাজি করার ক্ষেত্রে এইসময়ে কোনো বাধা থাকে না।

মা অবশ্য প্রতিদিনই শুতে যাবার আগে বলে দেন, 'পুলু, আমি ঘুমিয়ে পড়লে এক্কেবারে বাইরে যাবি না কিন্তু। একলা একলা খবরদার ঘোরাঘুরি করবি না পুকুরের ধারে। বরং এইসময়টা অংক করিস। বাবা কদিন আগে ট্রানস্লেশন প্র্যাকটিস করার জন্যে যে বইটা কিনে এনে দিয়েছেন, সেটা থেকে ট্রানস্লেশনও করতে পারিস নিজে নিজে'।

প্রীতম প্রতিদিনই মায়ের কথা চুপ করে শোনে, কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়লে কথাগুলো আর মনেই থাকে না তার। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে মস্ত সুবিধা। আশেপাশে কোথায় কী যে ঘটে চলেছে তা আর তাঁরা দেখতে পান না। কাজেই প্রীতম সারা দুপুর বাগানে ছাদে দাপিয়ে বেড়ালেও মা কিচ্ছুটি টের পান না কোনোদিন।

আজ ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে দুটো ঘুড়ির প্যাঁচের লড়াই দেখছিল প্রীতম। এগিয়ে পিছিয়ে, লাট খেয়ে দুটো ঘুড়ি ক্রমাগত কাটার চেষ্টা করে চলেছে একে অপরকে। ঘুড়ি দুটোকে দেখে বেশ মজা লাগছিল প্রীতমের। আকাশের বুকে জায়গাটা তো নেহাত কম নয়। দিব্বি নিজেদের মতন উড়ে বেড়ালেই তো পারে তারা। কিন্তু তা হবে না। একটা ঘুড়ির অন্যকে কেটে ধ্বংস করেই মজা। সব জায়গাতেই সারাক্ষণ যেন এই কাটাকুটি খেলা চলছে। একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা নয়, প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকা।

এই যেমন তাদের ক্লাশের অরিন্দম। পড়াশোনায় সত্যিকারের ভালো ছেলে। তার সঙ্গে বন্ধুত্বও দিব্বি জমাট। অংক আর ইংরেজিতে মারাত্মক রকমের তুখোড় অরিন্দম। যেমন বাংলা আর ইতিহাসে চিরকালের টপার প্রীতম। কিন্তু বাংলা ইতিহাসে ভালো পেয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া যায় না। প্রীতমকে অরিন্দম হারিয়ে দেয় ফি বছর। এই নিয়ে বাবা খুবই অখুশি। মায়েরও ভীষণ রাগ প্রীতমের ওপরে। কেন সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারে না অরিন্দমকে হারিয়ে দিয়ে।

এ বছরে বাবা তো বলেই দিয়েছেন জন্মদিনে প্রতিবছর বাবা তাকে তার পছন্দ মতন গল্পের বই কিনে দেন চারখানা করে, কিন্তু পরীক্ষায় অরিন্দমকে হারিয়ে এবারে যদি ফার্স্ট হতে না পারে, তাহলে এ বছরের গিফট ক্যানসেল।

গত কয়েকদিন ধরে খুব চেষ্টা করে দেখেছে প্রীতম কিছুতেই অংক আর ইংরেজির প্রশ্নগুলোকে পোষ মানাতে পারছে না সে। পরশু স্কুলে গিয়ে অরিন্দমকে সব কথা খুলে বলে আবেদনও জানিয়েছিল একটা বছর সে যদি ইচ্ছে করে পরীক্ষাটা একটু খারাপ দিয়ে তাকে ফার্স্ট হবার একটা সুযোগ করে দিতে পারে। কিন্তু অরিন্দম রাজি হয়নি। হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'তাতে লাভটা কী শুনি?'

'আমি চারটে বই পেলে তোর পছন্দ মতন একখানা বই আমার থেকে নিয়ে নিবি তুই'। প্রীতম বলেছিল তাকে।

'ধুস। একটা বইতে হবে না'।

'তালে দুটো নে। ফিফটি ফিফটি। তোর দুটো, আমার দুটো'।

'না আমি পরীক্ষা ইচ্ছে করে খারাপ দিতে পারব না', মাথা-টাথা চুলকে তার প্রস্তাব নাকচ করে দিল অরিন্দম। তারপর থেকে একটু মুষড়ে আছে প্রীতম।

আকাশে পাক খেতে খেতে একটা ঘুড়ি নিজের সুতো দিয়ে প্রাণপনে পেঁচিয়ে ধরেছে আর একটা ঘুড়ির সুতোকে। দুটো ঘুড়িই নানা কসরত করছে অন্যটাকে কেটে দেবার। প্রীতম হাঁ করে দেখছিল। দেখছিল আর অপেক্ষা করছিল। যে ঘুড়িটা কেটে যাবে, টলতে টলতে নিয়ন্ত্রণবিহীন সেই ঘুড়িটা আকাশের গায়ে ভাসতে ভাসতে খসে পড়বে পৃথিবীর ওপরে। প্রীতম দৌড়তে দৌড়তে অনুসরণ করবে তাকে। তারপর কুড়িয়ে আনবে ঘুড়িটা।

বলতে বলতেই ওই যে কেটে গেল দুটোর মধ্যে একখানা ঘুড়ি। ঘুড়িটা ভাসছে। ভাসতে ভাসতে উড়তে উড়তে অনেক উঁচু থেকে ক্রমশ নেমে আসছে নীচের দিকে। ছাদ থেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে প্রীতম। আলতো হাতে, শব্দ না করে খিড়কির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে ছুটতে শুরু করে সে ঘুড়িটার দিকে নজর রেখে। ঘুড়ির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে কতদূর যে চলে এসেছে খেয়ালই থাকে না। ঘুড়িটা নামতে নামতে একটা গাছের ডালে আটকে যেতেই সম্বিৎ ফেরে তার। প্রীতম থামে। তখন সে রীতিমতন ঘেমে গেছে। চারপাশে চেয়ে বেশ গা ছম ছম করে ওঠে তার।

এটা সেই পুরনো গোরস্থান। আর একটু এগিয়ে গেলেই বাঁ হাতে পড়বে মাতা মেরীর গীর্জা। ওই দিকে বেশ কিছু খ্রিস্টান পরিবার বসবাস করেন। ওদের সঙ্গে পড়ে কুনাল, ওর বাড়িও এই দিকটায়। বড়দিনে কুনাল নেমন্তন্ন করে ওদের প্রতি বছর। যে গাছটার ডালে আটকে গিয়ে ঘুড়িটা লটর-পটর করে দুলছিল তার ঠিক নীচেই একটা বাঁধানো সমাধি। ঘুড়িটা হাওয়ায় দুলছিল। ঠোক্কর খাচ্ছিল গাছের শক্ত ছুঁচলো শুকনো ডালটায়। মন খারাপ হয়ে গেল প্রীতমের। এতটা পরিশ্রম এক্কেবারে মাটি হয়ে গেল। ঘুড়িটা অক্ষত থাকবে না। ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

এই জায়গায় আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় বুঝেই তড়িঘড়ি পিছু ফিরল প্রীতম। আর তখনি লোকটাকে সে দেখতে পেল। পরনে ফুল প্যান্ট, গায়ে সাদা শার্ট। তার ওপরে বেশ পুরনো একটা কোট চাপানো। মাথায় টুপি। এই গরমে লোকটা যে কী করে গায়ে কোট চাপিয়ে আছে কে জানে! যে গাছের ডালে ঘুড়িটা ঝুলছিল, সেই গাছটার পাশ থেকেই ভারি উদাস ভঙ্গীতে বেরিয়ে এল লোকটা। তারপর অবাক চোখে প্রীতমের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম তো প্রীতম, তাই না?'

প্রীতম ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। লোকটা তার নাম জানল কী করে? এর সঙ্গে আগে তো কখনও তার আলাপ হয়নি। ইতস্তত ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'চিনি বৈকি, খুব চিনি', লোকটা হাসল, 'এই অঞ্চলে কাকেই বা চিনি না বলো। তোমাকে চিনি, তোমার বাবাকে চিনি, তোমার ঠাকুর্দাকেও চিনতাম। চেনা ছাড়া উপায় নেই যে গো...সারাদিন ধরে আমি যে কেবল এই অঞ্চলের মানুষজনের ওপরে লক্ষ রাখি এক মনে...'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল প্রীতম।

'ও আমার এক নেশা। সবার দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি কবে কাকে কাছে পাব আর আমার একটা পুরনো হিসেব তার সাহায্যে মিটিয়ে নিতে পারব নিশ্চিন্তে'।

'কীসের হিসেব?'

'অত কথা তুমি বুঝবে না', লোকটা মাথা থেকে বিবর্ণ টুপিটা খুলে খানিক মাথা চুলকোয়, 'বাদ দাও। তোমার তো একটা ছোট্ট নাম আছে। আমি বরং তোমায় ওই নামেই ডাকি কেমন, ওতে ডাকতে সুবিধে হবে'।

'আপনি আমার ডাক নামও জানেন?'

'জানি'।

'কী বলুন তো?' অবিশ্বাসী গলায় বলে প্রীতম।

'পুলু। কী হে ঠিক বললাম তো?'

'হ্যাঁ', লাজুক গলায় বলল প্রীতম।

'তাহলে আর একটু বলি। দেখো মিলছে কিনা। ভুল বললে ঠিক করে দিও, কেমন?'

'বলুন', লোকটার কথায় বেশ মজা পাচ্ছিল এবার প্রীতম।

'স্কুলে তোমার ক্লাশে তুমি কিছুতেই ফার্স্ট হতে পারছ না। অরিন্দম তোমাকে বার বার অংক আর ইংরেজিতে গো হারা হারিয়ে দিয়ে ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে ফি বছর...'

'একদম তাই। আমি অংক আর ইংরেজিতে বড্ড কাঁচা'।

'জানি। ওই জন্যেই তো তোমাকে সাহায্য করতে আমি তোমার কাছে এলাম'।

'আমাকে আপনি সাহায্য করবেন কীভাবে? আর খামোকা আমাকে সাহায্য করতে চাইছেনই বা কেন?'

'কারণ একটা তো আছেই পুলুবাবু'।

'আমি কি সেটা জানতে পারি?'

'আচ্ছা খানিক বলি তবে। মন দিয়ে শোনো', বলে ডান হাতে টুপিটা ধরে হাওয়া খেতে খেতে বলতে লাগল লোকটা, 'আমার নাম জিতেন হেমব্রম। দেশী খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম আমার। ওই সামনের পাড়াতেই থাকতাম একসময়'।

'এখন আর থাকেন না?' জিতেন হেমব্রমের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে প্রীতম।

'নাহ। আর সেখানে থাকার উপায় নেই'।

'কেন?'

'তুমি বাপু কথায়-কথায় বড্ড কেন কেন করো। আরে বাবা সব কেনরই কি আর উত্তর হয় গো', বলে দু-হাতে আঙুল মটকাতে মটকাতে আবার কথা বলা শুরু করে জিতেন হেমব্রম, 'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী অরিন্দমের দাদু আমার সহপাঠী ছিল...'

'ধুস, আপনি গুল মারছেন', হেসে ওঠে প্রীতম, 'গোলোকদাদু এক্কেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। আর আপনি দিব্বি জোয়ান। দেখে মনে হচ্ছে আমার বাবার থেকে কয়েক বছরের মাত্র বড় হবেন আপনি'।

'আহা, আমার বয়েসটা যে আর বাড়ার উপায়ই নেই। আমি যে একটা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পড়েছি হে সেই কোনকালে...'

'কেন?'

'আবার কেন... তুমি জ্বালালে বাপু...'

'কী করব, আপনি যে প্রশ্ন করার মতন কথাই বলছেন। বয়েস কি কারো দাঁড়িয়ে থাকে কোনোদিন?'

'থাকে। একবার কেউ যদি মরে যায় আর তার বয়েস বাড়ার ফুরসত থাকে না'।

'তার মানে আপনি বলছেন যে আপনি আর বেঁচে নেই?'

'কথাটার মানে তেমনই তো দাঁড়াচ্ছে'।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি ভূত হলে আপনাকে দেখে আমার নিশ্চয়ই ভয় লাগত'।

'তোমাকে যতটা বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম তুমি ততটা বুঝদার ছেলে নও পুলু', জিতেন হেমব্রম মাথা নাড়তে থাকেন আক্ষেপের ভঙ্গীতে, ' আরে ভূত দেখলেই ভিরমি খেতে হবে এমন মাথার দিব্বি কে কাকে দিয়েছে বলো দেখি। যাকগে শোনো, গোলোকের সঙ্গে আমার একটা প্রাচীন শত্রুতা আছে'।

'কীসের শত্রুতা?' প্রীতম প্রতিবাদের সুরে বলে, 'গোলোকদাদুর সঙ্গে কারো শত্রুতা থাকতেই পারে না। ভীষণ ভালো মানুষ উনি। শুধু আমি নই, আমাদের এলাকার সক্কলে এ কথা বলে'।

'আহা গলু ছেলে খারাপ এ কথা বলছি না, কিন্তু ওই যে আমারও তোমার মতন...'

'কী আমার মতন?' রেগে গিয়ে বলে প্রীতম।

'তোমারই মতন আমাকেও ক্লাশে ওই গলুই আটকে দিয়েছে চিরকাল। তোমার যেমন অরিন্দম, আমার তেমন গোলোক, কিছুতেই গাঁট পেরিয়ে ফার্স্ট হতে পারিনি কোনোদিন। ও আমার জাত শত্রু। আমি বদলা নিতে চাই'।

'কী বদলা?'

'এই নাও এই কলমটা রাখো', বলে কোটের পকেট থেকে একটা কলম বের করে প্রীতমের হাতে দেন জিতেন হেমব্রম, 'এই কলমের মধ্যে আমার মেধা ভরে দিলাম। অংক ইংরেজি তোমার পায়ে মেনি বেড়ালের মতন হামাগুড়ি দেবে এরপর থেকে। দেখি ওই গোলোক বেটার নাতি কী করে এবারে টেক্কা দেয় তোমায়। গলুর ওপরে পারিনি, এবারে ওর নাতিকে হারিয়ে জ্বালা মেটাবো। উহ কী কষ্ট করে ঘুড়িটাকে আকর্ষণ করে এদিকে নিয়ে এলাম যাতে তোমাকে হাতের কাছে পাই... যাও

কেটে পড়ো। কলমটার কথা কাউকে বোলো না দয়া করে। তাহলে আমার প্ল্যানটাই বানচাল হয়ে যাবে'। যেমন হঠাৎ করে গাছের আড়াল থেকে সামনে হাজির হয়েছিলেন জিতেন হেমব্রম, তেমনি আচম্বিতেই আবার গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলেন তিনি। এতক্ষণ ভয় করেনি, কিন্তু চোখের সামনে আস্ত একটা মানুষকে অমন ফুস করে হাওয়ায় মিশে যেতে দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল প্রীতমের। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে সোজা ছুট লাগালো বাড়ির দিকে।

২

শমিত স্যারের অংক ক্লাশে নিজেই অবাক হয়ে গেল প্রীতম। প্রশ্নমালার সবচেয়ে শক্ত অংকটা, যেটা অরিন্দম বুঝেই উঠতে পারেনি সেটা কষতে ঠিক তিন মিনিট সময় নিল সে। কুন্তল স্যারের ইংরেজি ক্লাশে এমন ঝরঝরে আর আলংকারিক সব বাক্য লিখল রাইটিং স্কিলের খাতায়, কুন্তল স্যার নিজেই বিষম খেয়ে কেশে টেসে অস্থির। প্রীতম অন্যদের চোখ এড়িয়ে কলমটাকে একবার পেন্নাম ঠুকে নিল। সত্যি এলেম আছে জিতেন হেমব্রমের। এক দিনের মধ্যে ক্লাশে প্রীতমকে একেবারে হিরো বানিয়ে দিয়েছে কলমটা। এই কলম কাছে থাকলে বার্ষিক পরীক্ষায় তার ফার্স্ট হওয়া আটকায় সাধ্য কার। জন্মদিনে মনের মতন চারখানা গল্পের বইও একেবারে বাঁধা।

ছুটির পরে বাড়ি ফেরার পথে অরিন্দম এসে হাত রাখল পিঠের ওপরে, 'এই পুলু, ব্যাপারটা কী রে?'

'কী ব্যাপার?' গলাটাকে স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল প্রীতম।

'তুই যে হঠাৎ অংক ইংরেজিতে এমন তুখোড় হয়ে গেলি এক রাত্তিরের মধ্যে? মা সরস্বতী দুম করে তোকে কিছু বর-টর দিয়ে দিলেন নাকি রে?'

'ইয়ার্কি মারিস না যা', ছদ্ম রাগের ভঙ্গীতে বলে প্রীতম, 'ফার্স্ট পজিশনটা তো নিজের সম্পত্তিই বানিয়ে ফেলেছিস তুই। কত করে বললাম একটা বছর আমাকে ছেড়ে দে। রাজি হলি না। অমন ভালো ভালো বই হাতছাড়া হতে চলেছে। কী করব বল, মরিয়া হয়ে খাটছি এখন'।

'খাট খাট। জোর কদমে চালিয়ে যা। আমার কোনো অংক আটকে গেলে তোর হেল্প নেব। তুই ঠিক পারবি। দাদু বলেন মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। কেউ যদি মন দিয়ে কিছু চায় আর তার জন্যে চেষ্টা করে, তাহলে সে তা পাবেই। জোর করে তাকে আটকে রাখার সাধ্য কারো নেই'।

'আচ্ছা আমি যদি তোকে হারিয়ে দিয়ে ফার্স্ট হই, তোর আমার ওপরে রাগ হবে না? মনে হবে না আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া দরকার?'

'তোর মাথাটা গেছে পুলু', হা হা করে হেসে ওঠে অরিন্দম, 'অভ্যাস নেই তো, হঠাৎ করে রাত জাগছিস, নিশ্চিত পেট গরম হয়েছে তোর, নইলে মাথার ব্যারাম', বলে ব্যাগের মধ্যে হাত গলায়

অরিন্দম। তারপর একটা ডাঁসা পেয়ারা বের করে এনে প্রীতমের হাতে দেয়, 'এই নে খা। আমাদের গাছের পেয়ারা। তোর জন্যে এনেছিলাম...'

পেয়ারাটা হাতে নিয়েই তাতে কামড় বসায় প্রীতম। তারপর অরিন্দমের দিকে চেয়ে বলে, 'অরিন, তুই জিতেন হেমব্রমের নাম শুনেছিস?'

'কে?' চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে অরিন্দম।

'জিতেন হেমব্রম। গোলোকদাদুর সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে পড়তেন'।

'তুই কী করে চিনলি তাঁকে?'

'শুনেছি ওনার কথা', আসল ঘটনা চেপে গিয়ে বলে প্রীতম, 'আমার ওঁর সম্পর্কে খুব জানার ইচ্ছে। বাড়ি ফিরে দাদুকে জিজ্ঞেস করে জানাবি আমায় একটু ফোন করে ওই ভদ্রলোকের কথা?'

'আচ্ছা বেশ। জানাবো', বলে স্থির দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অরিন্দম প্রীতমের দিকে। তারপর হাঁটা লাগায় বাড়ির পথে।

বাড়ি ফেরার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অরিন্দমের ফোন এল মায়ের মোবাইল নম্বরে। প্রীতম ফোন ধরতেই অরিন্দম বলে উঠল, 'নে সরাসরি দাদুর সঙ্গেই কথা বলে নে'।

'দে দাদুকে', বলে অপেক্ষা করতে থাকে প্রীতম। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফোনের অপর প্রান্তে গোলোকদাদুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে, 'পুলুদাদু, বলো, কী ব্যাপার?'

'দাদু, তোমার জিতেন হেমব্রমকে মনে আছে? তোমার সঙ্গে স্কুলে পড়তেন?'

'কেন মনে থাকবে না', গোলোকদাদুর কথায় উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে, 'হি ওয়াজ আ জিনিয়াস। ওর মতন ইংরেজি খুব কম লোকে লিখতে পারে। অংকেও ভীষণ স্ট্রং ছিল জিতেন। কিন্তু...'

'কিন্তু কী দাদু?' কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রীতম।

'ছেলেটা খুব অ্যামবিশাস ছিল। আর অন্যের সাফল্য, বিশেষত অন্য কেউ তাকে ছাপিয়ে যাবে এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারত না জিতেন। যে কারণে তার কোনো বন্ধু ছিল না। জিতেনের কাছে সকলেই ছিল প্রতিযোগী, কমপিটিটর...'

'তুমি তো বোধহয় পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে স্কুলে তাই না?'

'হ্যাঁ'।

'তাহলে তোমার ওপরেও জিতেন হেমব্রমের রাগ ছিল খুব?'

'ছিল'।

'তুমি জানতে সে কথা?'

'আমরা বাকি সব বন্ধু জানতাম। জিতেন রাগে আমার সঙ্গে কথা বলত না পর্যন্ত। এই নিয়ে আড়ালে আমরা সকলে খুব হাসাহাসি করতাম'।

'তারপর কী হল?'

'জিতেন সংসার করেনি। একটু খ্যাপাটে মতন হয়ে গিয়েছিল। কলেজ পাশ করার পর চার্চে যোগ দেয়। তারপর...'

'তারপর কি দাদু?'

'ভেরি স্যাড', বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন গোলোকদাদু, 'ওর যখন মিড ফর্টি, তখন একটা কার অ্যাকসিডেন্টে জিতেন মারা যায়। চার্চের উত্তর দিকে খানিক হেঁটে যে গ্রেভ ইয়ার্ড ওখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল ওকে। আমরা বন্ধুরা কয়েকজন গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এতদিন বাদে জিতেনের কথা কী করে জানলে দাদু?'

'আমি একদিন স্কুল-ফেরত যাব তোমার কাছে অরিনের সঙ্গে। তখন সব কথা বলব তোমায়', বলে ফোন রেখে দেয় প্রীতম।

রাতের বেলায় পড়ার টেবিলে বসে ব্যাগ থেকে জিতেন হেমব্রমের কলমটা বের করে সামনে রাখল প্রীতম। ওটা হাতে নিলেই শমিত স্যারের দেওয়া হোমওয়ার্কের অংকগুলো মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে সে জানে, তবু কলমটা ছুঁয়ে দেখল না প্রীতম। নিজের কলম দিয়েই অংকগুলো কষার চেষ্টা শুরু করল সে। ভুল হল, আবার নতুন করে অংক শুরু করল সে। আবার, আবার। গোলোকদাদু বলেছেন মানুষ ইচ্ছে আর চেষ্টা করলে সবকিছু করতে পারে। সেও পারবে। পারবেই। নিজের চেষ্টাতেই পারবে একদিন।

জিতেন হেমব্রমের কলমটার দিকে তাকায় প্রীতম। লোকটার জন্যে মায়া হয়। এত বড় প্রতিভাবান মানুষ, কিন্তু শুধুমাত্র হিংসাই শেষ করে দিল তাঁকে। মৃত্যুর পরেও মানুষটার মনে শুধুই প্রতিশোধস্পৃহা। মরার আগেও বন্ধুত্বের অলৌকিক আস্বাদন তিনি পাননি, মৃত্যুর পরেও জানতে চাননি কখনও, প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই মানুষকে কাঙ্ক্ষিত আনন্দের অনিঃশেষ জগতে পৌঁছে দেবার রাস্তাটা চিনিয়ে দিতে পারে ঠিকঠাক।

প্রীতম মন ঠিক করে ফেলল। সুযোগ মতন সে আর অরিন একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে একবার জিতেনদাদুর সমাধির সামনে। পারলে গোলোকদাদুকেও নিয়ে যাবে। প্রাণপনে বোঝানোর চেষ্টা করবে ওঁকে বন্ধুত্বের স্পর্শমাখা সম্পর্কগুলো কত আরামের আর শান্তির। তার স্থির বিশ্বাস জিতেনদাদু বুঝবেন। বুঝবেনই। আর তখন তিনি নিজেই তাঁর কলমটা চেয়ে নেবেন প্রীতমের কাছ থেকে।



লাস্ট মিনিট সাজেশন



মৃদুলের দেওয়া প্রস্তাবে একটুও সায় ছিল না আমার। জাকিরদার থেকে দশ টাকার আলু কাবলি কিনে কাঠি দিয়ে তরিবত করে খাচ্ছিলাম তখন স্কুলের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আলুকাবলিটা একটু ঝাল ছিল ঠিকই, কিন্তু খেতে মন্দ লাগছিল না। সুধন্য বলল, 'একাই সবটা সাবড়ে দিবি নাকি রে, দে খাই একটু'।

স্কুলে আসার দিন প্রায় শেষ। টেস্ট পরীক্ষার পরে স্পেশাল ক্লাশ চলছিল কদিন। হেডস্যার বলে দিয়েছেন, 'অনেক হল। এবার বাকি কটা দিন বাড়িতেই পড়াশুনো কর তোরা। আমার হাতের ঠোঙাটা সুধন্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ রে সুধন্য, ফাইনাল পরীক্ষার সময় ইংরেজির শর্ট কোশ্চেনগুলো ম্যানেজ করতে পারবি তো ঠিকঠাক?'

একসঙ্গে অনেকখানি আলুকাবলি মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে সুধন্য বলল, 'ইংরেজি বাংলা নিয়ে তো চিন্তা নেই, আমার চাপ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি নিয়ে। এখনও অনেকগুলো চ্যাপ্টার তৈরি হয়নি'।

দেবতনু বলল, 'আর অংকের কথা বলছিস না যে কেউ। আমার তো অংক শব্দটা উচ্চারণ করলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এখন থেকেই'।

ঠিক তখনই মৃদুল ওর ওই বিচ্ছিরি আর ভয়ংকর প্রস্তাবটা পেশ করল আমাদের সামনে। আমি এমনিতেই ভীতু। রাত্তিরবেলা টিউশন পড়ে একলা বাড়ি ফেরার পথে বটতলা আর বোসেদের পোড়ো বাড়িটা পেরোতে প্রায় প্রতিদিনই মনে মনে ভিরমি খাই। এলাকায় ওই দুটো জায়গা সম্পর্কেই বেজায় বদনাম। মফসসল শহরে প্রায় সব এলাকাতেই মার্কামারা কিছু ভূতুড়ে জায়গা থাকে। আমাদের এলাকায় সে জায়গাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বোসেদের ওই পরিত্যক্ত বাড়িটা। একসময় এই বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব হত বলে শোনা যায় বড়দের মুখে। এখন বাড়িটা খাঁ খাঁ। বাদুড়ের আস্তানা। আর আস্তানা গেড়ে রয়েছেন বিমলদা, মানুদি আর মিনতিমাসিমা।

বোস বাড়ির সব শরিক কলকাতায় চলে যাবার পরেও মিনতিমাসিমা আর মানুদিদিই কেবল থেকে গিয়েছিল ওই বাড়ির ভাঙাচোরা দুখানা ঘরে। একরাতে রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুনে পুড়ে মারা যায় দুজনেই। তখন থেকেই বাড়িটার বদনাম শুরু। সকলে বলত মৃত্যুর পরেও মানুদি আর তার মা নাকি ও বাড়ি ছেড়ে যায়নি। রাত-বিরেতে কেউ কেউ ও বাড়ির আশেপাশে তাদের ছায়াশরীরকে ঘুরেফিরে বেড়াতেও দেখেছে কয়েকবার।

বিমলদা ওসব বিশ্বাস করত না। বিমলদা ওই বাড়ির একটা ঘরে ক্লাব খুলে নাটকের দল নিয়ে রিহার্সাল করাত রাত্তিরবেলা। রাত হয়ে গেলে এক এক দিন সেখানে থেকেও যেত একলা একলা। কিন্তু এক রাতে ওই ক্লাব ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল বিমলদা। কেন কেউ জানে না। বিমলদা মানুষটা খুব কাছের লোক ছিল আমাদের। খুব উৎসাহ পড়াশোনায়। আমাদের ডানপিটেমিতেও। মৃদুল, দেবতনু, মইনুল, সায়ন্তন, সুধন্য, সুতনুরা বিমলদার কাছে টিউশন পড়ত। প্রথমটা রাজি না হলেও, আমাদের জোরাজুরিতে অংক বিজ্ঞানের দুর্দান্ত সাজেশন দিয়েছিল বিমলদা মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে-আগে।

মৃদুল বলল, 'প্ল্যানচেট করব। ডেকে নিয়ে আসব বিমলদাকে। বলব কোনো কথা শুনতে চাই না, আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে লাস্ট মিনিট সাজেশন আর সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো বলে দিতেই হবে...'

কথাটা শুনেই ভয়ে বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল আমার। মৃদুলটা বলে কী? ভূত-প্রেত নিয়ে ফাজলামি মারতে চাইছে, নাকি এইসব বলে টলে ভয় দেখাতে চাইছে আমায় ইচ্ছে করে?

কোনো দিন মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে ভয়ে আমি খোলা জানালার ও পাশের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারি না। সেই আমি কিনা বসব প্ল্যানচেটে? মৃদুলের প্রস্তাবে সায় দেওয়াটা আমার কাছে সত্যিই অসম্ভব আর হটকারি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দেবতনুটা মহা পাকা। ও অমনি মৃদুলের কথায় দুম করে রাজি হয়ে গেল। সুধন্য আমার এত কাছের বন্ধু। ও তো আমাকে দিব্বি চেনে জানে। সে পর্যন্ত মৃদুলকে প্রশ্রয় দিয়ে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কিন্তু দারুন ইন্টারেস্টিং হবে'।

আমি তবু মিনমিন করে একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'এসব আষাঢ়ে পরিকল্পনা বাদ দে। প্ল্যানচেট করে সত্যিই কি কখনও বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন জানা যায়?'

'কেন যাবে না?' সবজান্তার মতন মুখ করে বলে মৃদুল, 'একবার মারা গেলে মানুষের কাছে অজানা বলে আর কিছু থাকে না। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই তখন তার হাতের মুঠোয়...'

'তাই যদি হত তাহলে বছর বছর এত ছেলেপুলে ফেল করত না পরীক্ষায়। চাকরির পরীক্ষাতেও সক্কলে পাশ করে যেত অনায়াসে', বিরক্ত হয়ে বলে মইনুল,'ব্যাপারটা যখন এতই সহজ আর সস্তা, স্রেফ প্ল্যানচেটে কোনো একটা প্রেতাত্মাকে ডেকে নিয়েই কাজ হাসিল করে ফেলত সব্বাই। আমি এসবের মধ্যে নেই...'

মইনুলের কথাটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দেবতনু জিগ্যেস করল, 'প্ল্যানচেটটা করা হবে কোথায়?'

'বোসেদের পরিত্যক্ত বাড়িটায়', স্থির অচঞ্চল গলায় বলল মৃদুল, 'যে ঘরে বিমলদা মারা গিয়েছিল, সেখানেই'।

'কবে, কখন?' ভিজে নরম হয়ে যাওয়া আলুকাবলির ঠোঙাটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুধন্য জিজ্ঞেস করল।

'আসছে মঙ্গলবার। সন্ধের পর', গম্ভীর গলায় উত্তর দিল মৃদুল, 'ওইদিন অমাবস্যা। আমাদের কাজে সুবিধে হবে। এইসব তিথিতে প্রেতাত্মারা বেশি সক্রিয় থাকে'।

'বাড়ি থেকে কিছুতেই রাজি হবে না দেখিস', মরিয়া হয়ে বলি আমি।

দেবতনু, সুধন্য, মৃদুল সবাই বিচ্ছিরি মুখ করে হেসে ওঠে আমার দিকে চেয়ে। মুখ বিকৃত করে আমাকে ভেঙিয়ে দিয়ে বলে, 'ওরে ভীতুরাম, এই কথা কি বাড়িতে বলা যায়? বাড়িতে অন্য কিছু দরকারের কথা বলেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে সেদিন। আর হ্যাঁ, দয়া করে সেলফোনগুলো বন্ধ রেখো। প্ল্যানচেটে বসার পর পকেটে ফোন বেজে উঠলেই রাম কেলো। ফালতু শব্দ-টব্দের মধ্যে বিমলদা কিছুতেই আর আসতে চাইবে না তাহলে...'

ফ্যাঁসাটে গলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘরে আলোও জ্বলবে না?'

'উঁহু', দেবতনু বলল বিজ্ঞের মতন মুখ করে, 'আলো জ্বেলে এসব কাজ হয় না। তবে মোমবাতি আর দেশলাই আমাদের সঙ্গে থাকবে। আপতকালীন বন্দোবস্ত হিসেবে'।

'একদম', মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দেয় মৃদুল।

২

প্রথমটা আসব না ভাবলেও শেষ পর্যন্ত না এসে থাকতে পারলাম না। না যদি আসতাম, জানিই তো অন্যেরা এক্কেবারে আমার পিছনে পড়ে যেত। বন্ধু বলে রেয়াত তো করতই না, উপরন্তু কতদিন ধরে যে ক্ষেপিয়ে মারত আমাকে কে জানে। তাছাড়া অস্বীকার করব না, মনে মনে কৌতূহলও হচ্ছিল। নিজেই নিজেকে বোঝালাম, 'বিমলদা বেঁচে থাকতে আমাদের তো খুবই স্নেহ করত। কাজেই সত্যিই যদি বিমলদার আত্মা আমাদের ডাকে সামনে এসে দাঁড়ায়, অন্তত ঘাড়ে টাড়ে চেপে বসবে না দুম করে'।

ঘরে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। তার ওপরে পুরনো খবরের কাগজ পেতে গোল হয়ে বসে পড়লাম আমরা। আমরা মানে আমি, দেবতনু, সুধন্য আর সুতনু। মৃদুলের আসতে দেরি হচ্ছিল। আমাদের ফোন বন্ধ। আমি পকেট থেকে ফোন বের করে অন করতে যেতেই দেবতনু ইশারায় বারণ করল আমাকে। চাপা গলায় বলল, 'দরকার নেই, এসে পড়বেখন এক্ষুনি'। বাইরে ফ্যাকাশে হয়ে আসা আলো দ্রুত নিভে আসছিল আর ঘরের মধ্যের অন্ধকার ঘন হচ্ছিল ক্রমাগত। আমরা কেউ কথা বলছিলাম না। মৃদুলের পরামর্শ মতন এক মনে কেবল বিমলদার কথা ভেবে যাচ্ছিলাম। ঘরের এক কোনের ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বিচ্ছিরি শব্দ করে একটা তক্ষক ডেকে উঠল। আমার মনে হল কে যেন চাপা নিঃশ্বাস ফেলল আমার ঘাড়ের ওপরে। চমকে উঠে আমার পাশে বসা দেবতনুর বাঁ হাতটা চেপে ধরলাম আমি। ঘরের মধ্যের ক্ষীণ আলোটুকুর ওপরে অন্ধকারের চাদর চাপা পড়ে গেছে তখন। তবুও দেখতে পেলাম খোলা দরজা দিয়ে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে মৃদুল বসে পড়ল চুপ করে। অন্যরাও খেয়াল করেছে তাকে। সুতনু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'এত দেরি করলি কেন রে মৃদুল?'

অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে এখন খানিক। দূরে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের অতি মৃদু আলোর রেখা জানলা গলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের ছায়া শরীরগুলোকে যেন অপার্থিব করে তুলেছে। সেই মরা আলোয় দেখলাম মৃদুল তার ডান হাতের তর্জনি ঠোঁটের ওপরে রেখে আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দিল। একটা শিরশিরে হাওয়া এসে পাক খাচ্ছিল ঘরের মধ্যে। মার্চ মাস পড়ে গেছে। তবু সেই হাল্কা বাতাসেই আমার শীত করছিল। বিচ্ছিরি শব্দ তুলে একপাল কুকুর বেমক্কা কেঁদে উঠল বাইরের রাস্তায়। বোসবাড়ির বাগানে চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করে প্যাঁচা ডেকে উঠল এই ভর সন্ধেবেলাতেই। আমার

মনে হল, যে ঘরে বসে আছি তার পাশের ঘরে কারা যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। এই নিস্তব্ধ বাড়িতে তাদের পায়ের শব্দ, চুড়ির শব্দ, শাড়ির মৃদু খসখস শব্দও স্পষ্ট হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছল। ঠিক তখনি একটা লম্বা ঘোলাটে মূর্তি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। শরীরটা অস্পষ্ট। কিন্তু তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটি ভারি চেনা।

সুতনু অস্ফুটে বলে উঠল, 'বিমলদা...'

আমার বুকের মধ্যে দুম দুম করে শব্দ হচ্ছিল। কাঁটা দিয়ে উঠেছে গায়ে। বুঝতে পারছিলাম শিড়দাঁড়ার কাছটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

মৃদুল তার ডান হাতটা শূন্যে তুলে বাড়িয়ে দিল সেই ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা মূর্তিটার দিকে। দেখলাম ওর হাতটা কাঁপছে। অবাক হয়ে গেলাম। ওর মতন ডাকাবুকো ছেলেও ভয় পেয়ে গেল নাকি?

সেই ছায়া ছায়া আগন্তুকের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে দেবতনু বলে উঠল, 'তুমি কি সত্যিই বিমলদা?'

উত্তর এল না। সেই ঘোলাটে অবয়বটার মধ্যে একটা অস্থিরতা চোখে পড়ল শুধু। মারাত্মক ছটফটানি। যেন যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ও। সেই ছায়াশরীর থেকে একটা তীক্ষ্ণ, বুক কাঁপিয়ে দেওয়া আর্তনাদের মতন শব্দ ঠিকরে এল। অমনি একটা মৃদু গোঙানির মতন শব্দ করে উঠল মৃদুল। মৃদুল মাথা নীচু করেই বসে ছিল। মনে হল ওর মাথাটা বুকের কাছে আরো নুয়ে পড়ল। বাইরে কুকুরগুলো আবার কেঁদে উঠল সমস্বরে। ক্রমশ আরো ঠান্ডা হতে থাকা হাওয়াটা ঘরের মধ্যে আবার পাক খেতে খেতে আমাদের জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে। ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। মনে হল চেতনা হারিয়ে যাবে আমার। তখনই সেই পাক খেতে থাকা হাওয়ার মধ্যে থেকে বিমলদার খুব পরিচিত কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলাম। হাওয়ার মিশে গিয়েও সেই মিহি কণ্ঠস্বর বলে চলেছে, 'তোদের দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট...'

'কিসের কষ্ট বিমলদা?' দেবতনু আড়ষ্ট গলায় জিগ্যেস করল ফিসফিস করে। ওর গলা কাঁপছিল।

'এখানকার ভারি বাতাসের গায়ে মৃত্যু লেগে আছে। তোরা এই মৃত্যুর জগৎ থেকে পালিয়ে যা...এই বাড়িতে যারা ঢোকে মৃত্যু খুঁজে খুঁজে বেড়ায় তাদের...কেন তবু মৃত্যুকে নেমন্তন্ন করতে গেলি মৃদুল...জীবন থেকে একবার যে ঝরে যায়, জীবনকে দেবার মতন আর যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তার...'

'ওদের আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ডেকে এনে ফাইনাল পরীক্ষার লাস্ট মিনিট সাজেশন যোগাড় করে দেব...কিছু একটা করো তুমি বিমলদা। আর তো কখনও চাইব না কিছু...প্লিজ বিমলদা, প্লিজ...' মৃদুলের গলাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে এখন।

আমাদের সামনে কিছু সাদা কাগজ আর একটা পেনসিল রাখা ছিল আগে থেকেই। মৃদুল বলেছিল, 'মিডিয়াম করে দেব সুতনু কিংবা দেবতনুকে। বিমলদার আত্মা ওদের কারো মধ্যে ঢুকে ওদের হাত দিয়েই সাজেশন লিখে দেবে ওই সাদা কাগজে। পেনসিল দিয়ে। কিন্তু সুতনু বা দেবতনু কিছু লেখার আগেই একটা সাদা কাগজ নিজের খেয়ালেই লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হাওয়ায় ভর দিয়ে। পেনসিলটাও শূন্যে উঠে গেল মাটি ছেড়ে।

ঘরের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া বইছে মনে হচ্ছে। সেই হাওয়ায় আমরা কেঁপে যাচ্ছি, অথচ কাগজটা স্থির হয়ে আছে। ঘোলাটে মূর্তিটা আরো স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পেনসিল আপনা আপনিই কী যেন লিখে চলেছে কাগজের ওপরে।

দেবতনু ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'মৃদুল, এসব কী হচ্ছে রে? এমন তো কথা ছিল না। বলেছিলি জয়ন্তকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে স্রেফ একটু অ্যাক্টিং করতে হবে আমাদের সক্কলকে...যা ঘটছে তা তো আমরা কেউ ঘটাচ্ছি না...সত্যিই যে অলৌকিক ঘটনা ঘটছে এখানে। তুইই বা অমন অন্ধকারের মধ্যে একটাও কথা না বলে চুপ করে বসে আছিস কেন ভূতের মতন? আমার ভয় করছে মৃদুল...'

সুধন্য চিৎকার করে উঠল, 'মৃদুল ওঠ। জয়ন্ত, সুতনু, দেবতনু এক মুহূর্ত দেরি করিস না। চল পালা এখান থেকে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমার কানের কাছে মুখ এনে মানুদি ফিসফিস করে বলে উঠল, চলে যা এখান থেকে। এক্ষুনি চলে যা। নইলে খুব বিপদ...এ বাড়িতে অভিশাপ আছে। সেই অভিশাপের আঁচ গায়ে লাগলে তোরাও কেউ আর বেঁচে থাকতে পারবি না...'

'মানুদি?' শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলায় কোনোক্রমে বলে উঠি আমি, 'তা কী করে হবে? তুই ঠিক শুনেছিস তো?'

'ঠিকই শুনেছি। কোনো ভুল হয়নি আমার। এখানে সত্যি সত্যিই সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে। আমরা মজা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই মজা নেই আর। কিছুই আমাদের প্ল্যান মাফিক ঘটছে না আর...' বেদম ভয় পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সুধন্য।

সুতনুও ভয় পাওয়া গলায় আমাকে বলল, 'দেশলাইটা জ্বালা জয়ন্ত। মোমবাতি জ্বালা। কুইক...'

'নাআআআ', আর্তনাদের মতন আছড়ে পড়ল শব্দটা মৃদুলের মুখ থেকে, 'সাজেশনটা এখনও লেখা হয়নি বিমলদার...তাছাড়া...'

মৃদুলের কন্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল বোস বাড়ির বাইরে থেকে ভেসে আসা চিৎকারে। চিৎকারটা ক্রমশই বাড়ির ভিতরে ঢুকে এল। কে যেন আমাদের নাম ধরে তীব্র স্বরে ডেকে চলেছে প্রাণপনে। ডাকটা কাছে চলে এসেছে। আমাদের ঘরের দরজার বাইরেই টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ল। এতক্ষণ কেমন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মাথা কাজ করছিল না। আচম্বিতেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম। গলার আওয়াজটা চিনতে পারছি এইবার। মইনুল। আমাদের বন্ধু। আমাদের নাম ধরে একটানা ডেকেই চলেছে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। আমার পিছন পিছন অন্যরাও বাইরে বেরিয়ে এল হুড়মুড় করে।

মইনুল হাঁফাচ্ছিল। অসম্ভব উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল ওকে। আমাদের দেখে মইনুল দৌড়ে এল। উদবেগের সঙ্গে জিগ্যেস করল, 'ঠিক আছিস তোরা?'

'আছি'। মাথা নাড়লাম আমি, 'কিন্তু তোকে এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'বলছি আয়', বলে আমাদের পোড়ো বাড়িটার বাইরে এনে দাঁড় করাল মইনুল। তারপর ভেজা গলায় বলল, 'মৃদুলের খবর কিছু শুনেছিস?'

'মৃদুলের খবর?' অবাক হয়ে বলে দেবতনু, 'এই তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে মৃদুল', বলেই আমাদের দিকে তাকায় ও। আমরাও তাকাই নিজেদের দিকে। না মৃদুল আমাদের মধ্যে নেই।

'ও তাহলে সেই ঘর থেকে বেরোয়নি আমাদের সঙ্গে। নিশ্চিত বিপদে পড়েছে মৃদুল', বলে সুধন্য বাড়িটার দিকে পা বাড়ায়।

মইনুল টান দেয় ওর হাত ধরে। বিষন্ন গলায় বলে, 'কী যা তা বলছিস পাগলের মতন। আজ বিকেলেই বাইক অ্যাকসিডেন্টে...'

'বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, মৃদুলের? ইয়ার্কি মারছিস নাকি?' সুতনু বলে।

'খুবই কষ্টের। তবু এটাই বাস্তব', মাটির দিকে মুখ নামিয়ে বলে মইনুল, 'একটা ট্রাকের সঙ্গে, জয়শ্রী জুয়েলার্সের সামনে...মাথায় হেলমেট ছিল না। থাকলে হয়ত...সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে আমিও গিয়েছিলাম। ততক্ষনে সব শেষ। ওখানেই ছিলাম এতক্ষন। তোদেরও ফোন করেছিলাম। সকলেরই সুইচড অফ। পোস্টমর্টেমে রওনা করিয়ে দিয়ে এখানে এলাম...'

'কিন্তু সত্যিই মৃদুল আমাদেরই সঙ্গে ছিল। এই বাড়িতেই। বিশ্বাস কর মইনুল', আমি বলি। আমার গলা কাঁপছিল।

'না রে। ভুল হচ্ছে কোথাও'। আমার পিঠে হাত রাখে মইনুল।

পরিশিষ্ট

সব কথা শুনে আর একবার ওই বাড়িতে ঢুকতে রাজি হয়েছিল মইনুল। সেই নির্দিষ্ট ঘরে আবার এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই মিলে। সেই রাতেই। কিন্তু মৃদুল সত্যিই কোথাও ছিল না। বিমলদাও না। খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া হাল্কা হাওয়ায় ঘরের মেঝেয় ছড়ানো ছিটোনো সাদা কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে উড়ছিল। তারই মধ্যে একটায়, টর্চের আলোয় পেন্সিলে লেখা দুটো বাংলা বাক্য চোখে পড়ল, 'জীবনে ভালো কিছু করার শর্টকাট পদ্ধতি বলে কিছু নেই। জীবনের কোনো পরীক্ষাই কোনোদিন শুধুমাত্র সাজেশনের ওপরে নির্ভর করে দিবি না, এই আমার তোদের জন্যে দেওয়া লাস্ট মিনিট সাজেশন'।

হাতের লেখাটা যে বিমলদারই, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। আমরা তার হাতের লেখা চিনতাম। মইনুলও। তার যুক্তিবাদ এক্ষেত্রে আর খাটেনি।



টমটম বাবার পাঠশালা



রাস্তাটা ঢালু হয়ে গড়িয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। হাঁটতে তাই একটুও অসুবিধা হচ্ছিল না। রাস্তার একদিকে পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো গা। সেই অমসৃণ গা জড়িয়ে আছে নানা রকম গাছপালার জঙ্গল। কিছু গাছ মস্ত বড়, কিছু গাছ আবার লতানো। অন্য গাছের গা জড়িয়ে ধরে ওপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তারা। মাঝে মাঝেই মেঘ এসে গাছেদের গা জড়িয়ে ধরে এখানে। সবুজ পাতাগুলোকে আদর করে, চুমু খায়। তারপর কখনও অন্য কোথাও, অন্য কোনো গাছ বা পাহাড়ের কাছে উড়ে যায়, অথবা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে টুপটাপ ঝর ঝর শব্দে। এখানে না এলে কখনও জানাই হত না হয়তো দীপ্তর, গাছের পাতা কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের সবুজ হতে পারে। তাছাড়া ভিজে ভিজে পাহাড় আর পাহাড়ের গা বোঝাই অরণ্যের যে একটা নিজস্ব গন্ধ আছে দীপ্ত আগে তা জানতই না। এখানে এসে জেনেছে। এমনকী বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের যে ঝকঝকে নীল রং তাও নিজের বাড়িতে থাকলে দেখা যায় না কখনও।

ছোট মেসো ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। কয়েক বছর অন্তর অন্তর বদলি হয়ে যেতে হয় তাঁকে। আগে কিছুদিন মেদিনীপুরে ছিলেন, তার আগে কলকাতাতেই, এখন শিলং। এখানে আসার পর থেকেই দীপ্তদের বার বার বলছেন তিনি ওখানে ঘুরে আসার জন্যে। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া...বাবার অফিস, মায়ের স্কুল, দীপ্তর নিজের স্কুল সব সামলে ছুটি বের করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। অবশেষে মেসো এখানে আসার প্রায় দেড় বছর পরে এবারে গ্রীষ্মের ছুটিতে শিলং বেড়াতে এসেছে দীপ্তরা।

মেসো যে বাড়িটায় থাকেন সেটা মূল শহরের বাইরে। টিনের চাল বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটা ছবির মতন সুন্দর। বড় বড় পর্দা দেওয়া কাচের জানালা, সামনে ছোট্ট বাগান। সেই বাগানে এসে দাঁড়ালেই দূরের পাহাড়গুলো হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। অনেকখানি জায়গা ছেড়ে ছেড়ে বেশ কিছু ছোট-ছোট বাড়ি আছে এখানে পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে। সেসব বাড়ির কয়েকটায় মানুষ আছে। আবার কিছু বাড়ি এক্কেবারে ফাঁকা পড়ে আছে। মেসো বলছিলেন এটা একসময় একটা বাঙালি কলোনি ছিল। এখন তাদের অনেকেই চলে গেছে। এলাকাটার পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি এখনও একইরকম সৌন্দর্য বিছিয়ে রেখেছে চারদিকে। এখানকার পাহাড়, আকাশ, মেঘ, রৌদ্র সবাই মিলে এমন আকুল আমন্ত্রণ জানায় সব্বাইকে যে এ জায়গাটাকে ভালো না বেসে আর উপায়ই থাকে না কারো। দীপ্তরও জায়গাটা ভালো লেগে গেছে খুব। সেই যে দিন প্রথম এল সেদিন থেকেই।

এখানে এসেই মা বলে দিয়েছিলেন, 'শোনো, অচেনা জায়গা, আমাদের সঙ্গে ছাড়া এক পাও ফেলবে না কোথাও।' কিন্তু মাসি-মেসো দুজনেই উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কথা। মাসি হেসে বলছিলেন, 'তুই কী রে দিদি, ছেলেটাকে বড় হতে দিবি না নাকি...এখানে কী হবে একলা বেরোলে। গাড়ি ঘোড়ার ভয় নেই, হারিয়ে যাবার ভয় নেই। ক'টা দিনের জন্যে এসেছে ঘুরুক না একটু নিজের মতন'। ভাগ্যিস বলেছিলেন মাসি কথাটা। তা নাহলে এমন করে ইচ্ছে মতন কিছুতেই ঘুরে বেড়াতে পারত না দীপ্ত।

মাসির মেয়ে রুচিরা দীপ্তর চেয়ে দু-বছরের ছোট। কিন্তু দীপ্তকে দাদা হিসেবে একেবারেই পাত্তা দেয় না সে। তাছাড়া দীপ্ত সঙ্গে করে একটা ম্যাগনেটিক চেস এনেছিল কলকাতা থেকে আসার সময়। সেটা দীপ্তর খুবই প্রিয়। রুচিরা বায়না করে আজ মায়ের কাছ থেকে ওটা বাগিয়ে নিয়েছে। দীপ্ত ওটা দিতে চাইছিল না একেবারেই। কিন্তু মা ওর কথা শোনা তো দূরের কথা উলটে বকা দিলেন ওকে। দীপ্ত তবুও হয়ত এতটা রেগে যেত না, কিন্তু দাবাটা নিজের হাতে নিয়ে ওর দিকে চেয়ে এমন বিচ্ছিরি করে হাসল রুচিরা যে তখন থেকে মাথায় যেন একেবারে আগুন জ্বলে আছে দীপ্তর। দীপ্তর মনে হচ্ছিল রুচিরা অনেকটা যেন ওর ক্লাশের রুদ্রর মতন। বিশ্বের হিংসুক। পরীক্ষার সময় কাউকে হেল্প করে না।

একদিন বাংলার রমাপদ স্যারের ক্লাশে পড়া করে যায়নি দীপ্ত, স্যার ক্লাশে আসামাত্র এ কথাটা তাঁকে বলে দিয়ে ওকে মার খাইয়েছিল রুদ্র। পরে একসময় সে অবশ্য সরি বলেছিল দীপ্তকে; কিন্তু দীপ্ত ব্যাপারটা মনে রেখে দিয়েছে। সময় সুযোগ মতন রুদ্রকেও ঠিক একদিন মার খাওয়াবে ও। এটা বলতে গেলে ওর একটা প্রতিজ্ঞা। তেমন বাড়ি ফেরার আগে রুচিরাকে অন্তত একটা শিক্ষা দেবেই দেবে এটা সে আজ মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।

আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এই কথাটাই ভাবছিল ও। নানা প্ল্যান করছিল কী ভাবে মেয়েটাকে প্যাঁচে ফেলে দেওয়া যায়। ও যেমন দীপ্তর চেস নিয়ে নিয়েছে তেমন ওর খুব প্রিয় জুল ভার্ন এর গল্পের বই এর পুরো সেটটা মাসিকে বলে হাতিয়ে নেবে ও? কিন্তু এটা ঠিক পছন্দসই হল না। কলকাতায় বইগুলো পাওয়া যাবেই, শুধুমুধু এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মানে নিজেরই কষ্ট। তাহলে কি বাড়ির সামনে ওর প্রিয় ফুলগাছটা ভেঙে দিয়ে যাবে বাড়ি ফেরার আগে? কিন্তু তাতে মাসি আর মেসোও তো কষ্ট পেতে পারেন। জুতসই কোনো প্ল্যানই যেন মাথায় আসতে চাইছে না।

হঠাৎ শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়ার স্রোতটা গায়ে এসে লাগতেই সম্বিৎ ফিরল দীপ্তর। এই রে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এত দূরে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি এতক্ষণ। ঢালু গড়ানো সহজ পথে আনমনে দিব্বি হেঁটে গেছে সে এতক্ষণ। তাছাড়া চার্চের পাশে যেখানে রাস্তা দু-ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে, সেখানে ভুল করে যে পথে যাওয়ার কথা তার উল্টো পথে চলে এসেছে সে নিজের অজান্তেই। গা ছম ছম করে উঠল দীপ্তর। এ দিকটা নির্জন, জনমনিষ্যিহীন। তাছাড়া এ দিকটা নাকি ভালো নয়। প্রথম যে দিন একা বিকেলে বাইরে বেরোল সেইদিনেই মেসো বার বার বলে দিয়েছেন এদিকে না আসতে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিছিয়ে থাকা জঙ্গল এদিকে অনেক বেশি ঘন। পাহাড়ের গা দেখাই যায় না প্রায়। বড় বড় গাছ তো আছেই এ ছাড়াও নানারকম লতা-গুল্মে পাহাড়ের সবুজ আরো যেন বেশি গাঢ় মনে হচ্ছে এখন।

পেঁজা তুলোর মতন মেঘ এসে দীপ্তকে জড়িয়ে ধরল এই সময়ে। সামনের নীচু হয়ে যাওয়া রাস্তাটা চোখের সামনে থেকে আবছা হয়ে মুছে গেল। মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। ইশ, বাড়ি থেকে বের হবার সময় আকাশ ঝকঝকে ছিল দেখে ছাতা রেনকোট কিছুই সঙ্গে নেয়নি দীপ্ত। এক্ষুনি যদি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে কোথায় দাঁড়াবে সে? পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে বড়সড় গাছ দেখে তার নীচে গিয়ে দাঁড়াবে

যে তারও জো নেই। এ দিকের জঙ্গলে নাকি জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। চিতা-টিতাও থাকতে পারে। এখন মনে হল খানিক আগে পথের পাশে একটা বোর্ডে যেন বাঘের ছবি দিয়ে তেমন কথাই লেখা ছিল...গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দীপ্তর, আর তখনি টুপটাপ টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দীপ্ত থমকে দাঁড়ালো একটু। তারপর পিছু ফিরল। ভাবল জোরে দৌড় লাগাই। তেড়েফুঁড়ে বৃষ্টি নামার আগেই যে ভাবে হোক বাড়ি পৌঁছতে হবে। এখন জলে ভিজলে আর রক্ষে নেই। এমনিতেই বারোমাস ঠান্ডা লাগার ধাত তার।

বুক ভরে দম নিয়ে দৌড় শুরু করতে গেল দীপ্ত, আর ঠিক তখনি খিক খিক খিক খিক করে চাপা হাসির শব্দটা কানে এল তার। ছুটতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপ্ত। এমন নির্জন জায়গায় অমন কুৎসিত ভাবে হাসে কে... শব্দ অনুসরণ করে ডান দিকে তাকায় সে, আর তখনই ছেলেটাকে চোখে পড়ে তার। হাল্কা নীল ট্রাউজার আর ফুলস্লিভ সাদা জামা পরা ছেলেটা রাস্তার পাশে খানিক তফাতে যেদিকে পাহাড়ি রাস্তার গা গড়িয়ে ঢালু খাদটা নেমে গেছে নীচের দিকে, সেইখানে দাঁড়িয়ে চোখ মটকে হাসছিল দীপ্তর দিকে চেয়ে।

ছেলেটাকে দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল দীপ্ত। বলা নেই কওয়া নেই দুম করে ভোজবাজীর মতন ছেলেটা কোত্থেকে এসে হাজির হল এখানে! পরক্ষণেই ছেলেটার ওপরে রাগ হয়ে গেল তার। রুচিরার ওপরে জমে থাকা রাগটা প্রায় অকারণেই গিয়ে পড়ল এই অচেনা ছেলেটার ওপর। মনে হল এক ঠেলা মেরে ফেলে দিই ওকে ঢালু খাদের দিকে। মজা বুঝবে তখন। শুধুমুধু বোকার মতন ওর দিকে তাকিয়ে অমন টিটকিরি মারা হাসি তখন বেরিয়ে যাবে। এই ভেবে কটমট করে ওর দিকে তাকাতেই ছেলেটা ক্যামন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখটা মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল তার। তার এই থতমত ভাবটা বেশ উপভোগ করল দীপ্ত। তারপর তার দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে গলাটা যথাসম্ভব ভারি করার চেষ্টা করে বলে উঠল, 'আমায় দেখে খামোকা অমন বিচ্ছিরি করে হাসছিলে ক্যানো?' বলেই মনে হল তার ব্যাপারটা বোকামি হয়ে গেল। এখানকার ছেলে বাংলা বুঝবে না তো। তার হিন্দি বলা উচিৎ ছিল। কিন্তু হিন্দিতে কথাটা গুছিয়ে নিতে যে টুকু সময় লাগে তার মধ্যেই বেশ স্পষ্ট আর ঝরঝরে বাংলাতেই কাঁচুমাচু মুখে ছেলেটা বলে উঠল, 'আমি তো এমনিই হাসছিলাম, তোমার কাণ্ড দেখে। হাসিটা তোমার বিচ্ছিরি লাগবে আমি বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস কর...'

ছেলেটার কথায় আরো রাগ হয়ে গেল দীপ্তর। কঠিন মুখে সে বলল, 'আমি বাঁদর না হনুমান...আর কী এমন কাণ্ড আমি করলাম যে তোমার অমন হাসি পেয়ে গেল আমায় দেখে। আমি জানি তুমি আমায় দেখে ইচ্ছে করে আমায় প্যাঁক মারার জন্যেই হেসেছ। এখন মনে হচ্ছে এটা এ জায়গাটারই দোষ। এখানকার সব ছেলে-মেয়েই বোধহয় এই রকম। ছিটেল আর অসভ্য...'

'ওরেবাবা, এখানকার আর কে তোমার সঙ্গে এমন করল?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'কে আবার, রুচিরা', ঠোঁট উলটে বলল দীপ্ত।

ছেলেটার মুখে একটা মৃদু হাসি ফিরে এল আবার। খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করল সে, 'রুচিরা কে?'

'আমার বোন'। দীপ্ত গম্ভীর হয়েই উত্তর দিল।

'ওর ওপরে তোমার খুব রাগ দেখছি...'

'হবে না, সবসময় আমার পিছনে পড়ে আছে। আমায় তো দাদা বলে মানেই না...'

'এটা সত্যিই অন্যায় ওর'। ছেলেটা মাথা নাড়ে।

'অন্যায় নয় বলো...'

'একশবার অন্যায়'। বলে দীপ্তর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা। ছেলেটা হঠাৎ তার পক্ষ নিয়ে নেওয়ায় ওর ওপরে জমে ওঠা রাগটা খানিক হাল্কা হয়ে গেল দীপ্তর। অনেকটা স্বাভাবিক গলায় সে বলল, 'ঠিক আছে আমাকে আর ভয় পাবার দরকার নেই। এক্ষুনি তোমাকে একটা শাস্তি দেবার কথা ভেবেছিলাম, আপাতত সেটা মুলতুবি করে দিলাম...'

'কিন্তু আমি তো তোমায় ভয় পাইনি একটুও', দীপ্তকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠে ছেলেটা।

'তুমি মিথ্যে বলছ। আমি দেখলাম তুমি ভয়ে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে ছিলে আমি ধমকে ওঠার পর'। দীপ্ত প্রতিবাদ করে ওঠে।

'আমি মিথ্যে বলি না। ভয়ও পাই না। আমাদের ভয় পাওয়াও মানা, মিথ্যে বলাও মানা। আমি ভয় পেয়েছি শুনলে বা মিথ্যে বলেছি জানলে টমটমবাবা খুব কষ্ট পাবেন মনে মনে। তিনি বলেন যারা অপরাধ করে তারাই মিথ্যে দিয়ে নিজেদের আড়াল করে আর অযথা ভয় পায়। যারা সঠিক পথে চলে আর যাদের নিজেদের ওপরে বিশ্বাস আছে তারা ভয় পায় না, তারা মিথ্যেও বলে না...' বলতে বলতেই খপ করে দীপ্তর ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতে চেপে ধরে ছেলেটা তারপর আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে একবার তাকিয়ে নিয়েই দীপ্তর হাত ধরে টান দেয়, 'এক্ষুনি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। জোর পশলা হবে একখানা। জোরে বৃষ্টি নামার আগেই আমাদের পাঠশালায় পৌঁছোতে হবে'।

'পাঠশালা...!' অবাক হয়ে বলে দীপ্ত, 'এখানে এই নির্জন পাহাড়ি জংলা পথে পাঠশালা কোত্থেকে আসবে ?'

'টমটমবাবার পাঠশালা...' বলেই দীপ্তর হাত ধরে দ্রুত পাহাড়ের গা দিয়ে চলা পিচের বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে একটা পাকদন্ডী পথে চলতে শুরু করে সে। দীপ্ত বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় এবার। ছেলেটাকে চেনে না সে। এই অচেনা জায়গায় কোন অজানা পাকদন্ডী পথে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। না জেনে কোনো বিপদে পড়তে চলেছে নাকি সে...

ছেলেটা যেন দীপ্তর মনের কথাটা নিজে থেকেই পড়ে ফেলল। দীপ্ত কিছু বলার আগেই সে দীপ্তর হাতে একটা আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'ভয় পেও না। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমি তো আছি, আর টমটমবাবা আছেন...'

'আমি বাড়ি যাব'। তার কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না দীপ্ত।

'বাড়ি গিয়ে পৌঁছনোর আগেই তুমি ভিজে চুপ্পুস হয়ে যাবে। আর বৃষ্টিতে ভিজলেই তো তোমার আবার হাজারটা হ্যাঁচ্চো...' ছেলেটা চলতে চলতেই বলে উঠল হাসতে হাসতে।

ও কী করে জানল যে বৃষ্টিতে ভিজলে সহজেই ঠান্ডা লেগে যায় দীপ্তর, আর একবার ঠান্ডা লাগলেই হাঁচির চোটে একশা হয়ে যায় সে। ছেলেটার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিল সে। পাহাড়ের গাছগাছালি ঝোপ জঙ্গল ঠেলে দীপ্তর হাত ধরে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে এখন সে। দীপ্তর বেশ কষ্ট হচ্ছে। হাঁফ ধরে যাচ্ছে। ছেলেটা নির্বিকার। ওকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে দীপ্তর। দীপ্তকে অবাক করে দিয়ে ঠিক তখনি বলে উঠল ছেলেটা, 'ওপরে উঠতে কষ্ট হচ্ছে তোমার, হাঁফিয়ে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ'। ছোট্ট উত্তর দেয় দীপ্ত, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে না?'

'উঁহু', ছেলেটা আবার মিষ্টি করে হাসে, 'আগে হতো। টমটমবাবা তখন বলতেন মনে রাখিস রবিন উঁচুতে ওঠা সবসময় কঠিন। কিন্তু তাই বলে ওপরে ওঠার চেষ্টাটা কখনও ছাড়বি না...'

'তোমার নাম তাহলে রবিন?'

'হ্যাঁ'।

'আমার নাম দীপ্ত। বন্ধুরা আমায় দীপ বলে ডাকে', বলে একটু থামে দীপ্ত। তারপর বলে, 'তুমি যে বারবার টমটম বাবার কথা বলছ উনি কে? আর ওনার পাঠশালাটাই বা কোথায়?'

এতক্ষণে স্বাভাবিক উচ্ছলতায় হই হই করে হেসে ওঠে রবিন। চোখ চকচক করে ওঠে তার, 'টমটমবাবা হলেন গিয়ে আমাদের ফাদার টমসন। এই অঞ্চলের আশপাশের গাঁয়ের-গরীব গুরবো ছেলে-মেয়েদের জন্যে শিক্ষাদানের জন্যে স্কুল খুলেছিলেন তিনি। তাদের খাওয়া পরা চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানকার মানুষ খুবই ভালোবাসে তাঁকে। নির্ভর করে তাঁর কথায়। আদর করে তাঁকে ডাকেন টমটমবাবা বলে। আর তাঁর স্কুলকে বলে টমটমবাবার পাঠশালা...' বলতে বলতেই একজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রবিন। ডান হাতটা সামনে উঁচু করে বলে এই যে এসে গেছি...'

গাছ পাতার ফাঁকে বেড়া দিয়ে ঘেরা টিনের চালের অনাড়ম্বর ঘরগুলো এবারে চোখে পড়ে দীপ্তর। দমকা হাওয়ায় গাছের ডালে দোলা লেগেছে তখন। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়তে শুরু করেছে। রবিন বলল, 'দৌড়ও...'

পায়ের নীচের স্যাঁতসেতে জমা পাতা মাড়িয়ে হরজাই গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছুট লাগালো দীপ্ত। রবিনের হাত ছাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিল রবিন, 'দীপু, দাঁড়াও। হাত ছেড়ো না আমার। আমার হাত ছেড়ে দিলে তুমি পাঠশালাটাকে খুঁজেই পাবে না আর...'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপ্ত। রবিনের কথাটা বুঝতে পারল না সে ঠিকঠাক। রবিন দ্রুত এগিয়ে এসে আবার তার ডান হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে ভরে নিল। তারপর দীপ্তর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ছুট্টে চলে এল নিরিবিলি স্কুল বাড়িটার মরচে ধরা লোহার নীচু গেটের সামনে।

ঘটাং করে গেটের মাথায় লাগানো অর্ধবৃত্তাকার লোহার হুড়কোটা খুলে যেই দীপ্তকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন, অমনি কোত্থেকে পেল্লায় একটা কুকুর দৌড়ে এল। তারপর দীপ্তর দিকে চেয়ে ভয়ানক

চিৎকার করতে লাগল হিংস্র ভঙ্গীতে। কুকুরটা এত বড় আর এমনই ভয়ংকর যে দীপ্ত মারাত্মক ভয় পেয়ে গেল। আড়চোখে একবার দীপ্তর দিকে তাকিয়ে নিয়েই চাপা গলায় কুকুরটাকে ধমকে উঠল রবিন, 'আহ টাইগার, ওকি অসভ্যতা, দীপু আমার বন্ধু...' কুকুরটা রবিনের দিকে একপলক তাকিয়ে দীপ্তর সামনে থেকে সরে গিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে বিচ্ছিরি গররর গররর করে আওয়াজ করতে লাগল। রবিন দীপ্তর হাত ধরে টেনে আরো একটু এগিয়ে বাঁ দিকের লম্বা বাড়িটার বারান্দায় উঠল আর তখনই জোরে বৃষ্টিটা নেমে পড়ল হুড়মুড় করে। টাইগার নামে কুকুরটাও একলাফে বারান্দায় উঠে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে সামনের পা দুখানার ওপরে মাথা রেখে রাগী-রাগী চোখে তাকিয়ে রইল দীপ্তর দিকে। ওর চোখের দিকে তাকাতে ভয় করছিল দীপ্তর। রবিনকে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল ও, 'কুকুরটা আমায় একেবারেই পছন্দ করছে না রবিন...'

'হুঁ'। প্রতিবাদ করল না রবিন দীপ্তর কথায়।

'কামড়ে দেবে না তো?'

'না'।

'তুমি অমন নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'আমি জানি'।

'কী করে জানলে?'

'এখানে এই পাঠশালায় আমরা যারা থাকি তারা অন্যকে আঘাত করি না, কষ্ট দিই না, হিংসা করি না...ফাদার টমসন আমাদের এসব ভুলিয়ে দিয়েছেন...' বলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল রবিন উদাস চোখে।

'তাহলে আমার দিকে অমন রাগী চোখে তাকিয়ে আছে ক্যানো কুকুরটা?'

রবিন হাসল, 'তোমার শরীর থেকে যে অরা বেরিয়ে আসছে সেটা ও মেনে নিতে পারছে না দীপু...'

'মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে দীপ্ত।

'আমাদের সকলেরই শরীর আসলে নানা রকম তরঙ্গ দিয়ে তৈরি জানো তো, আমাদের মনের গতিপ্রকৃতি সেই তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে অনেকসময়...'

'আমি তবুও বুঝতে পারছি না রবিন', অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে দীপ্ত।

একটা চাপা হাসির শব্দে দু'জনেই চমকে তাকায়। বৃষ্টি থেমেছে। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে তাদের খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ। কখন যে এলেন তিনি বুঝতেই পারেনি দীপ্ত। এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে মনটাই যেন ভালো হয়ে গেল। তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। ফর্সা মুখে হাল্কা সাদা দাড়ি গোঁফ। পরনে সাদা আলখাল্লা, গলায় রুপোর তৈরি পবিত্র ক্রুশ। তিনি দীপ্ত আর রবিনের দিকে চেয়ে ভারি মিষ্টি করে হাসলেন। সে হাসি এত সুন্দর যে মুগ্ধ না হয়ে পারাই যায় না। দীপ্ত নিজের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলল তাঁকে। রবিন মাথা নীচু করে প্রণাম জানাল তাঁকে।

তারপর দীপ্তর দিকে ফিরে বলল, 'দীপু ইনিই ফাদার টমসন। এঁর কথাই বলছিলাম তোমায়'। ফাদার দীপ্তর দিকে চেয়ে হাসলেন। তোমার নাম দীপু?'

'হ্যাঁ, এটা আমার ডাকনাম। আসলে আমার নাম দীপ্ত...'

'আমারও একটা নিকনেম আছে জানো তো', ফাদার দীপ্তর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিলেন, 'এখানকার বেশিরভাগ মানুষ আমায় টমটমবাবা বলে ডাকে। তুমিও আমাকে তাই বলেই ডাকতে পারো, অবশ্য নামটা যদি তোমার খুব অপছন্দ না হয়...'

দীপ্তর মানুষটাকে দেখে এমনিতেই শ্রদ্ধা জাগছিল মনে। এবারে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার জন্যে নীচু হল তাঁর সামনে। টমটমবাবা ওর হাতদুটো ধরে ফেললেন, 'ডোন্ট টাচ মাই ফিট...'

'ক্যানো টমটমবাবা?'

'তোমার মধ্যে যিনি আছেন আমি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁকে আমি প্রণামও করি মনে মনে...' বলেই প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন তিনি। রবিনের দিকে ফিরে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিয়ে তোমাদের কথা হচ্ছিল রবিন...'

রবিন তাঁর কথায় একটু লজ্জা পেয়ে গেল। মাথা নামিয়ে নীচু গলায় সে বলতে লাগল, 'দীপুর মনের মধ্যে হিংসা আর আত্মাভিমানের তরঙ্গ দেখতে পেয়ে টাইগার ওর ওপরে রেগে যাচ্ছে। আমি ওকে এ বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করছিলাম ফাদার...'

দীপ্ত মনে মনে ভয়ানক চমকে উঠল এ কথাটা শুনে। কুকুরটা সত্যি সত্যি ওর মনটাকে পড়তে পারে, নাকি এমনি এমনিই। এ বিষয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে যায় দীপ্ত। ওদের থেকে পনের বিশ ফুট দূরে ঘাসের ওপর দিয়ে সর সর করে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসা সাপটা নজরে পড়ে যায় ওর। সাপটা বেশ বড়। ধূসর কালো রঙ। নিশ্চিত বিষধর হবে ওটা। দীপ্ত ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'টমটমবাবাআআআ'—

দীপ্তর চিৎকারে ফাদার টমসন সাপটার দিকে তাকালেন। রবিনও। কিন্তু তাদের কারো চোখেই উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। সাপটা আরো এগিয়ে এসেছে এখন। দীপ্তর থেকে মাত্র হাত পাঁচ-ছয় তফাতে। দীপ্ত একটু নড়তেই লেজের ওপরে ভর দিয়ে পুরো শরীরটাকেই সোজা করে উঠে দাঁড়াল সে মস্ত ফনা তুলে। দীপ্তর দিকে চেয়েই ধীরে দুলতে লাগল ডান দিক, বাঁদিক। ভয়ে জিভ শুকিয়ে গেছে এখন দীপ্তর। গলা শুকিয়ে কাঠ। পা দুটো থির থির করে কাঁপছে। পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। রবিন চাপা গলায় বলল, 'ভয় পেয়ো না'। কিন্তু মনে একটুও ভরসা এল না দীপ্তর। টমটমবাবা হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দুদিকে দোলাতে লাগলেন আর খুব নরম গলায় বলতে লাগলেন, 'নো, নো মাই চাইল্ড...তুমি জঙ্গলে ফিরে যাও, তুমি জঙ্গলে ফিরে যাও...' আর কী আশ্চর্য, সাপটা একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকেই ফনা নামিয়ে নিল। তারপর অত্যন্ত বাধ্য ভঙ্গীতে পিছু ফিরে যেমনি এসেছিল ঠিক তেমনই শুকনো পাতায় সর সর আওয়াজ তুলে আবার গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল। দীপ্ত বড় বড় চোখ করে তাকালো টমটমবাবার দিকে, 'আপনি কি ম্যাজিক জানেন?'

'উঁহু', ফাদার টমসন হাসলেন, 'এটা কোনো অলৌকিক ঘটনা নয় দীপু, ম্যাজিকও নয়।'

'তবে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করে দীপ্ত।

'এটা জীবন চর্চার এক বিশেষ অনুশীলন...'

'কীরকম?'

'মাই সান', ফাদার দীপ্তর মাথায় হাত রাখলেন, 'তুমি যদি মনের মধ্যে লোভ আর হিংসা জমিয়ে রাখো তাহলে প্রকৃতি ও তার আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুই আরো আরো বেশি লোভী আর হিংসুটে হয়ে গিলে ফেলতে আসবে তোমায় সারা জীবন জুড়ে। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি মন থেকে হিংসার ভাবটা সরিয়ে ফেলতে পারো, দেখবে এই পৃথিবীটা সত্যিই কত স্নিগ্ধ, কত সুন্দর আর কত বিপদবিহীন...'

'তাই বলে সাপের মতন বিচ্ছিরি আর বিপজ্জনক প্রাণীও...'

'ওকে ক্যানো তুমি মিছিমিছি বদনাম করছ, ও তো আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো সময় হিংস্রতা দেখায় না, অথচ আমরা যারা সভ্য মানুষ বলে দাবি করি তারা ভেবে দেখ আরো কত বেশি হিংস্র হয়ে উঠি মাঝে মাঝে অকারণ...'

কথাটা মিথ্যে নয়। দীপ্ত মাথা নামিয়ে ফেলে। ফাদার টমসন বলে চলেন, 'অহিংসা আর ভালোবাসা দিয়ে সব জিতে নেওয়া যায়। তুমি যদি ভালোবাসো অন্যেরাও একদিন ঠিক বাধ্য হয়ে যাবে তোমার। আমি এই কথাগুলো শেখাবার জন্যেই এখানে কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি জানো...আমার এখানে থাকতে কষ্ট হয়, রবিনেরও। বাকিরা তো চলেই গেছে এই কষ্ট সইতে পারবে না সেই ভয়ে...'

'কোথায় টমটমবাবা?' দীপ্ত জিগ্যেস করে।

'অনেক দূরে। আসলে এখানকার কাজ আমাদের শেষ। আমাদের ফিরে যাবার কথা। অথচ আমি ফিরতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছে কাজ বাকি রয়ে গেল, বাকি রয়ে গেল। মানুষকে ভালোবাসা শেখানোর যে ব্রত নিয়ে এখানে এসেছিলাম তা কিছুতেই শেষ করতে পারছি না...একের পর এক হিংসুটে মানুষ, লোভী মানুষ, অসৎ মানুষ, মিথ্যুক মানুষ স্রোতের মতন আসতে থাকে, আসতেই থাকে। আর আমারও কিছুতেই এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া হয় না আর। ফিরে আসতে হয়...' বলতে বলতে বেদনায় ভারি হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর। দীপ্তর বুকের মধ্যে গিয়েও সেই যন্ত্রণার ঢেউ ধাক্কা মারে। মনের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে তার। ফাদারের জন্যে চোখে জল গড়িয়ে আসে। তাঁর হাতদুটো নিজের হাতে চেপে ধরে সে ভেজা গলায় বলে ওঠে, 'আমি আপনার কথা মনে রাখব টমটমবাবা। কক্ষনও ভুলে যাব না'।

'ঠিক বলছ?'

'ঠিক বলছি। আমি রুচিরার ওপরে আর কখনও রাগ করে থাকব না। ওকে আমার সব ভালো খেলনা দিয়ে দিতে হলেও মন খারাপ করব না। স্কুলের বন্ধুদের সবসময় সাহায্য করব...'

'ওদের আমার কথা বোলো। বোলো ছোটরা হিংসুটি হলে টমটমবাবার আর ফিরে যাওয়া হবে না কোনোদিন...এমনি করেই কষ্ট পেতে হবে তাঁকে মনে মনে...'

'বলব। আর কাল রুচিরাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। ও খুব ভালো মেয়ে। খুব বুদ্ধি ওর। ও আপনার সব কথা আরো ভালোভাবে বুঝবে। আমি তো বোকা। আমি সব বুঝি না...'

'কে বলে তুমি বোকা?' আবার ওর মাথায় হাত রাখেন ফাদার টমসন।

'আমার মা বলেন, রুচিরাও বলে...'

'তুমি খুব ভালো ছেলে দীপ্ত। তোমায় আমার খুব ভালো লেগেছে। তাই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম আমি তোমার স্থান আর তোমার কালকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে...'

'মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে দীপ্ত।

'এখানে একটা নির্দিষ্ট কালখন্ডকে জোর করে ধরে রেখেছি আমরা। সময় এখান থেকে নড়তে পারে না কিছুতেই।'

টমটমবাবার কথার মানে বুঝতে পারল না দীপ্ত। বলল, 'কাল আবার আমি আসব এখানে টমটমবাবা।'

টমটমবাবা হাসলেন। তার কথার উত্তর দিলেন না। রবিনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে এই সময়ের বেড়াটুকু পার করে দিয়ে এস রবিন। এরপরে সত্যিই দেরি হয়ে যেতে পারে দীপ্তর।

২

বাড়ি ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গেল দীপ্তর। মা-মাসি দু'জনেই দুশ্চিন্তা করছিলেন। মেসো বাড়ি ফিরে এসেছেন আজ তাড়াতাড়ি। দীপ্ত গেটের লোহার দরজা ঠেলে উঠোন মাড়িয়ে ঘরে ঢুকতেই হাল্কা গলায় বলে উঠলেন, 'এই তো এসে গেছে দীপু। অহেতুক এত চিন্তা করো তোমরা... বললাম তো কোথায় আর হারাবে ছেলেটা এই ছোট্ট জায়গায়। গেছে হয়ত এদিক ওদিক। ঘুরে-টুরে দেখছে আশপাশটা...' রুচিরা মুখ টিপে একটু হেসে যোগ করল, 'দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই মাসি এমন করতে শুরু করল যে আমার মনে হল ও বোধহয় নুনের পুঁটুলি, গায়ে জল লাগলে গলে যাবে একেবারে...'

মাথাটা দুম করে গরম হয়ে যাচ্ছিল দীপ্তর। ঝট করে সামলে নিল সে নিজেকে। টমটমবাবাকে সে কথা দিয়েছে রাগ, হিংসা, লোভ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করবে। কাজেই রুচিরার কথাটাকে আমলই দিল না দীপ্ত। বরং পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে রুচিরার দিকে এগিয়ে দিল সে, 'এই নে। ফেরার সময় কিনলাম। আমার একটা আর একটা তোর। ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল। অনেকটা হেঁটে ফেলেছি আজ। আসলে অন্যদিন যে দিকে যাই আজ অন্যমনস্ক হয়ে একেবারে উল্টোপথে চলে গিয়ে...'

'উল্টোপথ মানে, কোন দিকে গিয়েছিলি তুই?' মাসি জিগ্যেস করলেন।

'গির্জার দিকে। তারপর ওখানে পথটা যেখানে দু-ভাগ হয়ে দু-দিকে চলে গেছে সেখানে গিয়ে ভুল করে আমি বাঁ হাতি পথটা ধরে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম...'

'মাই গড', মেসোর গলায় এই প্রথম উদবেগ টের পেল দীপ্ত, 'ওদিকে যেতে আমি বারণ করেছিলাম যে...'

'আমি ইচ্ছে করে না, অন্যমনস্ক হয়ে চলে গিয়েছিলাম। অনেক্ষণ পরে যখন খেয়াল হল তখন পাহাড়ি ঢালু পথে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি আমি। আমার তখন ভয় লাগছিল। তাড়াতাড়ি যে বাড়ি আসব সেও হল না, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। ভাগ্যিস সে সময় রবিনের সাথে দেখা হল...'

'কে?' মাসি তার মুখের কথা কেড়ে নিলেন।

'রবিন', আবার বলে দীপ্ত, 'ও আমায় টমটমবাবার পাঠশালায় নিয়ে গিয়ে তুলল। তা নাহলে বৃষ্টিতে ভিজতেই হতো আমায়...'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছিস তুই', মাসি চোখ গোল করে বললেন, 'কার কাছে শুনলি বলতো দেখি টমসন সাহেবের গপ্প?'

'কার কাছে আবার শুনব', খুব স্বাভাবিক গলায় বলে দীপ্ত, 'আমি যে নিজে সেখানে গেলাম, তাঁর সাথে দেখা হল, কথা হল। কী ভালো মানুষ...আমার এত ভালো লেগেছে...ভাবছি কাল আবার যাব ওখানে...'

'না, যাবে না', মাসি আঁতকে উঠে বললেন, 'একা আর বাইরে বেরিও না তুমি...'

দীপ্তর বাবা সব শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মেসো বললেন, 'জানি না দীপু আমাদের সাথে জোক করছে কিনা, কিন্তু ও যে কথাটা বলছে সেটা প্রায় অসম্ভব'।

'ক্যানো?' দীপাঞ্জন আবার জিগ্যেস করলেন।

'অনেকদিন আগে এদিকটা যখন বাঙালি কলোনি ছিল, গির্জার বাঁদিকের রাস্তা ধরে অনেকখানি পাহাড়ি পথ পেরিয়ে একটা মিশনারি স্কুল ছিল। ফাদার টমসন সেটি চালাতেন। পুরোন লোকেদের কাছে অনেক সুখ্যাতি শুনেছি তাঁর। গরীব-গুরবো মানুষজনকে সাহায্য করতেন তিনি দরাজ হাতে। বাচ্চাদের অসম্ভব ভালোবাসতেন। তাদের মরালিটি বাড়ানোর কাজে দিনরাত পড়ে থাকতেন নাকি মানুষটা। এখানকার বাঙালি ছেলেরা অনেকেই তাঁর স্কুলে পড়তে যেত। কলোনির লোকেরা স্কুলটার নাম দিয়েছিল টমটম বাবার পাঠশালা। সকালে স্কুলে গিয়ে সেখানেই সারাদিন পড়াশুনো, খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো সেরে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসত তারা। তাঁর সঙ্গে থাকত শুধু রবিন নামে একটি অনাথ ছেলে আর তাঁর পোষা কুকুর টাইগার...'

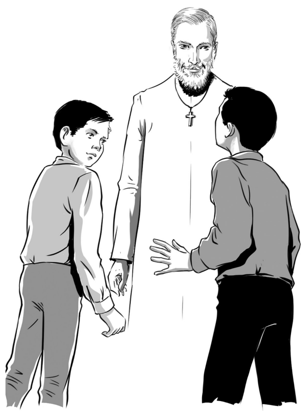
'তারপর?'

'একরাতে ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে স্কুলবাড়ি ধসে পড়ে। পাহাড়েও ধস নামে বিরাট জায়গা জুড়ে'।

'ইশ', দীপ্ত বলে ওঠে, 'আর টমটম বাবা, রবিন, টাইগার?' 'স্কুলবাড়ি চাপা পড়ে যায়। সকালে রেসকিউ পার্টির লোক তাদের মৃতদেহ সনাক্ত করে। ওইখানেই সমাধি দেওয়া হয় তাদের তিনজনকেই। পাশাপাশি। জায়গাটা এখন দুর্গম, জঙ্গলে মোড়া। বন্য জন্তু জানোয়ারও থাকতে পারে ওদিকে। এসে থেকে দেখেছি ওই দিকটা এখানকার মানুষ নানা কারণে এড়িয়ে যায়...' মেসো থামলেন। শ্বাস নিলেন বড় করে। দীপ্ত চুপ করে রইল। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে উঠছে। রবিনের জন্যে, টমটম বাবার জন্যে, এমনকী টাইগারের জন্যেও চোখে জল এসে যাচ্ছিল তার।

৩

ফিরে আসার দিন রুচিরাকে নিজের ড্রয়িং সেটটা দিয়ে দিল দীপ্ত। রুচিরা চায়নি, তবুও। দিয়ে মনে এত আনন্দ হল যে দীপ্ত নিজেই অবাক হয়ে গেল। কাউকে কিছু দিয়ে এত আনন্দ পাওয়া যায় আগে জানতেই পারেনি সে। এই আনন্দে রুদ্রকেও মনে মনে সে আজ ক্ষমা করে দিল। ফিরে গিয়ে যে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞাটা ছিল তা বাতিল করে দিল সে। দিয়ে কী অদ্ভুত, ভালোই লাগল তার। মাসি-মেসোকে প্রণাম করে চলে আসার সময় রুচিরা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। দীপ্ত দেখল ফাজিল মেয়েটার মুখটা আজ যেন অন্য রকম লাগছে। রুচিরার চোখ ছলছল করছিল। দীপ্তর হাত জড়িয়ে ধরে ভেজা গলায় সে বলল, 'তোকে খুব মিস করব দাদাভাই। তুই প্লিজ আমায় ফোন করিস মাঝে মাঝে। আর আমি জানি জুল ভার্ণ তোর খুব প্রিয়। আমার সেটটা পুরোন হয়ে গেছে না-হলে ওটাই তোকে দিয়ে দিতাম। তুই কিন্তু বইটা কিনিস না। বাবাকে বলেছি নেক্সট ভ্যাকেশনে তোদের বাড়িতেই যাব। তখন ওই বইটা আমি তোর জন্যে নিয়ে যাব। প্রমিস।



মাধো সর্দারের শেষ ডাকাতি



রঘুনাথগঞ্জের আশেপাশের দু-দশটা গ্রামে একসময় মাধো ডাকাতের নামেই থরথর করে কেঁপে উঠত মানুষজন। বাচ্চারা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতো তার নাম শুনলে। গেরস্থ বাড়িতে মাধো ডাকাতের চিঠি এসেছে শুনলে পুলিশ চৌকিতে পর্যন্ত থরহরি কম্প লেগে যেত। যেমনি ছিল তার ইয়া পেল্লাই দশাসই চেহারা, তেমনি শক্তি ছিল গায়ে। দশ বিশজন লেঠেলের সঙ্গে একাই মহড়া নিতে পারত মাধো সর্দার। মাধো ডাকাতের এক পূর্বপুরুষ দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ছিল একসময়। সেই রক্তই পেয়েছিল মাধো ডাকাত। তার হাতের লাঠি যখন ঘুরত, শুধু আওয়াজ শোনা যেত ভোমরার ডানার শব্দের মতন। দেখা যেত না কিচ্ছুটি। সেই লাঠির সামনে দাঁড়াবে এমন সাধ্য কার? বন্দুকের গুলি পর্যন্ত সেই ঘুরন্ত লাঠির গায়ে লেগে ঠিকরে চলে যেত দূরে। মাধোর গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারত না তারা। গভীর রাতে আরাধ্য দেবীর সামনে বলি দিয়ে যখন ডাকাতি করতে বেরতো মাধো ডাকাতের দল, রাস্তার কুকুরগুলো অব্দি ডাকতে ভুলে গিয়ে দু-পায়ের খাঁজে লেজ ঢুকিয়ে নিয়ে বশংবদ ভঙ্গীতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তার পাশে সরে গিয়ে।

এখন দিন বদলে গেছে। ডাকাতির সেই সৌন্দর্য এখন আর নেই। শক্তি আর সাহসের কদর কমে গেছে মানুষের মন থেকে। গঞ্জে বিদ্যুতের আলো এসে গেছে। বন জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গেছে অনেক। মানুষ বাড়িতে সোনা-দানা টাকা-পয়সা রেখেও দেয় না আর আগের মতন। ব্যাংক গজিয়ে উঠেছে পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া, মাধো সর্দারের শরীরে বয়েস থাবা বসিয়েছে। যৌবনের জৌলুস খসে গেছে গা থেকে। হাতের লাঠির গতি কমেছে। কমেছে চোখের দৃষ্টি আর গলার তেজও। মাথার চুল ফাঁকা হয়েছে, গায়ের মাংস ঢিলে হয়েছে। ডাকাতি ছেড়ে তার দলের সকলেই প্রায় অন্য কাজ কারবারে থিতু হয়েছে অনেক দিন। কিন্তু মনে একটা খচখচানি লেগেই ছিল মাধো সর্দারের। সে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি করার স্পর্ধা জানিয়েছে এক কালে। আজ দুম করে কাজ থেকে বসে পড়তে বড়ই ইজ্জতে লাগছিল তার। শেষ পর্যন্ত মাধোর শাকরেদ বৃন্দাবনই বিস্তর মাথা খাটিয়ে এই বুদ্ধিটা বের করল।

রাত গভীর হলে অভ্যাস মতন সপ্তায় একবার এখনও রঘুনাথগঞ্জের প্রান্তে যে জঙ্গল, তার মধ্যেই মজা নদীর ধারে পরিত্যক্ত ডাকাতে কালীর মন্দিরের চাতালে জমায়েত হয় মাধোর দল। জঙ্গলের অন্ধকারে মশাল জ্বলে ওঠে তখন। পরিত্যক্ত কালী মন্দিরে মূর্তির পায়ে জবা ফুল পড়ে। কপালে সিঁদুর দিয়ে পাকা বাঁশের লাঠিগুলো মাথার ওপরে তুলে বনবন ঘোরায় মাধোর দল। গাছের ডালে ঘুমিয়ে পড়া পাখিরা তখন জেগে উঠে বিরক্তিতে ডানা ঝটপট করে ওঠে জঙ্গল জুড়ে। নিমেষে সময় একলহমায় পিছিয়ে যায় কয়েক দশক। মাধোর দলের ডাকাতদের পুরনো রক্ত খানিকক্ষনের জন্যে উষ্ণ হয়ে ওঠে আবার। অবশ্য দল বলতে সাকুল্যে জনা চারেকে ঠেকেছে এখন। মাধো, বৃন্দাবন, বাঁটু আর বুধন। বাকিরা হয় গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় থিতু হয়েছে, নয়ত বেঁচেই নেই আর।

শনিবারের সেই সাপ্তাহিক জমায়েতেই কথাটা পেড়েছিল বৃন্দাবন। লাঠিটাটি ঘুরিয়ে হাঁফ ধরেছিল খানিক। মন্দিরের চাতালে বসে মশালের আলোর দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, 'সর্দার, এবার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা দরকার।'

'কীসের?' গলাটাকে গম্ভীর করার চেষ্টা করে মাধো।

'এই কাজের।'

'কাজ আর কোথায়?' হতাশ হয়ে বলে মাধো, 'কতদিন যে কাজে বেরোই না আর। হাত-পা তো বলতে গেলে বসেই গেল একেবারে।'

'সেজন্যেই তো বলছি সর্দার, সব কাজেই থামতে হয় একদিন। এবার আমাদেরও পুরোনো কাজ থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর নিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।'

'আনুষ্ঠানিক অবসর?' অবাক হয়ে বলে মাধো।

'আলবাত। আমরা কি যে সে ডাকাত?' পেকে যাওয়া গোঁফ চুমরে বলে বৃন্দাবন, 'আমাদের শুরু যেমন হয়েছিল জমিদারবাড়িতে লোমহর্ষক ডাকাতি দিয়ে, শেষটাও জমজমাট হওয়া চাই। নইলে মুড়ি মিছরি যে এক হয়ে যাবে। অন্যসব ছিঁচকে দলের সঙ্গে আমাদের এক করে দেবে আগামি দিনের মানুষ। কী বলিস তোরা?' বৃন্দাবন অন্যদের সম্মতি চায়।

'একশো বার, হাজার বার', নিজেদের হাতের লাঠি মাথার ওপরে তুলে চেঁচিয়ে ওঠে বাঁটু আর বুধন।

'হিরণপুরের জমিদারদের তখন পড়তি দশা, তবু সম্পদ কম ছিল না মহল্লায়। চিঠি দিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। লাঠিয়াল চাড্ডি জমায়েত করেছিলেন বটে জমিদার রমেন তপাদার, কিন্তু পেরে ওঠেননি আমাদের সঙ্গে...' মাধো সর্দার স্মৃতিতে ডুবে যায়।

'মনে আছে সর্দার?' বৃন্দাবনের ছানি কাটানো চোখ চকচক করে ওঠে মশালের আলোয়।

'থাকবে না আবার?' মাধো সর্দার উঠে দাঁড়ায়, 'গিন্নিমা আমার সামনে হাতজোড় করে বলেছিলেন সব নে মাধো, কিন্তু এয়ো স্ত্রীদের সোনা বাঁধানো শাঁখা পলাগুলো নিসনি বাপ। আর পারলে হাতে গলায় দু চারটে রেখে যাস। ঘরের মেয়ে বউরা খালি হাতে গলায় ঘুরলে গেরস্থের বড় অকল্যান হয়...'

'মনে আছে সর্দার', বাঁটু বলে, 'আপনি সে কথা রেখেওছিলেন। কত্তা খুশি হয়ে যাবার সময় আমাদের হাতে মতিচুরের লাড্ডু দিয়েছিলেন বয়ামে ভরে...'

'বলেছিলেন তোদের সাহস আর শক্তি দেখে ভারি খুশি হলুম', বুধনের ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক ওঠে।

'কাজেই আমাদের শেষ ডাকাতিটাও আমরা জমিদার বাড়িতেই করতে চাই। তারপর অবসর। লাঠিগুলো মন্দিরের পাশের এই মজা খালে বিসর্জন দিয়ে দেব ফিরে এসে।'

'আর কি পারব রে বেন্দাবন?' মাথা নাড়ায় মাধো, 'শরীরে তাকত নেই যে আর...'

'তবু...' বৃন্দাবন বলে, 'এ যে আমাদের ঘরানার পুরনো প্রথা। সে প্রথা আপনি ভেঙে দেবেন সর্দার?'

'কিন্তু জমিদার বাড়ি পাবি কোথায়? জমিদারি যে কবেই উঠে গেছে। তাছাড়া লোকলস্কর পুলিশ বন্দুক জুটিয়ে তারা যদি রুখে দাঁড়ায়, এই বুড়ো শরীরে পারব কি চারজন তাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে?' মাধো ডাকাতের গলায় সংশয় ফুটে ওঠে।

'সে কি আর আমি বুঝি না সর্দার?' মাটিতে লাঠি ঠুকে বলে বৃন্দাবন, 'তেমন জমিদার বাড়ির কথাই ভেবেছি যেখানে আমাদের প্রথাটাও বজায় থাকবে, অথচ গোলোযোগও কিছু থাকবে না...'

'তোর মতলবটা ঝেড়ে কাশ তো দেখি', উৎসাহের সঙ্গে বলে এবার মাধো সর্দার।

'এই জঙ্গলের ওপাশেই তো নদীর পাড়ে গঞ্জের একধারে চৌধুরী জমিদারদের পেল্লায় প্রাসাদখানা ভেঙেচুরে গাছপালা আর আগাছায় মুড়ে পড়ে রয়েছে কতদিন ধরে। আগে তবু দোল দুর্গোৎসবে বাবুরা আসতেন, আজকাল তাও আসেন না। ভুতুড়ে বাড়ি হয়েই প্রাসাদখানা একলা একলা একধারে পড়ে আছে বারোমাস। আমরা সামনের কৃষ্ণপক্ষে ওই বাড়িতেই ডাকাতি করতে যাব। তার আগে একদিন না হয় সময় মতন আলতা দিয়ে একখানা চিঠি লিখেও ফেলে দিয়ে আসা যাবেখন বার বাড়ির বারান্দায়...' বৃন্দাবন মাধো ডাকাতের দিকে তাকায়, 'আপনি শুধু অনুমতিটা দিন সর্দার...'

'ফাঁকা পরিত্যক্ত বাড়িতে যাব ডাকাতি করতে?' কিন্তু কিন্তু গলায় বলে মাধো, 'পোড়ো বাড়িতে ডাকাতি করে কী নিবি রে বেন্দাবন?'

'নেওয়াটা তো বড় কথা নয়, আসল কথা হল ডাকাতিটা করা। শেষ ডাকাতিটা বনেদি বাড়িতে করে প্রথা রক্ষা করা। কী বল রে বুধন?' বৃন্দাবন বলে।

'হুঁ', মাথা চুলকে বলে বুধন।

'কী রে বাঁটু, তুই কী বলিস?' বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করে।

'বুদ্ধিটা মন্দ বের করিসনি বেন্দাবন। সাপও মরবে, অথচ লাঠি ভাঙবে না। মানতেই হবে তোর মাথা আছে'। বাঁটু বলে মাধোর দিকে চেয়ে।

'কিন্তু যে বাড়িতে মানুষই নেই, সে বাড়িতে ডাকাতিটা হয় কী করে?' মাধো সর্দার যুক্তি দেখায়, 'মানুষ না থাকলে যে লোটার মতন সম্পদও থাকে না। শেষে কিনা বুড়ো বয়েসে পোড়ো বাড়ির কড়ি বরগা চুরি করতে যাব রে? এ তো ছিঁচকে চোরের কাজ হয়ে যাবে হে? এ কাজে কি আমাদের সম্মান থাকবে?'

'লোক থাকলে যে লড়াইও থাকবে?', বৃন্দাবন বলে, 'অনভ্যাসে হাড়ে যে মরচে পড়ে পড়ে গেছে সর্দার। লাঠি কি ঘুরবে আগের মতন?'

'কথাটা ঠিকই', মাথা নাড়ায় মাধো, 'তবু আঁতে লাগছে রে বেন্দাবন...'

'চিঠি পাঠিয়েই তো যাচ্ছি। দেখুন জমিদারবাড়ির ব্যাপার, লোক-লস্কর জুটেও যেতে পারে শেষ পর্যন্ত', বৃন্দাবন নিভে আসা মশালের দিকে চেয়ে বলে।

'আর সম্পদ?'

'কপাল ভালো থাকলে তাও জুটে যেতে পারে সর্দার?'

'কী করে?'

'শুনেছি চৌধুরী জমিদারদের লাঠিয়ালরা একসময় প্রচুর সোনাদানা লুঠ করে এনে ওই প্রাসাদের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল সকলের নজর এড়িয়ে। সে সম্পদের হদিশ নাকি আজ অব্দি পাওয়া যায়নি সর্দার। চলুন আমরা বরং সেই সাত রাজার ধনই লুটে আনি ওখান থেকে।' বৃন্দাবনের চোখ চকচক করে ওঠে।

'বেশ তবে তাই হোক', মাধো সর্দার উঠে দাঁড়ায়, 'দলের সকলের যখন এটাই ইচ্ছে, আমি আর বাধা দিই কেন...তাহলে কথামতন সামনের কৃষ্ণপক্ষেরই কোনো এক দিনে আমাদের শেষ ডাকাতি চৌধুরীদের বড়কুঠিতে। লুঠের মাল আপোষে বাঁটোয়ারা হবে চারজনের মধ্যে। রাজি সকলে?'

'রাজি সর্দার', সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে।

'ওইদিন তাহলে এইখানেই জমায়েত। তার আগে দিনকয়েক লাঠি ঘোরানো প্রাকটিস করে নিতে হবে আমাদের। মনে থাকবে?'

'থাকবে ওস্তাদ।'

'মায়ের কাছে পুজো দিয়ে কাজে বেরবো আমরা শেষবারের জন্যে...'

'জয়, মাধো সর্দারের জয়', বলে ওঠে বৃন্দাবন।

'জয়, আমাদের মাধো সর্দারের জয়', লাঠি উঁচিয়ে বলে উঠল বুধন আর বাঁটুও।

ডানা ঝটপটিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে গিয়ে আরো উঁচু ডালে বসে পড়ল সেই আওয়াজে ভয় পেয়ে।

২

অনেকদিন পরে আজ আবার মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছে মাধো সর্দার। মাথায় পাগড়ি। কপালে সিঁদুরের টিপটাও লাগিয়েছে বেশ চড়া করে। কোমরে কোমরবন্ধ। সেখানে ছুরি গোঁজা। ছুরিতে খানিক মরচে পড়েছে অবশ্য। তবু তাতে কিছু যায় আসে না। মেজাজটা বেশ শরিফই লাগছে। মাথাটাও ফুরফুরে। গলাতেও বেশ একটা জোশ এসে গেছে আজ। হাতের লাঠিখানা অনেকদিন বাদে যেন কথা বলে উঠতে ইচ্ছে করছে। অন্ধকার জংলি পথে হাঁটতে হাঁটতে মাধোর মনে হল শরীরে যেন সেই দু-কুড়ি বছর আগের বলশক্তি ফিরে এসেছে হঠাৎ করে। কানে গোঁজা জবা ফুলটাকে হাতের তেলো দিয়ে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে মাধো হাঁক পাড়ল, 'বেন্দাবন—'

মাধোর গলার আকস্মিক পরিবর্তনে খানিক অবাক হয়ে গিয়েই থতমত স্বরে সাড়া দিল বৃন্দাবন, 'কত্তা...'

'চিঠিটা ঠিকঠাক ফেলেছিলি তো দালানে?' বাজখাই গলায় বলে মাধো। সেই আওয়াজে বুধন আর বাঁটুর বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়। তাদের অভিজ্ঞ মন বার বার জানান দিচ্ছে, কী একটা যেন ঘটতে

চলেছে। মাধো সর্দারের মধ্যে অন্য কে যেন এসে বাসা বেঁধেছে আজ। আর সে লোকটা বুড়োহাড়া রোগে ভোগা নয় মোটেই। এ যেন সেই পুরনো দিনের মাধো সর্দার।

বৃন্দাবনের মনটাও কেঁপে ওঠে। মনে মনে ঈষ্ট স্মরণ করে সে। বড়কুঠির নানান বদনাম আছে। অনেকে বলে কুঠিটা ফাঁকা, তবু নাকি ফাঁকা নয়। বয়স্ক মানুষেরা বলাবলি করেন এ বাড়িতে নাকি অনেক রহস্য। চৌধুরীদের বড়কুঠুরিতে গুপ্তসুড়ঙ্গ আছে বলেও শোনা যায়। সে মোটেও ভীতু নয়, তবু এই প্রথম বৃন্দাবনের মনে হল তাদের জীবনের শেষ অভিযানটার জন্যে এই বাড়িটাকে না বাছলেই বোধহয় ভালো হত।

নীচু গলায় বৃন্দাবন জবাব দেয়, 'চিঠি ঠিকমতনই দেওয়া হয়েছে সর্দার। সে চিঠিতে বেশ স্পষ্ট করেই লিখে দেওয়া হয়েছে বড়কুঠিতে যারা বাস করে ক্ষমতা থাকলে তারা মাধো ডাকাতকে রুখে দিক। যদি কেউ রুখতে পারে, মাধো দলবল নিয়ে তার দাস হয়ে কাটাবে বাকি জীবন...'

'হুঁ', ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনি দিয়ে নিজের গোঁফ চুমরে নেয় মাধো সর্দার। তারপর জঙ্গল ঠেলে লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। খান কতক শেয়াল আগুনে চোখ নিয়ে একটু দূর থেকে ডাকাতের এই দলটার ওপরে নজর রাখছিল কিছুক্ষণ ধরে। মাধোর বিক্রম দেখে তারা তফাতে সরে গেল। ব্যাপারটা মাধো ডাকাতের নজর এড়ায়নি। শেয়ালগুলো তাকে সম্মান দিল দেখে মনটা বেজায় খুশি হয়ে উঠল তার।

মাধো ডাকাতের দল যখন বড়কুঠির মরচে ধরা একদিকে ভেঙে পড়া লোহার গেটটার সামনে এসে পৌঁছল, মাঝরাত তখন সবে ভোর রাতের দিকে ঝুঁকেছে। অন্ধকার ফিকে করে একপাল মিটমিটে তারাদের মধ্যে তখন ভোঁতা চাঁদটা ভেসে উঠেছে। তার আবছা হলদেটে আলো এসে পড়েছে বড়কুঠির পলেস্তারা খসা দেওয়াল আর হরজাই গাছে ঢাকা বাগান জুড়ে।

মাধো লোহার দরজার ওপর লাঠি ঠুকে বলে উঠল, 'বেশ একটু হারে রে রে করে চিল্লে ওঠা হবে নাকি রে সবাই মিলে?'

'থাক সর্দার', লোহার দরজার ভেঙে যাওয়া দিক দিয়ে বড়কুঠির বাগানে ঢুকতে ঢুকতে বলে বাঁটু, 'রাতের আওয়াজ অনেক দূর অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। আওয়াজ কানে গিয়ে গঞ্জের মানুষ যদি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে তাহলে বিপদের আর শেষ থাকবে না। কদিন ধরে বাতের ব্যথাটাও এমন চাগাড় দিয়েছে যে প্রয়োজনে ছুটতেও পারব না প্রাণ খুলে।'

মাধো মনে মনে বিরক্ত হল। শেষ ডাকাতির রোমাঞ্চে যেন খানিক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তবে মুখে সে আর বলল না কিছু। চেল্লামিল্লির দিকেও গেল না। বরং খানিক অনুমতি নেওয়ার ভঙ্গীতেই বলে উঠল, 'তাহলে পুরনো গেটটায় খান কতক লাথি কষাই অন্তত। ওটা মাটিতে শুয়ে পড়ুক। নইলে যে চোরের মতন ঢোকা হয়ে যাবে, কী বলিস রে বুধন। ও বেন্দাবন, কী কইছিস বল বাপু...'

'সে আপনি করতেই পারেন সর্দার', মাথা নেড়ে সম্মতি দেয় বৃন্দাবন, 'কিন্তু কাজটা সাবধানে করবেন। বয়েসটা আর আমাদের সঙ্গে নেই মাথায় রাখবেন। হুট করে পায়ে একটা চোট টোট লাগিয়ে বসবেন না যেন।'

বড়কুঠির গেট মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বেশ বুক ফুলিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল মাধো ডাকাতের দল। হাতের লাঠি বাগিয়ে হই হই করে এগিয়ে চলল তারা অন্দরমহলের দিকে। বারমহলের সদর দরজা পেরিয়ে অন্দরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো ডাকাতের দল। বাঁধানো চত্বরের চারপাশে সারি দেওয়া ঘর দালান। হাতের লাঠি মাথার ওপরে তুলে তিনপাক ঘুরিয়ে নিয়ে মাধো চেঁচিয়ে উঠল, 'যতই পড়ে থাকা কুঠি হোক। মাথায় রাখিস, বড়কুঠি বড়কুঠিই। তন্ন তন্ন করে খুঁজবি মহলগুলো। লুকনো সম্পত্তির হদিশ পেলেই ডাক দিবি। সে সম্পদের কিচ্ছুটি যেন পড়ে না থাকে'।

'যে আজ্ঞে সর্দার', বুক ঠুকে বলল বুধন। এতক্ষনে সেই পুরনো উন্মাদনাটা সেও যেন ফিরে পেল। নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠল সে। মনে মৃদু সন্দেহ হল, গলাটা তার নিজেরই তো?

অন্দরমহলে ঢোকবার আগে ফস করে হাতের মশালটা জ্বালিয়ে নিল বাঁটু। আর তখনই বেজায় গম্ভীর গলাটা ধমক দিয়ে উঠল, 'খবরদার। আমি থাকতে বড়কুঠির একটা ইটও তুলে নিয়ে যেতে পারবে না কেউ'। সেই কণ্ঠস্বরে বড়কুঠির দুর্বল জানলা দরজার নড়বড়ে পাল্লাগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল। বুধন, বাঁটু আর বৃন্দাবনের বুকও কেঁপে উঠল। কিন্তু মাধো ডাকাত হুংকার দিয়ে উঠল, 'কে তুই? কার এত সাহস? মাধোডাকাতের চিঠি পেয়েও ভয় পাস না তুই?'

'পাই না।' সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার বলে উঠল।

মাধোর শরীর গরম হয়ে উঠছিল ক্রমাগত। রক্তে আবার পুরনো দিনের প্রবাহ। ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া যুবক আর দুর্দম সেই মাধোডাকাত ফিরে এল তার বুড়োটে শরীরের মধ্যে। হাতের লাঠি বাগিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'সাহস থাকে তো সামনে আয় বেয়াদপ।'

তেল চপচপে চেহারার দৈত্যের মতন দেখতে যে মানুষটা অন্ধকার ফুঁড়ে লাঠি হাতে মাধোর সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে যে কোনো সাধারণ লোকেরই ভিরমি খাবার কথা। কিন্তু মাধো ডাকাতকে তো আর সাধারণ লোকের মধ্যে ফেলা যায় না, কাজেই মাধো মোটেই তাকে দেখে ভয় পেল না। ভিরমিও খেল না। বরং লাঠি হাতে বীরবিক্রমে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে। লোকটা অদ্ভুত কায়দায় মাধো সর্দারের লাঠির মোক্ষম আঘাতটা এড়িয়ে গেল। মাধোর লাঠিটা হাওয়া কেটে শূন্যে ঘুরে গেল দু পাক। অন্য কেউ হলে টাল সামলাতে না পেরে নিজেই উলটে পড়ত। মাধো অবশ্য নিজেকে সামলে নিল। ক্রমশ লাঠির লড়াই জমে উঠল। বয়েসের বাধা সরিয়ে আজ এতদিন বাদেও দিব্বি সুরে কথা বলতে লাগল মাধো সর্দারের হাতের লাঠি, কিন্তু সেই লোকটিকে লাঠিটা কিছুতেই কব্জা করতে পারল না।

হঠাৎই, ভোজবাজির মতন অন্দরমহলের দালানের দেওয়ালে সার দিয়ে থাকা কুলুঙ্গির মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় চোখে পড়ল পরনে ধুতি, আদুড় গায়ের আরো কিছু লাঠিয়াল। দালানের মেঝেয় লাঠি ঠুকে ঠুকে তারা উৎসাহ দিতে লাগল মাধোদের। তখনই সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। গায়ে সিল্কের আলোয়ান। গলায় সোনার মালা, হাতের আঙ্গুলগুলোয় হীরে জহরতের আংটি। লাঠিয়ালদের কয়েকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেয়ার এগিয়ে দিল তাঁকে। তামাক সেজে গড়গড়ার নল এনে ধরল মুখের কাছে। খোলা চত্বরে দুই লাঠিয়ালের লড়াই

দেখে শিশুর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন তিনি, 'ছোঁড়াটাকে সাবাশি দে গোবিন্দলাল। তোর লাঠির সামনে এতক্ষণ যুঝে যাচ্ছে তো বাচ্ছাটা...ওরে কে আছিস, ওর সঙ্গী ছেলে তিনটেকে বসার আসন দে...বাচ্ছাগুলো আর কতক্ষন অমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে...'

দুটো লোক সে কথার উত্তরে 'হ্যাঁ হুজুর', বলে তাঁর পায়ের কাছেই বসার বন্দোবস্ত করে দিল বৃন্দাবনদের।

একটা ঠান্ডা শিরশিরে বাতাস বইছিল। সেই বাতাসে অম্বুরি তামাকের গন্ধ উড়ছে। আরো নানারকমের গন্ধ মিশে যাচ্ছে সেই গন্ধের সঙ্গে। কেমন যেন একটা ঘোর লেগে যাচ্ছিল সক্কলের। বড়কুঠির আকাশে পাতলা কুয়াশার চাদর দেখা দিল এই গ্রীষ্মকালেই। কিচ্ছুটি বুঝতে পারছিল না বৃন্দাবন। আজ এ কী সব ঘটনা ঘটছে বড়কুঠির মধ্যে? স্বপ্ন দেখছে না তো? সত্যিই জেগে আছে কি বৃন্দাবন? এ লোকগুলো কারা? লোকগুলো স্বাভাবিক তো? তাদের মতন বুড়োদের এরা বাচ্চা বলছে কোন হিসেবে?

বাঁটু আর বুধনের হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে আর একটা সম্ভাবনাও উঁকি দিল বৃন্দাবনের মনে। আর সম্ভাবনাটা মাথায় আসতেই ভয়ে হাত পা হিম হয়ে গেল তার।

কুলুঙ্গিগুলো থেকে ঠিকরে আসা ছায়া ছায়া আলোয় প্রাণপনে লাঠি হাতে লড়ে যাচ্ছিল মাধো। লড়তে লড়তে কেমন যেন লড়াইয়ের নেশায় পেয়ে বসেছিল। সঙ্গে হার না মানা জেদ। অনেকদিন বাদে হাতের লাঠিটাও যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গায়েও সিংহের বিক্রম ফিরে এসেছে মাধো সর্দারের। আজ আর কিছুতেই হার মানার কথা নয়, কিন্তু সিংহাসনের মতন দেখতে চেয়ারের ওপরে বসে থাকা মানুষটার মুখে গোবিন্দলাল নামটা শুনেই হাতের লাঠি শিথিল হয়ে গেল তার। হাতের লাঠি ফেলে দু-চোখে অবিশ্বাস নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধো।

লোকটা সিংহের মতন গর্জন করে উঠল, 'যদ্দিন বেঁচে ছিলুম এ বাড়ির নুন খেয়েই শরীরটা খাড়া থেকেছে। আজ মরে গেছি বলে কি এ বাড়ির ঋণ ভুলে গেছি ভেবেছিস? গোবিন্দলাল এ বাড়ির আলোছায়ায় যতদিন মিশে আছে, কারুর সাধ্যি আছে এ বাড়ির ক্ষতি করবে?' বলেই জমিদারবাবুর দিকে চেয়ে মাথা নীচু করল সে।

এতক্ষন ধরে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে লড়ে যাচ্ছিল মাধো। এখন বুঝতে পারল পা দুখানা তিরতির করে কাঁপছে। দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে সে বলে উঠল, 'অপরাধ নেবেন না। আপনারই বংশধর হয়ে আপনার দিকে লাঠি তুলেছি। সেই ছোট্টবেলা থেকে কত্ত নাম শুনেছি আপনার। সকলে বলেছে আপনার মতন লাঠিয়াল এ বিশ্বসংসারে তৈরি হয়নি আর। সেকালের চৌধুরী জমিদার হেমকান্তবাবুর আপনিই ছিলেন বলতে গেলে ডান হাত। লাঠি দিয়ে বাজিমাত করে কত মানুষের জমিজিরেত ধনসম্পদ যে লুঠ করে বাবুর পায়ে এনে ফেলেছিলেন, ভাবতেই শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট হয়ে যায়...লুঠতরাজ আজকের মানুষেও কি করছে না? বলতে গেলে বেশিই তো করছে। ভদ্দরলোকেদের থেকে বড় লুঠেরা কি আমি আপনি হতে পেরেছি বলুন? কিন্তু আপনার লুঠে যে

শিল্প ছিল, যে শৌর্য আর সাহস ছিল তা হারিয়ে গেছে এখনকার সমাজ থেকে... আমার সৌভাগ্য আজ চর্মচক্ষুতে আপনার বিক্রম প্রত্যক্ষ করতে পারলুম...'

'চিনেছো তাহলে আমায়?' গোবিন্দলাল খুশি হয়ে মাধোর কাঁধে হাত রাখে। ঠান্ডা বরফের মতন সেই স্পর্শ। কিন্তু মাধোর ভয় করল না আর। গোবিন্দলালের পায়ের কাছে বসে গদগদ ভঙ্গীতে সে বলে চলল, 'আমি আপনার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। অধমের নাম মাধবলাল...'

'ওঠো হে', তাকে দু-হাতে ধরে উঠিয়ে নেয় গোবিন্দলাল, 'লাঠিয়াল হিসেবে তুমিও মন্দ নয়। দিব্বি পাল্লা দিচ্ছিলে আমার সঙ্গে...'

'আপনার কাছে আমি নস্যি', মাধো বিনয়ের সঙ্গে বলে।

'মাধবলাল'—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন জমিদার হেমকান্ত চৌধুরী, 'বলেছিলে না লাঠির কেরামতিতে হেরে গেলে সারাজীবন দাস হয়ে থাকবে?'

'আজ্ঞে বলেছিলাম। স্বীকার করছি কত্তামশাই।'

'তোমায় তো কথা রাখতে হবে হে...'

'রাখব হুজুর। যে কদিন বাঁচি আপনার হাত পা টিপে সেবা যত্ন করে...'

মাধোর কথার মাঝখানেই হা হা করে হেসে ওঠেন হেমকান্ত, 'ওরে বাপু হাত পা-ই তো নেই আর। শরীরটা তো কবেই ছেড়ে দিয়েছি বাপ। সেবা আর দিবি কোথায়। বহু কষ্টে খানিকক্ষনের জন্যে এই মায়াশরীর তৈরি করেছিলাম সবাই। কিন্তু আলো ফোটার সময় যত এগিয়ে আসছে শরীরটাও ফিকে হয়ে আসছে ক্রমাগত...'

'তাহলে কী করতে হবে আমাকে কত্তা? আদেশ দিন।' মাধো ডাকাত বলে। বৃন্দাবন, বাঁটু আর বুধনও তার পাশে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, 'আমরাও আছি কত্তা...'

হেমকান্ত চোখের ইশারা করেন গোবিন্দলালকে। গোবিন্দলাল অন্দরমহল থেকে পিতলের ঘড়া নিয়ে আসে কাঁধে করে। হেমকান্তের সামনে এনে রাখে। হেমকান্ত হাসেন, 'পাকা সোনার মোহর। এ বাড়িতেই আগলে রেখেছিলাম এতদিন। বাবা মাধবলাল, শেষ ডাকাতিতে কিছু সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে যে ভারি বেইজ্জত হয় তোর, তাই এগুলো তোকেই দিলাম। কিন্তু একটা কাজ তোকে করতে হবে এগুলো দিয়ে...'

'কী কাজ হুজুর?'

'শোন বাবা, লুঠের মাল তো এসব। এই সম্পদের পিছনে অনেকের কান্না মিশে আছে। রক্তও লেগে আছে এই মোহরে। গোবিন্দর লাঠির ঘায়ে কম লোক তো মরেনি একসময়। তাদের আত্মাগুলো এখনও দেখা হলে শাপসম্পাত করে আমাদের। এই বয়েসে আর ওসব ভালো লাগে না বাপু। তাই ঠিক করেছি এগুলো দিয়ে জনসেবা করব...'

'সে তো ভালো কথা কত্তা।'

'ভালো তো বুঝলাম। কিন্তু শরীর না থাকলে কাজটা করি কী করে?'

'কথাটায় যুক্তি আছে।' মাথা নাড়ে মাধো।

'আমার আর গোবিন্দর হয়ে এই কাজটা তোদেরই করতে হবে বাবা।'

'যে আজ্ঞে।'

'নফরগঞ্জে হাসপাতাল হবে।'

'হবে।'

'রঘুনাথগঞ্জে ইস্কুল।'

'বেশ।'

'মাধবপুরে হিমঘর করতে হবে একখানা। ওদের ফসল নষ্ট হয় ফি বছর।'

'হয়ে যাবে কত্তা। আপনারা শুধু মাথার ওপরে থেকে কাজগুলো দেখভাল করে দেবেন আর দরকারি পরামর্শগুলো দিয়ে যাবেন ঠিকঠাক। আমাদের মোটা মাথা। আপনারা পাশে না থাকলে কী করতে কী করে ফেলব ভুল করে...'

'থাকব রে থাকব। ভূতে-মানুষে মিলেমিশে সোনা ফলিয়ে দেব এবার চারধারে দেখে নিস।'

৩

কলসি বোঝাই মোহর কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের কালীমন্দিরের দিকে রওনা দিল মাধো ডাকাতের দল। রাত ফরসা হতে বেশি দেরি নেই। তার আগেই এইসব ধনরত্ন ঠিকমতন বিলিবন্দোবস্ত করে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে দিতে হবে। মানুষের লোভী চোখ বড্ড খারাপ। শুভ কাজে হানিকর।

সামনে অনেক কাজ। ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করে পথ হাঁটতে হবে আগামী দিনগুলোতে।

অশরীরী প্রহরী



চার-পাঁচশো বছর আগে পর্যন্ত এই আদি গঙ্গায় কুল কুল শব্দে জল ছুটত পাক খেতে খেতে। সেই জলে ছোট ছোট জাহাজ চলত যাত্রী নিয়ে, আবার মালপত্র নিয়েও। সেইসব জাহাজের কিছু কিছু তীব্র স্রোতে ডুবেও যেত মাঝগঙ্গায়। মানুষের আর্তনাদ উড়ত আকাশে আর আশেপাশের ঘন জঙ্গল জুড়ে। এখন সেই বিশাল চওড়া নদী শুধুই একটা মজা খাল। আর এই মজে যাওয়া আদিগঙ্গার ধারেই এই পুরোনো শ্মশান। এলাকায় বসতি বেড়েছে গত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত। বন জঙ্গল কেটে শহর এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত। রাস্তাঘাট, আলোবাতি, লোকলস্করে জমজমাট হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। তবু, এখনও এই জায়গাটা নির্জন। প্রাচীন সব গাছপালায় মোড়া। সভ্যতা এখানে পৌঁছতে যেন ভয় পায় এখনও। সভ্য মানুষজনও।

দিনের বেলাতেও এই পথে লোকজনের আনাগোনা তেমন নেই। শ্মশানে দাহ হয় কদাচিৎ। পুরো শ্মশান জুড়ে শেয়ালদের দাপাদাপি। আজও একপাল শেয়াল ছুটোছুটি করছিল শ্মশান জুড়ে। মাঝে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তারা ডেকে উঠেছিল সমস্বরে। একবারই। এখন আবার চুপ। যেন কী এক ভয়ংকরের সম্ভাবনায় ভয় পেয়েছে ওরা।

শ্মশানের মাঝমধ্যিখানে একটা হলদেটে পুরনো বাল্ব জ্বলছিল উঁচু ল্যাম্পপোস্টের মাথায়, আর শ্মশানের এক প্রান্তে, মজে যাওয়া গঙ্গার দিকে, শ্মশানকালীর টালির চালের ছোট্ট মন্দিরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল টিমটিম করে। মন্দিরে নিয়মিত সন্ধেপ্রদীপ জ্বলে এমন নয়, তবে আজ প্রদীপ জ্বলছে। সুব্রত ফিসফিস করে বলল, 'এসে গেছি।'

'এ কোথায় নিয়ে এলি আমাকে?' ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলি আমি, 'এই রাতে এখানে তোর কী কাজ? আর সে কাজে আমাকেই বা লাগবে কেন?' আমি মাথা নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করি,'এ কিন্তু তোর ভারি অন্যায়। বললাম কাজ আছে, বাড়ি ফিরে আমাকে অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির তিন-তিনখানা চ্যাপ্টারের পড়া তৈরি করতে হবে। কোনো কথা শুনলি না, জোর করে ধরে নিয়ে এলি তুই এই বিচ্ছিরি জায়গায়...'

সুব্রত আবার হাসল। বাতাসের মতন মিহি সেই হাসি, 'আগে আমরা হুটহাট এমন কত জায়গায় চলে গেছি বল সাইকেল চালিয়ে...'

'তা গেছি', মাথা নেড়ে সায় দিই আমি, 'তাই বলে এই অন্ধকার রাতে, এইরকম একটা বিদিকিচ্ছিরি জায়গায়?'

'এই শ্মশানের নাম রামসাঁতালের শ্মশান', সুব্রত আমার কথাটা শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে বলতে থাকে, 'অনেকদিন আগে গঙ্গার ধারের এই নির্জন জায়গায় ওই বটগাছের নীচে রামসাঁতাল তপস্যা করতেন', হাত বাড়িয়ে অন্ধকার শ্মশানের এক প্রান্তে আরো অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মস্ত বটগাছের দিকে দেখায় আমায় সুব্রত। 'তিনি ছিলেন মস্ত তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।'

'পিশাচসিদ্ধ মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি আমি।

'সাধনার এ এমন একধরনের সিদ্ধি যে ভূত-প্রেতরা সাধকের বশীভূত হয়ে থাকে। সেই সাধক ইচ্ছেমতন তাদের দিয়ে নানান কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তারা তখন তাঁর ভৃত্য, অনুগত

দাস...একটু অপেক্ষা কর না, নিজে চোখেই দেখতে পাবি সব পিলু...'

'কী দেখতে পাব? ইয়ার্কি মারছিস নাকি আমার সঙ্গে?'

সুব্রত খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে লাগল আমার দিকে চেয়ে। ওর হাসি শুনে আমার গা পিত্তি জ্বলে গেল। ধমকে উঠলাম আমি, 'অ্যাদ্দিন বাদে দুম করে উদয় হয়ে তুই আমাকে ভূতের ভয় দেখাতে চাইছিস নাকি জোর করে এখানে টেনে এনে?'

'বোকার মতন খামোখা ভয় পেতে যাবি কেন...' বলতে বলতে আমার হাত ধরে সুব্রত শ্মশানের সেই ঝুপসি বটগাছটার দিকে এগোতে থাকে, 'দারুণ দিনে তোকে নিয়ে এসেছি রে পিলু। তুই সত্যিই ভাগ্যবান। আজ এখানে একটা সম্মেলনে স্বয়ং বাবা রামসাঁতাল বক্তব্য রাখবেন। জীবনের অন্য পারে গিয়ে পৌঁছেছে যারা তাদের দিকনির্দেশ দেবেন তিনি। ভূতেদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে এই সভায়। তুই নিজে চোখে দেখতে পাবি ওঁকে।'

সুব্রত আমার ছোট্টবেলার বন্ধু। ক্লাশ সিক্স থেকে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি একসঙ্গে। ছেলেটা চিরকালই খ্যাপাটে। বনে বাদাড়ে শ্মশানে গোরস্থানে ঘুরে বেড়াত টো টো করে। ভয়-ডর কোনোদিনই তেমন ছিল না। এইসব অ্যাডভেঞ্চারে আমাকেও প্রায়ই সামিল করত ও। সত্যি কথা বলতে কী, সেইসব অ্যাডভেঞ্চার আমার ভালোই লাগত। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই ওর বাবা অন্য কোথায় যেন বদলি হয়ে গেলেন। সুব্রতও স্কুল ছেড়ে চলে গেল। আর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে এই দু বছরের মধ্যে।

হঠাৎ আজ বিনা নোটিশে ওর আবির্ভাব। আমি ইয়ারফোনে গান শুনতে শুনতে রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়তে যাচ্ছিলাম। স্যারের বাড়ি যাবার অন্য রাস্তা আছে, কিন্তু এই পথে গেলে রাস্তাটা অনেকখানিই কমে যায়। ও বোধহয় পিছন থেকে আমাকে নাম ধরে ডেকেছিল কয়েকবার। আমি শুনতে পাইনি। আচমকা পিঠে একটা চাপড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি সুব্রত। একটা ট্রেন ঝমঝম করে ছুটে গেল তক্ষুনি। সেই আওয়াজে স্পষ্ট শোনা গেল না, তবু মনে হল সুব্রত বলল, 'এখানে আর একটুও দাঁড়াস না। প্রশ্নও করবি না একটাও। কোনোদিকে না তাকিয়ে শিগগিরি চলে আয় আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাবি এখন?' জিজ্ঞেস করাতে কোনো উত্তর না দিয়েই হনহন করে হাঁটা লাগিয়েছিল সুব্রত। ঠিক হাঁটা নয়, যেন উড়ছিল ও। অগত্যা পিছু নিয়েছিলাম। ফল এই দুর্ভোগ। রাত-বিরেতে শ্মশানে দাঁড়িয়ে গুচ্ছের আজগুবি গল্প শোনাতে আরম্ভ করেছে ও আমায়।

হঠাৎই জলদগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বরে চমকে সামনে চাইলাম। বটগাছের গোড়ায় একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের আলোয় তাঁর আবছায়া অবয়ব দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, পরনে দীর্ঘ জোব্বার মতন আলখাল্লা। গঙ্গার মজা খালের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি ডাকছেন, 'ওরে তোরা আয়, তোরা আয়...'

সেই ডাক আমার চারদিকে পাক খেতে খেতে যেন আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল। গা শিরশির করে উঠল আমার। মনে হল এই ডাক আমিও উপেক্ষা করতে পারছি না। সুব্রত কানের কাছে মুখ

এনে নীচু গলায় বলল, 'বাবা রামসাঁতাল। কয়েকশ বছর আগে মারা গেছেন, তবুও অসম্ভব শক্তিশালী। তাঁর ডাক, তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই কারও।'

বাবা রামসাঁতাল বলেই চলেছেন, 'গঙ্গার পাঁকে পুঁতে রাখা যত নাভি, তোরা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠ,...ওরে শরীরহীনের দল, তোরা ছায়াশরীরে ছুটে আয় আমার কাছে। সামনে অনেক কাজ। জীবন তোদের ডাকছে, আমি তোদের ডাকছি...'

আমার বেজায় ভয় করছে এখন। খালের দিক থেকে টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে ছায়াশরীরের মিছিল এগিয়ে আসতে শুরু করেছে তখন বটতলার দিকে। আমি শুকনো গলায় বলে উঠলাম, 'আমরা এখানে থেকে কী করব সুব্রত, চল পালিয়ে যাই আমরা...'

'পালাবি কেন? শুনছিস না উনি ডাকছেন...'

'আমার ভয় করছে।'

'ভয় কী, আমি আছি তো...' সুব্রত সাহস দেয়। আমরা বটগাছটার দিকে এগিয়ে যাই আরও।

এখন সামনে সেই দীর্ঘ ছায়াপুরুষ। সেই কবেকার পৃথিবীর শক্তিশালী তান্ত্রিক বাবা রামসাঁতাল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, 'দীপাবলি আলোর উৎসব। সদ্য ভূতচতুর্দশীতে যে যার ভিটে পরিদর্শন করে এসেছ তোমরা। দেখেছ এই আলোর উৎসবেও নিজেদেরকে তারা কেমন অন্ধকারের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সত্যিকারের আলো দেখানোর জন্যে কে তাদের পাশে দাঁড়াবে?'

'কে প্রভু?' শ্মশান জুড়ে হাহাকার উঠল।

'এই দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে', দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রামসাঁতাল। 'এসো আজ শপথ নিই, মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা তাদের ঘাড়ে চেপে জীবন উপভোগ করার নিন্দিত পথ ছেড়ে আমরা মানুষের কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করি।'

'কী ভাবে ঠাকুর?' ঝোড়ো হাওয়ার মতন ফিসফিসানি উঠল শ্মশান জুড়ে।

'সবরকম অন্যায় আর হিংসার বিরুদ্ধে অশরীরী প্রতিরোধ গড়ে তুলে', গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন তিনি।

'প্রয়োজনে যারা সন্ত্রাসী, যারা অসহিষ্ণু, যারা বিভেদকামী তাদেরকে শাস্তি দেব আমরাই। ভয় কী, একবার মরার পর আর তো কেউ হত্যা করতে পারবে না আমাদের...'

'ঠিক, ঠিক।'

'অতএব বিলম্ব নয়। এবারে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা।'

'যে আজ্ঞে', বলে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল সেইসব না-মানুষ প্রহরীর দল।

রাস্তায়, জনপদে, বাসে-ট্রেনে, সভা-সমিতিতে। মানুষকে অন্যায় করতে দেখলে নিরস্ত করবে তারা। প্রয়োজনে শাস্তিও দেবে। নিজেদের শরীর নেই বলে তারা জানে জীবন কতখানি দামি। কত যত্নে কত আন্তরিকতায় জীবনের এই স্রোত টিকিয়ে রাখতে হয় প্রাণপণে।

ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে আমার। সুব্রতর হাত জোরে চেপে ধরে মরিয়া হয়ে আমি বললাম, 'প্লিজ সুব্রত, চল ফিরে যাই এবার।'

'কোথায়?' বিষণ্ণ গলায় বলে সুব্রত।

'কোথায় আবার', বিরক্ত হয়ে বলি, 'বাড়ি।'

'তুই কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিস না পিলু?'

'কী?'

'আয় তাহলে আমার সঙ্গে', বলে আমার হাত ধরে বাতাসের মতন দ্রুত ছুটতে থাকে ও। আমাকে নিয়ে এসে দাঁড় করায় সেই রেল লাইনের ধারে, যেখানে ওর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়েছিল। সামনে হাত বাড়িয়ে আমাকে বলে, 'দ্যাখ ভালো করে...'

লাইনের পাশে একটা থ্যাঁতলানো ছিন্নভিন্ন শরীর পড়ে ছিল। ক্রমশ লোক জমছে সেই শরীরের আশেপাশে। তবু নিজেকে চিনতে অসুবিধে হল না। হাত পা কাঁপতে শুরু করল আমার। রাগ হল নিজের ওপর। ইশ, ওই ইয়ারফোন...কতবার কতজন বারণ করেছে। তবু...আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

সুব্রত কাঁধে হাত রাখল, 'কষ্ট পাস না পিলু। তুই বেঁচে নেই আর। ভাগ্যিস নেই, তাই তো তোকে ফিরে পেলাম আবার।'

'মানে?'

'আমিও বেঁচে নেই রে...তোরই মতন অমন একটা ছোট্ট ভুলে...'

'কী হয়েছিল তোর?'

'গতবছর কালীপুজোর বিসর্জনের সময় অসাবধানে প্রতিমার নীচে চাপা পড়ে তলিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গায়...'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় জিগ্যেস করলাম, 'আমরা তাহলে এখন কী করব?'

'কী আর করব?' সুব্রত হাসে, 'রামসাঁতাল বাবার কথা তো শুনলি।'

'হুঁ', মাথা নাড়ি আমি।

একটা সামান্য ভুলে শরীর চলে গেছে আমার। সুব্রতরও। কিন্তু যারা বেঁচে আছে এখনও, আজ থেকে তাদের ভালোর জন্যে আমি প্রহরী হয়ে রয়ে গেলাম সুব্রতদের সঙ্গে।



ভূতবাবার মেলায়



বারুইপুর থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর ডাবল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে বটে, তবু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে-কাজ শেষ হচ্ছে এই পথে যাতায়াতের মেহনতি ও সমস্যার অন্ত নেই। সিঙ্গল লাইন বলে মাঝে মাঝেই ক্রসিং-এর জন্যে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায় থাকতে হয় অসহায়ের মতোই। তা ছাড়া কোনো কারণে একটা ট্রেন মিস হয়ে গেলেই বসে থাকো ঝাড়া একটি ঘণ্টা।

মাঝখানে আর ট্রেন নেই। এমনকী সড়ক পথেও যে কলকাতার দিকে ফিরে আসবে সে সুযোগও নেই বললেই চলে। আমি অভিজিতকে পই পই করে বলেছিলাম মথুরাপুর স্টেশন থেকে অন্তত ছ'টার ট্রেনটা ধরার চেষ্টা করতে। তা ছ'টার ট্রেনটা তো ধরা গেলই না, এমনকী সাতটার ট্রেনটাও ছেড়ে গেল একটুর জন্যে। অবশ্য অভিজিতকেই বা দোষ দিই কী করে। দীর্ঘদিন পরে এসেছে দেশের বাড়িতে, নিজের গ্রামে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সহজে ছাড়বে ক্যানো? অগত্যা উঠছি উঠব করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। তারপর কাশীনগর থেকে মথুরাপুর স্টেশনও কম রাস্তা নয়। অবশেষে মথুরাপুর থেকে যখন শিয়ালদহগামী ট্রেনে চেপে বসলাম তখন হাতঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ। এ সময়ে কলকাতার দিকে যাবার গাড়িতে ভিড়-ভাড়াক্কা থাকে না। যত ভিড় সব ফিরতি ট্রেনে। আমাদের কামরাতেও তাই হাতেগোনা কয়েকজনই মাত্র যাত্রী। জানলা-টানলা দেখে জুত করে বসে অভিজিত বলল, 'এমন কিছু রাত্তির হয়নি কী বলিস?' হাতঘড়ির দিতে তাকিয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'ঠিকই। তবে এসব দিকে ট্রেনে গণ্ডগোল হলে ফেরার বিকল্প পথ নেই বলেই চিন্তা হয়—'

'যাকগে। এই তো ফাঁকা গাড়ি পেয়ে গেলাম। দশটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব সব ঠিকঠাক চললে —'

আমি লম্বা করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম মাথার ওপর দু-হাত তুলে! তারপর আলসে গলায় বললাম, 'সব ঠিকঠাক চললে—'

অভিজিত হাসল। বলল, 'বাদ দে। বল আমার গ্রামের বাড়ি তোর ক্যামন লাগল?'

'খুব ভালো। ইনফ্যাক্ট যে-কোনো গ্রাম দেখতেই খুব ভালো লাগে আমার। পুকুরঘাট, মাঠ, চাষের জমি, খোড়ো চালের মাটিরবাড়ি—ফ্যানটাসটিক, মনে হয় যেন হাতে আঁকা কোনো ছবি—' আমি বললাম।

'কিন্তু সন্ধেবেলা যখন নিকষ অন্ধকার সব ল্যান্ডস্কেপ ঢেকে দেবে—বিজলি বাতি জ্বলবে না—শেয়াল ডাকবে বাঁশবনের আড়াল থেকে?'

'তখন জোনাক জ্বলবে থোকায় থোকায়। বাঁশবাগানের মাথার ওপর পেতলের থালার মতন মস্ত চাঁদ উঠবে আকাশ আলো করে—' বেশ কাব্য করে বললাম আমি।

'কিন্তু ধর যদি চাঁদ-টাঁদ না উঠে বাঁশবাগানের আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করে তেনাদের কেউ কেউ?'

'তেনাদের কেউ কেউ মানে?' অবাক গলায় জিগ্যেস করি আমি।

'তেনাদের কথা জানিস না?'

'উঁহু—'

'এই রাতে নাম নেব?' মুচকি হেসে বলল অভিজিত, 'আমাদের গ্রামে অন্ধকার নামলে কেউ তাদের নাম করে না। তাও আজকে আবার শনিবার—'

'ভূতের কথা বলছিস—' হা হা করে হেসে উঠি আমি, 'তুই আবার আজকাল ভূতবিশ্বাসী হয়ে উঠছিস নাকি?'

'আমি বিশ্বাসী না-অবিশ্বাসী সেইটা আজ পর্যন্ত ভালো করে বোঝাই হল না। তবে ছোটোবেলায় ভূতের ভয় পেতাম খুব—'

আলোচনা ক্রমশ জমে উঠল। অভিজিতের গ্রামে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ভূত প্রেতের মুখোমুখি হয়েছেন বিভিন্ন ভাবে, সেইসব অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উঠে আসতে লাগল এক এক করে। রাতের ট্রেন একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে হুড়মুড় করে। লোকজনের ওঠানামা বড়ো একটা নেই। অতএব গল্পের পরিবেশও জমজমাট। অভিজিত জমিয়েও দিয়েছে খুব। হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাইরে আবছা আলোয় মোড়া একটা নির্জন রেলস্টেশন। জানলা দিয়ে বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিয়ে অভিজিত বলল, 'কৃষ্ণমোহন হল্ট। আর একটা স্টেশনের পরেই বারুইপুর।'

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'যাক তাহলে তো এসেই পড়লাম প্রায়। আধঘণ্টার মধ্যেই সোনারপুরে নেমে পড়া যাবে।'

অভিজিতও মাথা নাড়ল। আমি ওর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললাম, 'সবই ভালো লাগল তোর দেশের বাড়ি বেড়াতে এসে। শুধু একটাই অপূর্ণতা রয়ে গেল—'

'কী?' অভিজিত জিগ্যেস করল।

গ্রামে-গঞ্জে কাটালাম সারাদিন, একটা ভূত-টুত যদি চোখে পড়ত তো ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে যেত। ছোটোবেলা থেকে কত গল্প শুনলাম, অথচ আজ পর্যন্ত তাঁদের একজনের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হল না। খুব আশা ছিল এবারে তোদের গ্রামে গিয়ে অন্তত—'

'আহা তা থাকলে কতক্ষণ বলো? অন্তত দু-একটা রাত তো কাটাতে হবে—' আমার কথার মাঝখানেই প্রতিবাদ করে ওঠে অভিজিত।

আমি হেসে বললাম, 'রাত না-কাটাই দুপুর তো কাটালাম। সেই ছড়াটা মনে নেই, ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা—'

অভিজিত আমার কথায় উত্তর দিল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার বলত, ট্রেনটা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল দাঁড়িয়ে আছে। ছাড়ছে না ক্যানো। এখানে এ সময়ে তো সিগন্যালের সমস্যা হওয়ার কথা নয়—'

কথার মধ্যে খেয়ালই করিনি এতক্ষণ। অভিজিতের কথায় বাইরে তাকিয়ে দেখলাম ট্রেনটা কৃষ্ণমোহন হল্ট স্টেশনেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে।

'কী ব্যাপার বলত, ট্রেনটা ছাড়ছে না ক্যানো?' একরাশ বিরক্তির সঙ্গে বলি আমিও।

'ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে—' অভিজিত নয়, আমাদের উলটোদিকের জানলার পাশে বসা একটা লোক বলে উঠল মিহি গলায়। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে কখন যে লোকটা কামরায় উঠে নিঃশব্দে বসে পড়েছে ওদিকে খেয়ালই করিনি। লোকটা আবার বলল, 'ট্রেন কখন ছাড়বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই আর—'

'ক্যানো বলুন দেখি—'

চিন্তিত মুখে জিগ্যেস করি আমি।

'কাটা পড়েছে।'

'সে কি—এই ট্রেনে?'

'কোথায়?'

'কৃষ্ণমোহন আর শাসন স্টেশনের মাঝখানে—'

'তারপর?'

'তারপর আর কী—বিস্তর লোক জুটেছে। হইচই চলছে। বডি না-সরলে ট্রেন চলবে না—'

'কী করে কাটা পড়ল?'

লোকটা এ প্রশ্নে জুলজুল করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগল, 'কী করে বলি বলুন। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে, আবার সুইসাইডও হতে পারে। আসলে জায়গাটা তো সরেস। মৃত্যু এখানে মানুষকে আয় আয় করে ডাকে সর্বক্ষণ—'

'মানে?' চোখ গোল গোল করে জিগ্যেস করে উঠল অভিজিত।

'আশ্চর্য ব্যাপার মশাই,' লোকটা বলে চলল, খুন-দুর্ঘটনা-আত্মহত্যা মিশিয়ে ফি-বছর দু-তিনটে লোক অন্তত এখানে কাটা পড়বেই।'

'বলেন কী?'

'তা না-হলে আর বলছি কী। জায়গাটা একেবারে বিষিয়ে আছে মশাই—বাতাস ভারি হয়ে আছে সর্বক্ষণ—'

'বুঝলাম না ঠিক—'

'বুঝলেন না?'

'উঁহু।' দু-দিকে মাথা নাড়লাম আমি।

'অশরীরী আত্মাদের একেবারে আখড়া হয়ে আছে জায়গাটা—'

'বলেন কী?' অবাক হয়ে গিয়ে বলে অভিজিত।

'এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যেত। নেহাত ভূতবাবা চোখ রাখছেন সর্বক্ষণ—'

'ভূতবাবাটি আবার কে? কোনো বাবাজি-টাবাজি নাকি?' হালকা গলায় জিগ্যেস করি আমি।

'আজ্ঞে না, উনি আসলে শিব। ভূতেদের জয় করেছেন বলে এখানে উনি ভূতনাথ। গ্রামের লোক ভালোবেসে ভূতবাবা বলে ডাকে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই তো ওনার মন্দির—'

'আপনি এতসব জানলেন কী করে?' জিগ্যেস করে অভিজিত।

'আমি তো এখানেই থাকি। অধমের নাম নিবারণ দাস।'

ভূতবাবার ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল আমার। আমি বললাম, 'ভূতবাবার ব্যাপারে কী যেন বলছিলেন—'

নিবারণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কামরার ভেতরটায় ক্যামন বদ্ধ বদ্ধ ভাব একটা। চলুন প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাক—'

অভিজিত কিন্তু কিন্তু করছিল। আমি বললাম, 'নামা যাকই না। সিগন্যাল সবুজ হলে উঠে পড়লেই হল—'

নিবারণ আবারও বলল, 'ট্রেন এখন ছাড়বে না—'

আমরা কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম।

নিবারণ আবার বলতে শুরু করল, এই মন্দির প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। আর বাবাও খুব জাগ্রত। মন্দিরের সামনের মস্ত শ্যাওড়া গাছটায় এখনও দূর-দুরান্ত থেকে লোক এসে ঢিল বেঁধে মানত করে। আর বাবাও তাদের ভূত-প্রেতের হাত থেকে রক্ষা করেন।

অভিজিত খুব মন দিয়ে শুনছিল সব। নিবারণ থামতেই সে জিগ্যেস করল, 'ভূত-প্রেত কি সত্যিই এ অঞ্চলে আছে বলে মনে হয় আপনার?'

'আমার মনে হওয়াটা তো বড়ো কথা নয় বাবু,' নিবারণ হাসল। এখানকার প্রায় সব মানুষজনই বিশ্বাস করেন যে তেনারা আছেন—'

'মাঝে-মধ্যে দেখা যায় তাঁদের?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'তা যায় বই কী বাবু। কত লোকই তো তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ পায়। তবে ভূতবাবার কৃপায় এঁরা খুবই শান্ত আর নির্বিবাদী। মানুষের ক্ষতি চিন্তা করেন না কখনও—'

'একদিন তাহলে তো দেখতে এলে হয়—আমি হালকাভাবে বললাম।

'আজ যাবেন?' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে জিগ্যেস করল।

'আজ?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলে উঠলাম আমি।

'আজ এখানে ভূতবাবার মেলা বসেছে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আবডালে মৃদু আলোর লণ্ঠন জ্বালিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা—' নিবারণ বলতে শুরু করল।

'এই রাত্তিরবেলা?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করে অভিজিত।

'আজ্ঞে রাতেরই মেলা এটা' নিবারণ বলে, 'শুনেছি মানুষের দেহ ধরে তেনারাও নাকি আসেন এ মেলায়। দোকানি সেজে দোকান দেন, কখনও ক্রেতা সাজেন—'

'যাঃ—' নিবারণের কথার মাঝখানেই অবিশ্বাসীকণ্ঠে বলে উঠি আমি।

'চলুন না, যাবেন? এই কাছেই তো—ওখান থেকে বারুইপুর যাওয়ার ভ্যান-ট্যানও পেয়ে যেতে পারেন। আপনাদের বাড়ি ফেরার সুবিধা হয়ে যাবে। ট্রেনের ওপর তো আর ভরসা নেই, কখন চলে না-চলে—' নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে বলে। অভিজিতের এ প্রস্তাবে একেবারেই সায় ছিল না। একে রাত বাড়ছে, তা ছাড়া একদম অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এরকম হুট করে—

আমার কিন্তু ক্যামন যেন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসল। প্রায় জোরই করে বসলাম অভিজিতের ওপর। ওকে বোঝালাম যে দশ-বিশ মিনিট মেলায় ঘুরে সত্যিই যদি বারুইপুর দিয়ে বাড়ি ফিরি তাহলে অসুবিধা হবার কথা নয়। সময়ও খুব বেশি নষ্ট হবে বলে মনে হয় না। অভিজিত নিমরাজি হয়ে হাঁটতে শুরু করল আমাদের সঙ্গে।

মেলাটা অদ্ভুত। বিজলি বাতি নেই, লোকজনের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি নেই। সব ক্যামন যেন নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। ঝুপসি অন্ধকারে জংলি ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে দু-চারটে দোকান। দোকানের আলো এত কম যে দোকানির মুখ পর্যন্ত দেখা যায় না ভালো করে। দু-চারজন মাত্র খরিদ্দার থমথমে গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দোকান থেকে ও দোকানে। এমন ফিসফিস করে কথা বলছে সবাই যে পাশে দাঁড়িয়েও ভালো করে শোনা যাবে কিনা সন্দেহ।

একটা অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস এসে লাগছে আমাদের গায়ে। সেই হাওয়ায় শিরশির করে উঠছে গা। দোকানিরা অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সে তাকানোয় কোনো আহ্বান নেই। ক্যানো কে জানে ভয়ানক অস্বস্তি হতে লাগল আমার। বুঝতে পারলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছি আমি। অভিজিতও আমার হাত ধরে আলতো টান দিল। চাপা গলায় বলল, 'গতিক ভালো ঠেকছে নারে একটুও। চল পালাই।'

নিবারণ একটু তফাতে ছিল। আমাদের দিকে ফিরল হঠাৎ। হাসল ফিকফিক করে। জিগ্যেস করল, 'ভয় পেলেন নাকি?'

আমার অস্বস্তি বাড়ল। নিবারণ আমাদের মনের কথা টের পেল কী করে। আমরা কোনো উত্তর দেবার আগেই একটা বুড়োমতো রোগা লোক এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আমাদের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে তাকাল নিবারণের দিকে। দাঁত বের করে হাসল খানিক। তারপর নিবারণের থুতনি ধরে আদর করে বলল, 'আজই আসা হল মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ছোট্ট জবাব দিল নিবারণ।

অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তবু আমার কেনো যেন মনে হচ্ছে এখন ঝোপঝাড়ের আশেপাশে বসে থাকা দোকানিরা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাদের চোখ, তাদের চাউনি, তাদের মাথা কিংবা বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে যেন ভয়ানক রকমের একটা অসংগতি। এই অদ্ভুত গা-ছমছমে অন্ধকারে এরা সবাই প্রাণপণে কিছু একটা যেন ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে আমাদের কাছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হল। মুহূর্তে ইঙ্গিত এল মস্তিক থেকে। অভিজিতের হাত ধরে সোজা দৌড়তে শুরু করলাম রাস্তার দিকে। নিবারণ ডাক দিল পিছন থেকে। সে ডাক কানে তুললাম না আমরা। বাতাসের মতো মিহি গলায় কারা যেন কলরব তুলল, 'কিছু কিনে যাও, কিছু কিনে যাও—'

পিছন ফিরে সে কলরবের উৎস খোঁজারও সাহস হল না আমাদের। একছুটে বড়োরাস্তায় উঠে ভাগ্যজোরে একটা রিক্সাভ্যান পেয়েছিলাম তাই রক্ষে। ভ্যানচালক মাধব দাস ঝড়ের গতিতে এনে দিল বারুইপুরে। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার গাড়ি পেতে অসুবিধা হয়নি আর।

পরদিন ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলাম আটটা মিসড কল হয়েছে অভিজিতের ফোন থেকে। ওকে ফোন করাতে খুব উত্তেজিত গলায় জিগ্যেস করল, 'কাগজটা দেখেছিস?'

বললাম 'কেনো?'

ফোনের ওপার থেকে অভিজিত বলল, 'দৈনিক বাংলার ছয়ের পাতার বাঁ-দিকে নীচে একটা ছোট্ট খবর আছে পড়—'

চায়ের টেবিলের ওপর কাগজটা পড়েছিল। তুলে নিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় কৃষ্ণমোহন হল্ট ও শাসন স্টেশনের মাঝে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর খবর। মৃতের নাম নিবারণ চন্দ্র দাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, আড়াই বছর আগে ওখানেই ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল নিবারণের রিকশাভ্যান চালক দাদা মাধবচন্দ্র দাস।





কদিন আগে থেকেই প্ল্যান-প্রোগ্রাম চলছিল যে, দু'-চারদিনের ছুটিছাটা ম্যানেজ করে যদি কাছেপিঠে কোথাও ঘুরে আসা যায়। বাবাই একটু জঙ্গলপ্রিয়। ওর ইচ্ছে ছিল ডুয়ার্সের দিকে কোথাও একটা যদি বনবাংলো-টাংলো বুক করা যায়, তা হলে ক'টা দিন নিরিবিলিতে গল্পগুজব করে আর নদী-জঙ্গল দেখে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমি আবার একটু পাহাড়ঘেঁষা। কাজেই বাবাইয়ের জঙ্গলের ব্যাপারটা মাথায় রেখেই আর একটু এগিয়ে বললাম, 'তার চেয়ে চল বরং লাভা-লোলেগাঁও ঘুরে আসি। ওখানে জঙ্গলও পাবি আবার পাহাড়ের ভিউগুলোও মিস হবে না। আমার প্রস্তাবে বাবাইয়ের খুব একটা আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাধ সাধল কৌশিক। ডুয়ার্স, লাভা দুটো প্রস্তাবই খারিজ করে দিয়ে ও বলল, 'অত দূরে হবে না।'

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, 'হবে না কেন?'

বাবাই বলল, 'শর্ট টাইমে রিজার্ভেশনের ঝামেলার ব্যাপারটা ভাবিস যদি, তা হলে বলছি, অসুবিধে নেই কোনও। আগের দিন তৎকাল টিকিট কিনে নেব। একটু খরচ বেশি হবে, এই যা।'

আমিও বললাম, 'ট্রেন না হলে রকেট বাসও তো আছে।'

কৌশিক বলল, 'হবে না।'

অসহিষ্ণুহয়ে আমি বললাম, 'তখন থেকে তো হবে না, হবে না করছিস। কেন হবে না, সেই কারণটা তো বলবি।'

'আসলে ওসব জায়গায় যেতে হলে অন্তত সাত-আট দিন হাতে রাখতে হয়। আমার যা অবস্থা এখন, তাতে অফিস অতদিন টানা ছুটি কিছুতেই দেবে না,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে কৌশিক।

'তা হলে?' আমি ওর দিকে তাকিয়ে বলি।

'অন্য জায়গার কথা ভাবতে হবে। আর-একটু কাছাকাছি,' কৌশিক বলে।

'কাছাকাছি মানে তো সেই শান্তিনিকেতন কিংবা মুকুটমণিপুর,' বাবাই বিরক্ত গলায় বলে।

'তা কেন, কেওনঝড় চল', আমি বলি, বাবাইকে সামাল দিতে।

'চল বললেই তো আর যাওয়া যায় না, বিস্তর ঝামেলা এখন ওদিকে। অযথা রিস্ক নেওয়ার কোনও মানে হয় না,' একটু উদাসীন গলায় বলে কৌশিক।

'তা হলে তুই-ই একটা জায়গা সাজেস্ট কর,' বাবাই রেগেমেগে বলে।

'বলছিস?' সোজা হয়ে বসে কৌশিক।

'বলছি', বাবাই খাপ্পা।

'তা হলে চল, দিন তিনেকের জন্য নারায়ণগঞ্জ ঘুরে আসি।' এমনভাবে নারায়ণগঞ্জ কথাটা বলল কৌশিক, যেন প্যারিস উচ্চারণ করছে।

'নারায়ণগঞ্জ, সেটা আবার কোথায়?' আমি আর বাবাই দু'জনেই জিগ্যেস করে উঠি অবাক হয়ে।

'নারায়ণগঞ্জ একটা ভারি মিষ্টি গ্রামের নাম। একেবারে নিরিবিলি। লোকজনের বাস খুব বেশি নেই। মেলা গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল আছে চারপাশে। একটা ছোট্ট নদীও আছে আঁকাবাঁকা সাপের মতো।

আর সেই নদীর ধারেই আছে একটা মস্ত পুরনো বাড়ি। প্রায় ফাঁকা', যেন রূপকথার কোনও এক গল্প শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলে যেতে লাগল কৌশিক।

বাবাই বলল, 'এত তুই জানলি কী করে? তুই কি আগে কখনও গেছিস ওখানে?'

'না।'

'তা হলে?'

'সুপ্রিয়র কাছে শুনেছি।'

'সুপ্রিয়টা আবার কে?'

'আমার কলিগ।'

'সে-ই বা জানল কী করে?'

'বাড়িটা ওদেরই। ওর ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন সেকালে। এখন পড়ে আছে। শুধু এক বুড়ো কেয়ারটেকার আছে দেখশোনার জন্য। আর আছেন সুপ্রিয়র এক জ্যাঠামশাই, নাম অবনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।'

'উনি অত বড় বাড়িতে একা থাকেন?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করি আমি।

'হ্যাঁ', উত্তর দেয় কৌশিক।

'ওঁর পরিবার?'

'নেই।'

'নেই মানে? উনি কি বিয়ে-থা করেননি?'

'করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের সাত বছরের মাথায় ওঁর স্ত্রী আর চার বছরের মেয়ে কীভাবে যেন মারা যায়!'

'কীভাবে মানে?'

'জানি না। আসলে কেউই জানে না। এটা একটা রহস্য। এ-রহস্যের আজও কোনও কিনারা হয়নি। অবনীবাবু নিজেও বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন।'

'তারপর?'

'কোনও সমাধান খুঁজে না পেয়ে স্ত্রী আর মেয়ের স্মৃতি আগলে ওই বাড়িতেই থেকে গেছেন তিনি। ওখান থেকে কেউ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি তাঁর মেয়ে, বউকে নিয়েই থাকেন ওই বাড়িতে। এখনও!'

'বলিস কীরে, এ যে রীতিমতো ভূতুড়ে কাণ্ড,' আমি একটু ভয়ে-ভয়েই বলি।

'বলতে পারিস,' কৌশিক নিরুদ্বিগ্ন গলাতেই উত্তর দেয়।

'তুই কি এইসব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করে ফেলেছিল নাকি যে, সত্যিই বাড়িটায় ওইসব ব্যাপার-স্যাপার আছে?' বাবাই তাচ্ছিল্যের সুরে জিগ্যেস করে কৌশিককে।

'আমি বিশ্বাস করি কি না করি সেটা তো কোনও প্রশ্ন না, অবনীবাবু যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন সে কথাটা তোদের শুনিয়ে রাখলাম শুধু!' ঠান্ডা গলায় বলে কৌশিক।

'কেন শোনালি?' সন্দিগ্ধ গলায় বাবাই জিগ্যেস করে।

'এসব শুনেটুনেও তোরা যদি যেতে চাস, কোনো ভূতুড়ে জায়গায় আমি তো আর জোর করে তোদের নিয়ে যেতে পারি না।'

'তুই ভাবলি কী করে যে আমরা ভয় পাব?' চোখ পাকিয়ে বলে বাবাই।

'পেতেও তো পারিস,' হাসে কৌশিক।

'কভি নেহি।'

'ওখানে যাওয়া তা হলে পাক্কা?'

'আলবাত।'

'কথা বলি তা হলে সুপ্রিয়র সঙ্গে?'

'একশোবার।'

আমার কোনও মতামত না নিয়েই কৌশিককে কথা দিয়ে দিল সবাই।

আমি আর কী করব? অগত্যা গন্তব্য নারায়ণগঞ্জ।

২

সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কৌশিকটা বিটকেল আর ডানপিটে। নানারকম দস্যিপনায় বরাবর সিদ্ধহস্ত ও। আর বাবাইটাও যেন কয়েনের উলটো পিঠ। পৃথিবীতে যে আদৌ ভয় পাওয়ার মতো কোনও বিষয় আছে, ওকে দেখলে কিছুতেই তা বোঝার উপায় নেই। এমনিতে চেহারাটাও ওর বড়সড়। শক্তিও গায়ে প্রচুর। তবে এই অজুহাতে যে-কোনও ভয়ভীতির কথাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ওর যে বিশ্রী স্বভাব, সেটা আমি আবার কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই চেহারায় রোগাভোগা আমি। ভয়ভীতিও আমার হাড়মজ্জায়। ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো মনের জোরও আমার ছিল না কোনওদিন। অতএব নারায়ণগঞ্জের ওই বিচ্ছিরি ভুতুড়ে বাড়িতে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না আমার। বেশি ধানাই-পানাই না করে কৌশিক আর বাবাইকে বলেওছিলাম আমি কথাটা। কিন্তু আমার আপত্তি ধোপে টেকেনি। দু'জনেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে আমার কথা। উলটে খানিক ঠাট্টা-তামাশা আর উপহাস জুটেছে আমার কপালে, আমার এই অহেতুক ভিতু স্বভাবের জন্য। আমি কথা বাড়াইনি আর। যারা অবুঝ, তাদের বোঝানো শিবের বাবারও অসাধ্য।

অবশ্য, নারায়ণগঞ্জে এসে পৌঁছনোর পর ওদের উপর আর একটুও রাগ, অভিমান নেই আমার। গ্রামটা সত্যিই যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। আর যে বাড়িটায় এসে উঠেছি আমরা, সেটা তো প্রায় ছোটখাটো রাজপ্রাসাদ একটা। যদিও সেই বাড়ির জৌলুস ফিকে হয়ে গেছে এখন। পলেস্তারা খসে পড়েছে দেওয়ালের, ছাদের গায়ে-গায়ে আটকে আছে লম্বা-লম্বা ঝুল। তবুও এ-

বাড়িতে ঢুকলে বোঝা যায় যে, আগে কেমন জমকালো ছিল বাড়িটা। কেয়ারটেকার হরিপ্রসাদ যে ঘরটাতে থাকতে দিল আমাদের, সাফসুতরো করে বিছানা পেতে, সে ঘরটি পেল্লায় বড়। ঘরটি একেবারে পুব দিকে, সিঁড়ির ঠিক ডান পাশে। পুবের দেওয়ালে লোহার গরাদ দেওয়া মস্ত জানলা। জানলার ওপাশে নদী। আপনমনে তিরতির করে বয়ে চলেছে তার জল। নারায়ণগঞ্জে বিজলিবাতির বন্দোবস্ত নেই বলে আমরা একটু নাক সিঁটকেছিলাম। ভেবেছিলাম, এই গরমে পাখার হাওয়া ছাড়া থাকব কীভাবে? কিন্তু দরজা খুলে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে হরিদা যেই দক্ষিণের জানলা দুটো খুলে দিল সঙ্গে-সঙ্গে এত হাওয়া একসঙ্গে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে এল যে, আমাদের আর বৈদ্যুতিক পাখার কথা মনেই পড়ল না।

অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা হল আমাদের দুপুরের খাওয়াদাওয়া এবং বিশ্রামের পর, একেবারে বিকেলবেলা। ওঁর ঘরটি দোতলায়। আমাদের ঘরের ঠিক মাথার উপর। উনি নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরোন না। শারীরিক সামর্থ্যও নেই তাঁর। হরিদাই তাঁর দেখভাল করে সমস্তদিন। তারপর সন্ধে হতে না হতেই অবনীবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে নীচে নেমে আসে তার নিজের ঘরে।

আজও অবনীবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়েই নীচে নেমে এল হরিদা। বলল, 'আপনারা গপ্পটপ্প করুন খানিক। আমি ততক্ষণ খাবারদাবারের ব্যবস্থা করি।'

তেলের লণ্ঠন জ্বলছে ঘরে। আবছা আলোয় থমথম করছে ঘর। জানলার বাইরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। জোনাকি উড়ছে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা।

কৌশিক বাবাইয়ের কাঁধে চাপড় মারল, 'কীরে, তোর বনবাংলোর চেয়ে কিছু খারাপ হল? সত্যি করে বল দিকিনি।'

'ফ্যানটাস্টিক।' হাসে বাবাই। তারপর বলে, 'সত্যি এই পরিবেশে যেন একটা ভূতটুত না থাকলে মানায় না।'

বাবাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই জানলার ওপার থেকে ছ্যা ছ্যা ছ্যা করে বিশ্রী একটা আওয়াজ করে উঠল কে যেন।

ছ্যাঁৎ করে উঠল আমার বুকের ভিতরটা। চমকে উঠে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম আমি।

কৌশিক খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল আমার। হেসে বলল, 'ভয় পেয়ে গেলি জিতু?'

'আওয়াজটা কী বল তো?' কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করি আমি।

'ভূত নয়, ওটা নেহাতই একটা পাখি খোকাবাবু', বাবাই ব্যঙ্গ করে বলে আমায়।

'পাখি?' সন্দেহের সুরে বলি আমি।

'হ্যাঁ, প্যাঁচা।' আমাকে আশ্বস্ত করে বাবাই।

'প্যাঁচার ডাকেই যদি ভিরমি খাস তা হলে সত্যি-সত্যিই ভুতুড়ে কিছু ঘটলে তো অক্কা যাবি রে জিতু', বলে হেসে বিছানার উপর একেবারে গড়িয়ে পড়ে কৌশিক।

নিজের উপর খুব রাগ হয় আমার। সত্যিই আমি বড় অল্পে ভয় পেয়ে যাই। কৌশিক, বাবাইরা ঠিকই বলে বোধ হয় যে, আমার হার্টে নিশ্চিত কোনও গলতি রয়ে গেছে জন্ম থেকেই।

৩

কী একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। রাতে শুতে যাওয়ার সময় তেলের লণ্ঠনটা নিভিয়ে শুয়েছিলাম আমরা। চোখ মেলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আলোটা জ্বলছে। এত রাতে আলো জ্বালল কে? ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। আর কী আশ্চর্য, উঠে বসে দেখলাম, বাবাই আর কৌশিক স্থাণুর মতো বসে আছে ওদের বিছানায়। লণ্ঠনের আবছা আলোয় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওদের। রাত কত দেখার জন্য মাথার বালিশের পাশ থেকে আমার হাতঘড়িটা বের করলাম। রেডিয়াম লাগানো হাতঘড়ি জানাল তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। আমি হতভম্বের মতন জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে?' কৌশিক, বাবাই দু'জনেই যেন আমার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল আমাকে। আমি ওদের কাছে গিয়ে বসতেই চাপা গলায় বাবাই বলল, 'কান খাড়া কর। চেষ্টা করে দ্যাখ একটা শব্দ শুনতে পাস কি না।'

আমি একটু চেষ্টা করতেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। ঝুম, ঝুম, ঝুম, ঝুম। কে যেন পায়ে নূপুর পরে সিঁড়ি দিয়ে উপর দিকে উঠছে আস্তে-আস্তে।

'ওই যে, ওই যে', উত্তেজিত গলায় আমি বলি।

'শুনেছি,' একটু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে কৌশিক।

'আওয়াজটা কিসের বল তো?' দ্বিধাজড়িত গলায় জিগ্যেস করি আমি।

'কী মনে হচ্ছে তোর?' বাবাই জিগ্যেস করে। ওর গলাতেও যেন একটু হালকা উত্তেজনার ছোঁয়া।

'কে যেন হাঁটছে।'

'আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে।'

'আওয়াজটা কখন থেকে শুনছিস তোরা?'

'অনেকক্ষণ থেকে। কে যেন আমাদেরই জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে উঠোনে উঠে বারান্দা টপকে সিঁড়ি পর্যন্ত এল, আস্তে-আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে।'

'কে হাঁটছে, দেখতে পেলি কাউকে?'

'নাঃ।'

'তা হলে কি যা শুনে এসেছি সেই কথাটাই সত্যি নাকি?' ভয়ে-ভয়ে বলি আমি।

'হয়তো। তবে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়,' কৌশিক গম্ভীর গলায় বলে।

'এখনও?' আমি ঠাট্টা করে বলি।

'এখনও,' কৌশিক আরও দৃঢ় গলায় বলে।

'তা হলে চল, বাইরে বেরিয়ে দেখি একবার ঘটনাটা ঠিক কী?' বাবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে কৌশিককে।

'বলিস কী, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোদের?' আমি বলি, 'এ অবস্থায় বাইরে বেরোবি কোথায়?'

'তুই তা হলে বোস ঘরে, আমরা দেখে আসছি,' বলে উঠে পড়ল কৌশিক।

কৌশিককে উঠতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম একলাফে। এই ঘরের মধ্যে একা-একা থাকার কোনও মানেই হয় না। কাজেই দরজা খুলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। বারান্দা, সিঁড়ি কোথাও কোনও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না আর। দেখতেও পাওয়া গেল না কাউকে।

হরিপ্রসাদের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল দরজা বন্ধ। ঘরের মধ্যে থেকে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে তার। কৌশিক দরজায় ধাক্কা মেরে ডাক দিল, 'হরিদা, হরিদা।'

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর হরিদা দরজা খুলল। আমাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি অবাক গলায় জিগ্যেস করল, 'তোমরা এত রাতে?'

'এখান দিয়ে একটু আগে কাউকে হেঁটে যেতে শুনেছ হরিদা?' বাবাই জিগ্যেস করল উত্তেজিত কণ্ঠে।

একবার আপাদমস্তক দেখে নিল আমাদের হরিদা। তারপর কঠিন এবং ঠান্ডা গলায় বলে উঠল, 'ও আওয়াজ গত তিরিশ বছর ধরে শুনে আসছি দাদারা। ও নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। তোমরাও ঘামিও না। চুপচাপ শুয়ে পড়ো ঘরে গিয়ে। ভোর হতে এখনও দেরি আছে খানিক।'

ঘরে আমরা ফিরলাম বটে। কিন্তু ঘুম হল না একটুও। বিছানার উপর এপাশ-ওপাশ করতে-করতে একসময় পুবের জানলার ওদিককার আকাশ লাল হয়ে উঠল। তারপর ছাই-ছাই অন্ধকার সরিয়ে সূর্যের আলো ফুটতে শুরু করল ধীরে-ধীরে।

ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে কৌশিক। বাবাই মাথাটাকে এলিয়ে দিয়েছে পিছনের দেওয়ালে। আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরের নীল আকাশের দিকে, যে আকাশ অনন্ত, অসীম। মৃত্যুর পরে ওই আকাশেই হারিয়ে যেতে হয়? নাকি সকলকেই ফিরে-ফিরে আসতে হয় আপনজনের টানে, পূর্ব জীবন ঘিরে থাকা যাবতীয় চিহ্ন ও স্মৃতির টানে। কে জানে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কী। কৌশিক বা বাবাই এখন কী ভাবছে জানি না, তবে এই সত্যিটুকু বোধ হয় আর ওদের স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, শুধু গায়ের জোর আর গোঁয়ার্তুমি দিয়ে এই পৃথিবীর হাজারও রহস্যকে, দীর্ঘলালিত ভয় আর বিশ্বাসকে এক লহমায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

নারায়ণগঞ্জে প্রথম রাতের আতঙ্ক কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি ওদের ফিরে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তখন আমার কথা শুনলে এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ঝড় আমাদের সামলাতে হত না। কিন্তু এ বোধ হয় দৈবেরই লিখন। ঈশ্বর স্বয়ং বুঝি চেয়েছিলেন যে, ওদের দর্প চুর্ণ হোক। তাই ওদের এই বুদ্ধিভ্রম। আমার কোনও কথা, কোনও যুক্তিকেই আমল না দিয়ে শুধুমাত্র জেদ করে থেকে গেল ওরা ওই মৃত্যুপুরীতে আরও একটা দিন।

দিনেরবেলাটা ভালই কাটল আমাদের ঘুরে-বেড়িয়ে, গল্প-গুজবে। খাওয়া-দাওয়ারও খামতি ছিল না কোনও। আর হরিদার রান্নার হাতটা চমৎকার। তবে একটা ব্যাপার দুপুর থেকেই কেমন যেন খটকা

লেগেছিল আমাদের মনে। হরিদা যেন বড় বেশি গম্ভীর আজ। খটকাটা চরমে উঠল যখন সন্ধে হতে না-হতেই খাবার-দাবার নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকল হরিদা।

আমরা অবাক হয়ে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি রাতের খাবার কেন হরিদা? তুমি কি যাবে কোথাও?'

'না,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিল হরিদা।

'তা হলে?'

'আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ো একদম।'

'কেন?'

'কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'ওঃ, বলছি তো আছে একটা কারণ।'

'আমাদের বলতেই হবে, না হলে খাব না আমরা এখন। সবাই মিলে ছাদে উঠে বসে থাকব।'

'কোথায়?' যেন আগুন খেলে গেল হরিদার চোখে।

'ছাদে,' খুব শান্ত গলায় বলল কৌশিক।

'খবরদার,' চিৎকার করে উঠল হরিদা, 'সিঁড়ির আশপাশেও যাবে না আজ কেউ তোমরা।'

'কেন?'

'আমি বলব না।'

'তা হলে আমরা যাব।'

'আজকের দিনে ওঁরা বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আজই ওঁরা চলে গিয়েছিলেন কিনা, বাবুকে ছেড়ে দিয়ে।'

'কারা?'

'বাবুর স্ত্রী আর তুলি দিদিমণি।'

'তুলি দিদিমণি?'

'বাবুর মেয়ে। ও মাঝে-মাঝেই এখানে আসে। ছোটাছুটি করে, খেলে বেড়ায়। কালও এসেছিল। আপনারা তো নিজের কানে শুনেছেন।'

'ওটা তোমার কারসাজি। বানানো।'

'না, না, না,' বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল হরিপ্রসাদ, খাবারের জায়গাগুলো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে।

রাত যত বাড়তে লাগল আমাদের উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার পারদও চড়তে লাগল ক্রমাগত। বাবাই আর কৌশিকের উত্তেজনার মাত্রাটা যেন কিছুটা বেশিই। নিজেদের সঙ্গেই বোধ হয় কী একটা লড়াই চলছে ওদের মনে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। বাইরে অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও জমাট। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় লণ্ঠনের আলো কেঁপে-কেঁপে উঠছে। আর সেই কাঁপনে ঘরের দেওয়ালে আমাদের তিনজনের আবছা ছায়াও কেঁপে-কেঁপে উঠছে এমনভাবে যে, নিজেরাই যেন আচমকা

শিউরে-শিউরে উঠছি মাঝে-মাঝে। এভাবেই অপেক্ষায় আর উৎকণ্ঠায় পার হয়ে গেল দু'-তিন প্রহর। ক্রমশ ঘুম নামতে চাইল চোখের পাতায়। আমরাও ভাবছি বিছানায় গা এলিয়ে দেব কি না, এমন সময় রাতের নিথর নীরবতাকে খানখান করে ভেঙে দিয়ে সমস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল তিন-চারটে কুকুর। সে চিৎকার এমনই তীব্র আর এমনই ভয়ানক যে, আমরা তিনজনই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম বিছানা থেকে নেমে। আর তারপরই কুকুরের সেই তীব্র ভয়ংকর কান্নার রোল বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই শুরু হল সেই অপার্থিব পদধ্বনি। মৃদু অথচ স্পষ্ট। ঝুম, ঝুম, ঝুম, ঝুম। আমাদের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় দু'-একবার হালকা পদচারণার পর সেই শব্দ ক্রমশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল উপরে। আরও উপরে।

মুহূর্তে কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল সমগ্র প্রকৃতি। হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে গুমোট হয়ে উঠল ঘরের মধ্যেটাও। এমনকী, বাইরে তিরতির করে বয়ে চলা নদীটাও যেন ভয়ে গুটিয়ে নিল তার জলস্রোত। সমগ্র চরাচরে ওই একটানা ঝুম-ঝুম আওয়াজ ছাড়া যেন শব্দ নেই আর।

নিজের ব্যাগ খুলে একটা টর্চ হাতে নিয়ে চকিতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল কৌশিক। পিছন-পিছন আমি আর বাবাই।

সিঁড়ির উপর টর্চের আলো ফেলল কৌশিক। কেউ নেই সেখানে। অথচ সেই ঝুম-ঝুম আওয়াজের কোনও বিরতি নেই। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকি আমরা। দোতলায় উঠে অবনীবাবুর ঘরের দিকেও চোখ বোলাই একবার। ঘর বন্ধ। কোনও শব্দ নেই বন্ধ ঘরের ওপারে। অবনীবাবু কি ঘুমোচ্ছেন? কত কিছু ঘটে যাচ্ছে এখানে, তার কিছুই কি আঁচ করতে পারছেন না তিনি? বাবাই হঠাৎ একটা আলতো চাপ দেয় আমার কাঁধে। আমি দাঁড়াই। শব্দ শুনি। সেই নূপুরপরা পা দু'খানা এখন খেলে বেড়াচ্ছে ছাদের উপর। আমরা ছাদের কাছাকাছি পৌঁছতেই একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ছিটকে এল উপর থেকে 'তুলি, তুলি শিগগির এসো।'

আমরা ছাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা ভেজানো। খিল দেওয়া নেই তাতে। একটা দরজা ফাঁক করে আমরা চোখ রাখলাম ছাদে। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। জোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাদ। আর সেই জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখলাম আমরা একটা ছোট্ট মেয়েকে। পায়ে তার মল। পরনে লাল টুকটুকে ফ্রক। সে খেলছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। হঠাৎ আর-একজন মহিলা মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে ধমক লাগালেন তাঁকে, 'তুলি, দুষ্টুমি নয়, বাবা বকবেন।'

'কোথায় বাবা?' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল তুলি।

'এই তো আমি এসে গেছি মামণি,' বলে যে লোকটি তুলির সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে আমরা তিনজনই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ইনি তো অবনীবাবু। অথচ এ কী করে সম্ভব। তিনি যে প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত রোগজীর্ণ মানুষ। তুলি ছুটছে। ঝুমঝুম করে বাজছে তার পায়ের নূপুর। অবনীবাবুও ছুটছেন, তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে। ছুটতে-ছুটতে তুলি এখন ছাদের কিনারে।' অবনীবাবুও দাঁড়াচ্ছেন না। কী সর্বনাশ, পড়ে যাবেন যে উনি ছাদের আলসে পেরিয়ে। সব ভুলে চিৎকার করে উঠলাম আমরা একসঙ্গে, 'অবনীজেঠু।'

মুহূর্তে থেমে গেল দৌড়। তুলিকে বুকে চেপে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলেন অবনীবাবু। আর সেই মহিলা হা, হা, হা, হা করে হাসতে-হাসতে মুখ ফেরালেন আমাদের দিকে। ওঃ কী বীভৎস সেই দৃষ্টি! কী ভীষণ কুৎসিত পচা-গলা আগুনে ঝলসানো সেই মুখাবয়ব। প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করতে-করতে দুদ্দাড় করে নীচে নেমে আমরা অবনীবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়াই। দম নিই বুক ভরে। বাবাই টোকা মারে দরজায়। দরজা খুলে যায় খটাং করে আওয়াজ তুলে পাল্লায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরও ঘাবড়ে যাই আমরা। পুবের আকাশ থেকে ছিটকে আসা হালকা গোলাপি আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মস্ত খাটে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে শুয়ে আছেন অবনীজেঠু। চোখ বোজা। মুখের ভাব প্রশান্ত। এমনকি, ঠোঁটের কোণে একটা হালকা হাসির ছোঁয়াও লেগে রয়েছে যেন। দিশেহারা হয়ে চিৎকার করতে থাকি আমরা, 'হরিদা, হরিদা।' হাঁকাহাঁকিতে একটু পরেই দৌড়ে আসে হরিপ্রসাদ। আমাদের হাত ধরে এনে বসায় নীচের ঘরে। ভিতরের আলো আর-একটু উজ্জ্বল হতেই মধুডাক্তারকে ডেকে আনে হরিদা। মধুডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রায় দেন, অবনীজেঠুর মৃত্যু হয়েছে অন্তত ছ'সাত ঘণ্টা আগে।

ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসার সময় হরিদা সামনে এসে দাঁড়ায়। বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'সুপ্রিয়কে খবরটা দিও।'

আমরা বলি, 'নিশ্চয়ই।'

হরিদা আরও বলে, 'সময়-সুযোগ পেলে আসবে আবার—আমি তো রইলুম।'

হরিদার বলা সবক'টা কথাই কানে গিয়েছিল। কিন্তু এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি আমাদের কারও।

হারায় না কিচ্ছুটি



ভূতের অস্তিত্বের কথা সেই ছোট্টবেলা থেকেই বিস্তর শুনেছি আমি। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি মন থেকে। তাদের সম্পর্কে মনের মধ্যে ভয়ের ভাবটাও তৈরি হয়নি একটুও। অথচ, সত্যি বলতে কি, আমি অবিশ্বাসী নই। বরং মনে প্রাণে চেয়েছি, তারা যে আছে এই সত্যটা প্রকাশ হোক আমার কাছে। কিন্তু বার বার এই সংশয়ে ভুগেছি, আমাদের আশেপাশে তারা যদি থাকবেই, আমি তাদের দেখতে পাই না কেন? আর যারা আছে কিনা তাই জানি না নিশ্চিত করে, তাদেরকে খামোখা ভয় পেতেই বা যাব কেন বোকার মতন? কাজেই ভূতের ভয়ে আমি ভীত নই। অন্তত নিজের সম্পর্কে তেমনই ধারনা ছিল আমার এতদিন। সেই ইস্কুলে পড়ার বয়েস থেকেই শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি রাতে, দুপুরে। ঝিমধরা বিকেলে স্থির হয়ে বসে থেকেছি বড় বড় পুরনো গাছের ছায়ায় মাখামাখি হয়ে থাকা গোরস্থানের মধ্যে। কোনোদিন গা ছমছমটুকুও টের পাইনি।

মা বলতেন আমি নাকি বড় হয়ে ডাকাত হব। তাই আমার অমন দামালে স্বভাব। কেন যে ওই বয়েস থেকে অমন শ্মশান, গোরস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি একা একা, সে কথা কাউকে বলিনি। এমনকি আমার মা-কেও নয়। আমি ভূত খুঁজে বেড়াতাম। ভাবতাম যদি দেখতে পাই তাদের কাউকে, তাহলে নিশ্চিত হতে পারি যে মৃত্যুতে সত্যিই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরেও একটা জগত আছে যেখানে চলে যাওয়া মানুষেরা থেকে যান। আর তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চিত বাবার সঙ্গেও কোনো না কোনোদিন আমার দেখা হবে এই আশাটাকে বাঁচিয়ে রেখে বেঁচে থাকা যাবে আরো অনেকগুলো দিন।

আমার বাবা ছিলেন না। মায়ের কাছে শুনেছি আমার যখন বছর দেড়েক বয়েস তখনই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি চিরদিনের জন্যে। ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা বাবার বাঁধানো ছবিটা দেখলেই বাবার জন্যে আমার বুকের মধ্যিখানটায় চিন চিন করত। ভূত বলে যদি কিছু থাকতই, আমার বিশ্বাস বাবার সঙ্গে একবার না একবার ঠিক দেখা হয়ে যেত আমার সেই বয়েসে।

আমি বরং মানুষকে ভয় পেতাম। প্রাণপনে এড়িয়ে চলতাম মানুষের সঙ্গ। আমার বন্ধু ছিল না। মানে আমি নিজেই কাউকেই বন্ধু করিনি ইচ্ছে করে। আমার একা থাকতে ভালো লাগত। আমি একা থাকা অভ্যাস করেছিলাম প্রাণপনে।

এই কথাটা আমাকে বলেছিল কালীক্ষ্যাপা তান্ত্রিক। বড়দের মুখে শুনেছিলাম, লোকটার নাকি বেজায় সাধন ক্ষমতা। ভূত-প্রেত নাকি মেনি বেড়ালের মতন তার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত রাত দিন। লোকটার সন্ধানে খিরিশতলার শ্মশানে হাজির হয়েছিলাম এক সন্ধেয়। আমাকে দেখে লাল চোখ কুঁচকে লোকটা তাকিয়েছিল খানিক। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিল, 'তুই এই সময়ে এখানে কেন? কার সঙ্গে এয়েচিস?'

'একা এসেছি'। উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার সঙ্গে?' অবাক হয়ে গিয়েছিল কালী তান্ত্রিক।

'হ্যাঁ।'

'আমাকে তুই ভয় পাস না?'

'না'।

'ভূতেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এ কথা জানিস?'

'শুনেছি।'

'তুই ভূতে ভয় পাস না?'

'উঁহু', মাথা নাড়ি আমি, 'আমি ভূত দেখতে চাই।'

'কেন দেখতে চাস?'

আমি সেই একবার আমার মনের কথাটা বলেছিলাম যে কথা কাউকে বলিনি। বলেছিলাম বাবাকে দেখার জন্যে আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে থাকা আকুলি-বিকুলি কষ্টটার কথা। সব শুনে কালী তান্ত্রিকের কড়া চাউনিও কেমন যেন নরম হয়ে গিয়েছিল। আমার মাথায় হাত রেখে লোকটা বলেছিল, 'তাদের কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায় রে বোকা? তাদের দেখার জন্যে দৃষ্টিকে আরো অনেক সূক্ষ্ম করতে হয়।

'কী করে তা করতে হয়?' আমি জিগ্যেস করেছিলাম।

'সে তুই পারবি না', কালী তান্ত্রিক মাথা নেড়ে হেসেছিল, 'সে খুব কঠিন কাজ। নিজেকে ভিড় থেকে সরিয়ে রেখে একা থাকার সাধনা করতে হবে প্রাণপনে।'

মুখে কিছু বলিনি সেদিন। কিন্তু মনে মনে বলেছিলাম, 'পারব। পারতে আমাকে হবেই। বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে যে কোনো কঠিন কাজ করতে রাজি আছি আমি।'

ছোটবেলায় একলা সার্কাসের মাঠের ঘাসের ওপরে গ্রীষ্মের রাতে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অজস্র তারার ভিড়ের মধ্যে আমি আমার বাবাকে খুঁজে বেড়াতাম। এই খেলাটা আমার খুব প্রিয় ছিল। রান্নাবান্নার শেষে মা এসে মাঠ থেকে বাড়ি নিয়ে যেতেন আমাকে। মাঝে মাঝে বকাও দিতেন, 'ভূত-পেত্নীর ভয় নাই বা পেলি, কিন্তু মাঠে-ঘাটে এমনি করে যে শুয়ে পড়ে থাকিস, সাপখোপের ভয়ও কি নেই তোর?'

আমার ভয় করত না। সত্যিই আমার ভয় করত না। ভয়ই বোধহয় মনে মনে ভয় পেত আমাকে। সে আমার থেকে তফাতে সরে থাকতে চাইত প্রাণপনে।

আমার মা যখন মারা গেলেন আমি তখন কলেজে পড়ি। থার্ড ইয়ার। গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়েছে। সাম্মানিক ডিগ্রি পাবার পরীক্ষাটুকু বাকি। তখন এমনই নিয়ম ছিল। এই নিয়ম বদলে গেছে এখন।

আমার বাবা আর্থিক দিক থেকে খুব স্বচ্ছল ছিলেন না। আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। বাবা মারা যাবার পরে মা আমাকে নিয়ে এসে উঠেছিলেন আমার মামার বাড়িতে। মামার বাড়িতে আমার আদরের অভাব ছিল না, তবু আমি নিজেই চেয়েছিলাম ওখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে। মনে হয়েছিল আমার ভাগ্যই যখন বার বার চেয়েছে আমি একা হয়ে যাই, তখন সকলকে জড়িয়ে বেঁচে লাভ কী?

আত্মীয়স্বজন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইনি বলে স্কুলের চাকরিটা ইচ্ছে করেই শহর থেকে অনেক দূরে নিয়েছিলাম। একটা প্রান্তিক গ্রামে। চওড়া পিচ রাস্তায় সারাদিন ভারী গাড়ির দাপাদাপি ছিল না সেখানে। বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে উঠত না সেখানকার রাত। বরং গাছপালা, বাগানে ঢাকা ছিল সেই গ্রাম। পুকুর ছিল। নদীও ছিল একখানা গ্রামের প্রান্তে। জোয়ার ভাঁটা না খেললেও প্রায় সারা বছরই সেই নদীতে জল থাকত। তালের ডিঙিতে চেপে চরাচর অস্বচ্ছ করে দেওয়া সন্ধ্যায় একা একা আমি সে নদী পারাপার করেছি বহুবার। নদীর পাড়েই, যেখানে মস্ত বটগাছটা আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে, সেইখানেই শ্মশান। আমি সেখানেও যাতায়াত করতাম নিয়মিতই।

আমি স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম। নিজে বেছে নিয়েছিলাম এই স্কুল। প্রথম যেদিন স্কুলে এসেছিলাম চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে, হেডমাস্টারমশাই অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'অতদূর থেকে এই গন্ডগ্রামের স্কুলে এসেছেন আপনি চাকরি করতে! পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক কি একেবারেই শেষের দিকে হয়েছিল?'

'উঁহু', দুদিকে মাথা নেড়ে আমি হেসেছিলাম, 'আমার নাম এক্কেবারে প্রথম দিকেই ছিল। আমি ইচ্ছে করেই এখানে এসেছি। আমি চেনা মানুষের থেকে দূরে পালাতে চেয়েছিলাম।'

হেডমাস্টারমশাই অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এরপর আমাকে অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন তিনি। কিন্তু আমাকে স্বস্তি দিয়ে সে পথে একেবারেই তিনি হাঁটলেন না। একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু জিগ্যেস করলেন, 'এখানে থাকবেন তো, নাকি দু-এক বছরের মধ্যে আবার পরীক্ষা দিয়ে পালাবেন এখান থেকে?'

'যাব না। কোত্থাও যাব না আর', আমি আশ্বস্ত করেছিলাম তাঁকে, 'শুধু এখানে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিন আমাকে অনুগ্রহ করে।'

'যতদিন না নিজের একখানা আস্তানা বানাতে পারছেন, আমার বাড়িতেই থেকে যান না', খুব আন্তরিক গলায় বলেছিলেন তিনি। 'আমরা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। বনেদি পরিবার। পৈতৃক বাড়িটা বলতে গেলে ফাঁকাই পড়ে আছে। থাকুন না তারই একখানা ঘর আগলে।'

'না', আমি সবিনয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, 'আমি একা থাকতে চাই। এক্কেবারে একা। নিঃসঙ্গ। আমার জীবন তাই দিতে চেয়েছে আমায়'।

'বেশ', তিনি অবাক চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমি দেখছি। আপনার মনের মতন একখানা বাসা আমি ঠিক যোগাড় করে দেব। যে ক'দিন না পাই সেই ক'টাদিন অন্তত আমার বাড়িতে থাকুন। দেখুন, আমার বাড়িটাও আপনার পছন্দ হয়ে যেতে পারে। সত্যি বলতে কি, বাড়িটার একদিক থেকে অন্য দিকে গেলে মনে হয় অন্য একটা পৃথিবীতেই পৌঁছে গেছি সম্ভবত।'

উপায় ছিল না আর। আমি তাঁর প্রস্তাবেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত।

স্কুলের ছুটির ঘন্টা বাজার পরে আরো কিছুক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপরে হেডমাস্টারমশাই সঙ্গে করে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। মস্ত বাড়ি। যদিও বাড়ির

অনেকখানিই এখন ভগ্নস্তূপ হয়ে আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনারা কি জমিদার-টমিদার ছিলেন নাকি এককালে?'

'ছিলাম।' হেডমাস্টারমশাই, যাঁর নাম জেনে ফেলেছি ততক্ষনে, শ্রী শশিভূষণ হালদার বললেন একগাল হেসে, 'তবে এখন তালপুকুরে ঘটিটুকুনিও আর ডোবে না...'

আমি সদর দরজা পেরিয়ে অন্দরমহলে ঢুকতেই চারকোনা উঠোনের একধারে একখানা ঘর চোখে পড়ল। ঘরের সামনেই দু-খানা মস্ত চাঁপা গাছ। ঘরের পাশ দিয়ে পায়ে চলা সরু রাস্তা চলে গেছে পিছনের পুকুরের দিকে। কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম পুকুরের সামনে বাঁধানো ঘাট রয়েছে, ঘাটের দু-ধারেই বসার জায়গা আছে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু যেভাবে আগাছায় ভরে আছে জায়গাটা, তাতে এই পুকুর কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হল না। পুকুর বেড় দিয়ে ঠিক ওদিকে আর একটা কোঠাঘর। বেশ উঁচু। জানলা নেই সেই ঘরে। সে বাড়ির ছাদ ফাটিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে একটা মস্ত পাকুড় গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে পুকুরের পানার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জলের দিকে চেয়ে। এই জায়গাটা কেন কে জানে, মনে হচ্ছিল আমাকে যেন কেমন টানছিল। ইচ্ছে করছিল সান বাঁধানো ঘাটে বসে বাড়িটাকে আরো কিছুক্ষন দেখি।

শশীবাবু আমার হাত ধরে টান দিলেন, 'চলে আসুন।'

'জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগছে', আমি সম্মোহিতের মতন বলে উঠি। 'আর একটু থাকি না এখানে?'

'না', শশীবাবু দৃঢ় গলায় বললেন, 'এদিকটা দ্রুত পেরিয়ে যাই চলুন। এ জায়গাটা ভালো না। এদিকে আসে না কেউ। আপনিও আসবেন না এদিকে।'

'কেন?' আমি অবাক হয়ে বলি।

'বললামই তো, বাড়ির এইদিকটা ভালো নয়। এটা অভিশপ্ত এলাকা। আমরা সকলে প্রাণপনে এড়িয়ে চলি বাড়ির এই অংশটা।'

'পুকুরের ওই পারের ভাঙা ঘরটা অমন অদ্ভুত জানলাবিহীন কেন? কী কাজে লাগত ওই জঙ্গলে মোড়া ঘরটা?' আবার জিগ্যেস করি আমি কৌতূহলী গলায়।

'জমিদারদের সব কাজই যে ভালো ছিল এমনটা তো নয়'—পুকুরের দিক থেকে চৌকো উঠোনের দিকে ফিরে এলেন শশিভূষণ, 'তাদের জীবনচর্চায় কিছু মন্দ কাজও ছিল...'

'যেমন?'

'ওটা ছিল গুমঘর। বহু অবাধ্য প্রজাকে গুমখুন করা হয়েছিল ওখানে। তাদের অতৃপ্ত আত্মারা এখনও ঘোরাঘুরি করে মহল্লার এই দিকটায়। কাজেই বাড়ির এই দিকটা পরিত্যক্ত। এ দিকে কেউ থাকে না। আসেও না। আমি বাড়ির এইদিকে আপনাকে নিয়ে এলাম এই কারণেই। আপনাকে সাবধান করে দিতে যে ভুলেও ভবিষ্যতে যেন বাড়ির এই অংশে চলে আসবেন না আপনি। চলুন, এবার ভেতরে যাই। এবার যেদিকটায় যাব, সেইদিকটা বাসযোগ্য তো বটেই, নিরাপদও। এই বাড়ির যে কজন শরিক এখনও এই গ্রামে পড়ে আছি তারা বাড়ির ওই দিকটাতেই থাকি গা ঘেঁষাঘেঁষি

করে। ক্রমে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে আপনার। বাড়ি থেকে এত দূরে এসে ওদের এই সঙ্গ ভালোই লাগবে আপনার দেখবেন...' খুব আন্তরিক গলায় বললেন শশীবাবু।

'না, আমি সঙ্গ চাই না কারো। সত্যিই চাই না', মাথা নেড়ে নীচু গলায় আমি বলি। 'আমি যদি এ বাড়িতে থাকি তাহলে এই ঘরটায় থাকব', বলে চাঁপা গাছের ওইদিকের বন্ধ ঘরটার দিকে আঙুল তুলি আমি। 'ওই ঘরটা ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।'

'না না তা কেমন করে হবে?' শশীবাবু আপত্তি করে উঠলেন তীব্রস্বরে, 'জেনেশুনে আপনাকে আমি হেমবাবুর ঘরে একলা রেখে দিতে পারব না। আপনাকে এখানে রেখে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যেতে পারব না কিছুতেই'।

'হেমবাবু কে?' আমি অবাক হয়ে বলি।

'এ বাড়ির মেজোকর্তা। আমার মেজ জেঠু', শশীবাবু মৃদু হাসলেন। 'আপনারই মতন একা থাকতেই পছন্দ করেছেন সারাজীবন। একগুঁয়ে জেদি মানুষ ছিলেন, কিন্তু খুব শৌখিন। বিয়ে থা করেননি। এই ঘরেই থাকতেন। স্বপাক খেতেন আজীবন। কারো সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা একদম পছন্দ করতেন না। এ ঘরটাকে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। আসলে এটা একটা কমপ্লিট অ্যাপার্টমেন্ট। মস্ত শোবার ঘর। ফার্নিশড। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ এন্ড কিচেন। মেজজেঠু বছর চারেক হল মারা গেছেন। তবু আমরা এই ঘরটাকে সাফসুতরো এবং বাসযোগ্য করে রেখেছি যত্ন করে। কেননা আমাদের বিশ্বাস উনি এখানেই থাকেন এখনও।'

'এমন অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ?' একটু বিরক্ত হয়েই আমি জিজ্ঞেস করি, 'তাঁকে কি দেখেছেন একবারও মৃত্যুর পরে?'

মনে মনে আমি চাইছিলাম শশীবাবু 'হ্যাঁ' বলুন। কিন্তু তিনি দু-দিকে মাথা দোলালেন কয়েকবার, 'না দেখিনি। তবে...'

'তবে?' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলি।

'মেজজেঠু মার্গসঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন খুব। গভীর রাতে এই ঘরে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে চুপটি করে তিনি গ্রামোফোনে গান শুনতেন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, মাঝেমধ্যে কোনো কোনো জ্যোৎস্নামাখা মধ্যরাতে এই ঘর থেকে সেই অদ্ভুত গানের সুর এখনও ভেতর বাড়ি অব্দি পৌঁছে যায়...'

'আপনার বাড়িতে ডেকে এনে কেন শুধুশুধু আমাকে ভূতের গল্প শোনাচ্ছেন স্যার?' আমি কষ্ট করে গলাটাকে নম্র রাখলাম, 'আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। আসলে ছোটবেলা থেকে এ ধরনের গপ্প এত শুনেছি...'

'তবু ব্যাপারটা সত্যি', শশিভূষণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন।

'সত্যি হলেও আমার অসুবিধে নেই কিছু। মানুষের থেকে ভূতের সঙ্গ আমার কাছে বেশি সহনীয়। আপনাদের খুব কিছু পারিবারিক আপত্তির যায়গা না থাকলে আমি এই ঘরেই থাকব। আর হ্যাঁ, হেমবাবুর মতন আমিও আমার রান্না নিজে করে নেব।'

'বেশ তাই। কী আর বলব আপনাকে। একান্তই যখন কথা শুনবেন না...'

'আর ভাড়ার ব্যাপারটা...'

'ছি ছি ছি ছি' জিভ বের করে শশীবাবু দু-হাত আমার দু-কাঁধে রাখেন, 'এতক্ষন যতই আপনি আজ্ঞে করি না কেন তুমি ভাই আমার চেয়ে ঢের ঢের ছোট। জয়ন্ত, তুমি আমার ছোট্ট ভাইটির মতনই এই বাড়িতে থেকে যেও যদ্দিন ইচ্ছে। আর আমাকে দাদার মতনই দেখো...'

শশীবাবুর কথায় কৃত্রিমতা ছিল না একটুও। আমি বেশ বুঝতে পারলাম। মানুষটার আন্তরিকতা আমাকে ছুঁয়ে দিচ্ছিল ভিতর থেকে। এমন মানুষের সঙ্গ খুব বেশি পাইনি জীবনে। আমার ভয় করছিল এমন সব মানুষ আশপাশে বেশি জুটে গেলে আমার একাকীত্বের তপস্যায় না বিঘ্ন ঘটে যায় আবার। আমি জানি মানুষের সঙ্গ ভালোবেসে ফেললে বিপদের অন্ত নেই। মানুষের জীবন খুব ক্ষনস্থায়ী। কাচের মতন ভঙ্গুর। এই পৃথিবীর মায়া কাটাতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না তার। কাজেই সেই চিরঅনন্তযাত্রী মানুষকে বোকার মতন বেজায় ভালোবেসে জড়িয়ে পড়লে কষ্টের আর অন্ত থাকে না। মা-বাবা এই দুজন ভালোবাসার মানুষকেই আমি অকালে হারিয়েছি। আমি অহেতুক জীবনে আর নতুন কোনো কষ্ট ডেকে আনতে চাই না।

২

স্কুলে শিক্ষকমন্ডলীকক্ষে আমি একধারে চুপটি করে বসে থাকতাম। প্রথম দু- তিনদিন অন্য মাস্টারমশাইরা আমার সঙ্গে ভাব জমানোর খুব চেষ্টা করেছিলেন। আমি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথায় আমার আগ্রহ নেই একটুও। এখন আমাকে নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেন। নীচু গলায় আমার মানসিক সুস্থতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমি বুঝতে পারি। আমি শুনতে পাই। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না আমার মধ্যে। ছাত্ররাও আমার থেকে দূরে-দূরেই থাকা নিরাপদ মনে করে।

একসপ্তাহের মধ্যেই আমি স্কুলে পাগলস্যার নামে পরিচিত হয়ে গেলাম। আমার তাতে অসুবিধে ছিল না কোনো। দিব্বি নিজের মতন থাকতাম। স্কুল করতাম। শ্মশানে নদীতে ঘুরে বেড়াতাম। একা একা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতাম গ্রামের ধুলো ওড়া পথে পথে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই প্রথম সাত দিনের মধ্যে শশীবাবুর বাড়িতে হালদারবাড়ির মেজকত্তার ঘরে কোনো অসুবিধেই হল না আমার। ঘরটা সাজানো গোছানো। পেল্লায় পালঙ্ক, কাঠের টেবিল চেয়ার, বইয়ের আলমারি, পুরোনো দিনের নানান রেকর্ড দিয়ে সাজানো ঘরটাকে রাজকীয়ই বলা চলে। আর সেই ঘরে ছিল একটা দোল খাওয়া ইজি চেয়ার। একমাত্র ওই চেয়ারটার দিকে চোখ পড়ে গেলেই আমার কেমন যেন মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি হত। মনে হত কে যেন বসে আছে ওই চেয়ারে। মাঝে মাঝে আপনা আপনি চেয়ারটা দুলেও উঠত বেখাপ্পাভাবে। অন্য কেউ হলে এতে ভয় পেয়েই যেত হয়তো, কিন্তু ওই অস্বস্তিটুকু

ছাড়া আমার তেমন কিছু অসুবিধে হয়নি। বরং যত দিন যাচ্ছিল মনে মনে আমি বেশ আশাবাদীই হয়ে উঠছিলাম।

প্রথম সমস্যাটা টের পেলাম সপ্তাখানেক বাদেই। মনে হল রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে কে যেন পায়চারি করছে। আবছা অবয়ব, তবু বোঝা যায়। আমি দু-বার কে কে বলে উঠতেই আবছা চেহারাটা মিলিয়ে গেল। তারপরেই দোল খাওয়া ইজি চেয়ারটা দুলতে শুরু করল। মনে হল কেউ বসেছে ওটায়। বাইরের চাঁপা গাছ থেকে তখনই কী একটা পাখি ডেকে উঠল বিশ্রী শব্দ করে। অন্য কেউ হলে হয়ত ভিরমি খেত সেদিন, কিন্তু মিথ্যে কথা বলব না, আমি মনে মনে খানিক আনন্দই পেলাম।

এর পরের ঘটনা আরো দিন কয়েক হেমবাবুর ঘরে কাটানোর পর। সেদিন পূর্ণিমা ছিল বোধহয়। বাইরে চাঁদের আলো চাঁপা গাছের পাতার আড়াল থেকে গড়িয়ে নীচের উঠোনে এসে নামছে তখন। বাতাস দিচ্ছিল। সেই বাতাসে গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে ফিসফিস করে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। আর ফুলেরা বাতাসে গন্ধ ঢেলে দিচ্ছিল পাপড়ি থেকে। আমার অকারণ মন খারাপ লাগছিল সেদিন। রাতে রান্না করতে ইচ্ছে করল না। পেট ভরে জল খেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে পালঙ্কের ওপরে আড় হয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি।

হঠাৎ একটা হাল্কা খুট করে আওয়াজ হতেই আমি ফিরে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম, গ্রামোফোনে কে জানি রেকর্ড চাপিয়েছে একখানা। তারপর রেকর্ড ঘুরতে শুরু করল। খুব মৃদু স্বরে একটা বাজনা শুরু হল। সম্ভবত শরোদ। আমি নিশ্চিত ছিলাম না। গান বাজনার সমঝদার শ্রোতা কোনোকালেই ছিলাম না আমি। আমার ভাবনার রেশ ধরেই কানের কাছে ঠিক সেইসময়ে কে বলে উঠল ফিসফিস করে, 'হ্যাঁ শরোদ। এটা মধ্যরাতের রাগ। দরবারি...বড় প্রিয় রাগ আমার...বাইরে জ্যোৎস্না উঠলে রাত বারোটা থেকে আমি শুনি... এতদিন শুনছি, তবু পুরনো হচ্ছে না কিছুতেই...'

আমি চমকে সোজা হয়ে উঠে বসলাম। জানালার গরাদ গলে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অবাধে। সেই আলোয় ঘরের মধ্যের সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি ছাড়া ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কাউকে চোখে পড়ল না আমার। সেই অপার্থিব জ্যোৎস্নায় দরবারি কানাড়ার সুর মিশে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে রাখা ইজিচেয়ারটা দুলে যাচ্ছে ক্রমাগত। নির্দিষ্ট ছন্দে। জীবনে এই প্রথম আমার গা শিরশির করে উঠল। কাঁটা দিয়ে উঠল গায়ে। বুঝতে পারছি বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে আমার পিঠে। তবু এক আশ্চর্য আনন্দের শিহরন খেলে গেল আমার মনে। তবে সত্যিই তো তাঁরা আছেন। তাঁদের অস্তিত্বের কথা তো মিথ্যে মনে হচ্ছে না আর। ভাবতে ভাবতেই বুঝলাম ওই ঘরের মধ্যে থাকাটা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে আমার কাছে।

মানুষহীন চেয়ারের যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে ক্রমাগত সমঝদারি দোল খাওয়ার দৃশ্য জীবনে প্রথমবার খানিক ভয় পাইয়ে দিল আমাকে। আর তখনই বুঝলাম সঠিক কারণে ভয় পাওয়ায় আমার মনে কী অপার্থিব আনন্দের ঢেউ উঠতে পারে। আমি দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। চাঁপা গাছের পাশ দিয়ে ঘরের পিছনের সান বাঁধানো পুকুরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুকুরের ও পাশের গুমঘরটা

চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে গেল আমার। কিছুতেই ওই পুরনো জীর্ন বাড়িটা থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারছি না মনে হল। আমার মাথার মধ্যে ফিস ফিস করে কে যেন ডাকতে লাগল বার বার, 'আয়, আয়, আয় আয়...'

নিজের অজান্তেই আমি অস্ফুটে বলে উঠলাম, 'যাব। আমি যেতে চাই...'

আর তখনই আমার কোমরের কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সত্যিই যাবে তুমি?'

তাকিয়ে দেখি একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে একটা ছোট্ট ছেলে দু-চোখে কৌতূক নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। আমি চোখ নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'যাব'।

'চলো তবে', ছেলেটার মুখে হাসি ফুটে উঠল। একটা অদ্ভুত, ধারালো হাসি।

'ঠিক কোথায় যেতে হবে আমাকে?' সম্মোহিতের মতন জিগ্যেস করি।

'ওই যে পুকুরের ওইদিকের বাড়িটা', ছেলেটা তার শীর্ণ হাত তুলে গুমঘরের দিকে দেখালো আমাকে। 'ওই বাড়িটার মধ্যে অতীত আটকে আছে। সেই অতীতে তুমি যেতে চাও?'

'অতীত কি চোখের সামনে সত্যিই দেখা যায়?' বোকার মতন বলে ফেলি আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠল ছেলেটা। তার হাসিতে আমি কেঁপে উঠলাম। সে আমার হাত ধরল। কী অসম্ভব ঠান্ডা তার হাত। তার স্পর্শে আমার শীত করে উঠল। ছেলেটা বলে চলেছে, 'ওই বাড়িতে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছিল। আরো অনেককে। আর আমাকে আছড়ে মেরে ফেলা হয়েছিল এইখানেই। এই সানের ঘাটের পাথরের চাতালে। তারপর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আমার রক্তমাখা ছোট্ট শরীরটা ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল এই পুকুরের জলে...'

ছেলেটার কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। তবু সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলে উঠলাম, 'তুমি তো তবু চোখের সামনে তোমার বাবাকে দেখতে পাও। কিন্তু আমি...শুধুমাত্র তাঁকে দেখতে পাব এই আশাতেই জেনেশুনে এই বাড়িতে, এই ঘরে... আচ্ছা ওই গুমঘরে গেলে আমিও কি আমার বাবাকে দেখতে পাব?'

'তা কি দেখা যায়? এই ব্যাপ্ত তরঙ্গ জগতের কোথায় কীভাবে মিশে আছেন তিনি তা জানবে কেমন করে?' ভারি গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে তাকিয়ে সেই সম্ভ্রান্ত চেহারার দীর্ঘদেহী মানুষটাকে দেখতে পেলাম। আমাকে ফিরে তাকাতে দেখে তিনি হাসলেন, 'আমি হেমকান্ত। তুমি আমারই অতিথি হয়ে আমার ঘরে বাস করছ আপাতত। তোমাকে বাঁচানো আমার কর্তব্য জয়ন্ত। তাই কালের গর্ভ থেকে এই অস্থায়ী শরীর তৈরি করে আমি ছুটে এলাম। এই ছেলেটির শরীরও অস্থায়ী। আমরা কেউ আর নেই। এই জীবনের জগত থেকে অনেক দূরে চলে গেছি আমরা। কিন্তু গিয়েও সত্যিকারের যেতে পারছি কই বলো...আমাদের তরঙ্গ দিয়ে এই মহাবিশ্বের তরঙ্গকে ছুঁতে পারছি বটে, কিন্তু মিশে যেতে পারছি না তার সঙ্গে কিছুতেই। আমরা আসলে একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গমন্ডলে বন্দী হয়ে আছি জয়ন্ত। আমাদের মুক্তি নেই। ও তোমাকে সেই বন্দীত্বের দিকেই নিয়ে যেতে চাইছিল হাত ধরে। তুমি নিজেও সেই বন্দীত্বের সাধনাই করে এসেছ এতদিন ধরে। আমারই মতন। সেই

সাধনা একাকীত্বের সাধনা। জীবনের আলোস্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সাধনা। তোমার কাছে এখনও সুযোগ আছে। তুমি বিরুদ্ধতরঙ্গ দিয়ে এই ক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে বৃহৎ জগতের মধ্যে মিশে যাও...এই বিরাট আলোজগতের হাজারো সৎকাজের মধ্যে ছড়িয়ে দাও নিজেকে। তোমার ছড়িয়ে যাওয়ার স্রোতে ভেসে গিয়ে আমরাও যেন মুক্তির পথ দেখতে পাই একদিন...'

'আমি পারব?' কেমন ঘোর লাগা গলায় বলি আমি।

'নিশ্চয়ই পারবে। পারতে যে তোমাকে হবেই ভাই। জগতের শুভকাজের হাজারো আলোকতরঙ্গে নিজেকে যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারো তবে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে কী করে তোমার? তিনিও যে আলোপথে ভাসিয়েছিলেন নিজেকে...'

'বাবার সঙ্গে তাহলে আমার আবার দেখা হবে বলছেন?'

'আলবাত হবে'।

'তিনি সত্যিই আছেন? চিরদিনের মতন হারিয়ে যাননি তাহলে?'

'বোকা ছেলে', হেমকান্ত এগিয়ে এসে আমার কাঁধে তাঁর ভারহীন হাতখানা রাখলেন, 'এ বিশ্বে কিছুই হারিয়ে যায় না ভাই। সমুদ্রে আবহমানকাল ধরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঢেউ উঠছে। সে ঢেউ ভেঙে গিয়ে মিলিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে কি? ওই অনন্ত জলরাশির মধ্যেই যে মিশে থাকে সে ভাই...তেমনই তুমি আমি, তোমার বাবা, এই ছেলেটি, তোমার স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা সকলে, সব্বাই একই স্রোতে মিশে আছি অনাদি কাল থেকে...'

হেমকান্তের কথার মাঝখানেই পুকুরের অপর পারের গুমঘর থেকে সম্মিলিত গোঙানির শব্দ ভেসে এল কানে। আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ও কীসের শব্দ?'

'আশাভঙ্গের বেদনা', ম্লান হাসলেন হেমকান্ত, 'আমি মাত্র চার বছর এই বেদনার শরীক হয়ে আছি এখানে। এরা বহু বছর...'

'কীসের এত বেদনা?' কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করি আমি।

'বন্দীত্বের বেদনা', হেমকান্ত হাসলেন, 'মানুষের লোভ, মানুষের হিংসা, মানুষের অত্যাচারের ঋণাত্মক তরঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল এদের সক্কলের। সেই তরঙ্গের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে এরা এতকাল। প্রতি মাসে পূর্নচন্দ্র ওঠে আকাশে। এরা ভাবে সেই স্নিগ্ধ আলোয় মানুষের লোভ ধুয়ে যাবে। হিংসা ধুয়ে যাবে। ঈর্ষা ধুয়ে যাবে। আর সেই খাঁটি মানুষের ধন্যাত্মক তরঙ্গে ভেসে গিয়ে মুক্তি পাবে এরা। কিন্তু তা আর হয় কই? পূর্ণিমার পর পূর্ণিমা চলে যায়। তেমন মানুষ আর এসে পৌঁছয় না এখানে...'

'ইশ', আপনিই শব্দটা বেরিয়ে আসে আমার মুখ থেকে, 'এমন মানুষ কেউ নেই?'

'আছে। অবশেষে পেয়েছি তাকে এত দিনে।'

'কে সে?'

'তুমি।'

'আমি?'

'আবার কে? এই যে বাবার জন্যে এত ভালোবাসা তোমার বুকের মধ্যে। মায়ের জন্যে চেপে রাখা সত্যিকারের কষ্ট...এই কষ্ট, এই ভালোবাসা ছড়িয়ে দাও সকলের জন্যে। সেই উত্তাল ভালোবাসার ঢেউ সব অশুভ তরঙ্গ ধুয়ে মুছে সরিয়ে দিক। আমরাও মুক্তি পাই এই প্রেতযাপনের হাত থেকে।'

'আমি পারব?' সংশয় আসে আমার মনে।

'পারলে তুমিই পারবে। পারতে তোমাক হবেই', হেমকান্ত ভরসা দিয়ে বলেন আমাকে স্নেহার্দকণ্ঠে।

৩

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমার এখন অসীম ব্যস্ততায় দিন কাটে। স্কুলের বাইরেও গ্রামের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সখ্য আমার। এতদিন মানুষের থেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। এখন মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। বুঝেছি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে থেকে কত সুখ। হেমকান্ত আমাকে সঙ্গীতে আগ্রহী করেছেন। এখন নিজেই আমি গ্রামোফোনে কাকভোরে আহিরভৈরোঁ শুনি। সন্ধেবেলা ইমন, পূরবী। মাঝরাতে কলাবতী, রাগেশ্রী। জ্যোৎস্না উঠলে দরবারি চালিয়ে দিই। আর ঘুম আসে না যেদিন, শেষ রাতে আনন্দভৈরবী। হেমকান্ত খুশি হন। তাঁর নিজের ইজিচেয়ারে এসে বসেন অবয়বহীন। চেয়ারের হাতলে তাল দেন। তাঁর অদৃশ্য দুই হাতের তালে তালে দুলে দুলে ওঠে সেই চেয়ারটি। চোখের সামনে না থেকেও কী প্রবল ভাবে তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন ভেবে শিহরিত হই। আনন্দিতও হই।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাবার জন্যে সেই আকুলি-বিকুলি ভাবটা আর নেই আমার মধ্যে। তাঁর সঙ্গে এখন নিত্য দেখা হয়। দেখা হয় আমার মায়ের সঙ্গেও। দেখি আমারই মধ্যে বসে আছেন তাঁরা। চিরদিন এমনই তো থাকতেন। অথচ আমিই শুধু দেখতে পাইনি এতদিন।



একটু অন্তত ভয় পাওয়ান



ছেলেগুলো যেদিন আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিল সেদিনই বলে রেখেছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু খুব বেশিক্ষণ তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। ছেলেগুলোও বিগলিত ভঙ্গীতে জানিয়েছিল, 'আপনি আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন এতেই আমরা কৃতার্থ স্যার। সত্যি বলতে কি গণ্ডগ্রামের একটা ছোট পত্রিকার উদবোধন অনুষ্ঠানে আপনি যে যেতে রাজি হবেন তাই ভাবতে পারিনি আমরা প্রথমটা। দেখবেন স্যার, সন্ধের মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব। জানি তো এতখানি পথ ফিরতে হবে আপনাকে আবার। আমরা যে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যাব আপনাকে সেই আর্থিক ক্ষমতা তো নেই আমাদের...অথচ সেটাই উচিত ছিল'।

'না না, গাড়ি-টাড়ি কী দরকার আবার', তাদের কথাটাকে যেন বিনয়ে ভাসিয়ে দিলেন প্রাণকৃষ্ণ, 'ছোট কাগজের পুঁজি ছোট জানি। কিন্তু ভালোবাসা, সেটা যে অফুরান। সেই টানেই তো আমি...'

'আপনার মতন এমন একজন সেলিব্রিটি লেখককে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। ওখানে কত যে ভক্ত আপনার, একবার শুধু গিয়ে দেখবেন স্যার...' ছেলেগুলো কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে গাঢ় গলায়। ছেলেগুলোর কথা খুব উপভোগ করছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু। বিশেষ করে শেষের কথাটা। অন্যের মুখে নিজেকে সেলিব্রিটি লেখক শুনলে শরীরের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। তিড়িং-বিড়িং করে নেচে ওঠে মনের ভেতরটা।

ভাগ্য কখন যে কার ক্ষেত্রে দুম করে প্রসন্ন হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এই যে প্রাণকৃষ্ণবাবু এতদিন ধরে একজন জাঁদরেল লেখক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন প্রাণপণে, সেখানে পরিশ্রমে তো ঘাটতি ছিল না। অথচ লাভ হল লবডংকা। দিনের পর দিন প্রায় সব কাগজ তাঁর লেখাগুলোকে নির্মমভাবে বাতিল করে দিয়েছে। বড়দের কাগজ পাত্তাই দেয়নি তাঁকে কোনোদিন, ছোটদের পত্রিকার সম্পাদকেরাও মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর দিক থেকে। কিন্তু খেয়ালবশেই হঠাৎই তিনি যেই ভূতের গল্প লিখতে শুরু করলেন অমনি খ্যাতি আর প্রচার যেন হুড়মুড়িয়ে এসে দাঁড়ালো তাঁর দরজার সামনে। যেসব কাগজে উপেক্ষা পেয়ে এসেছেন এতদিন, তারাই এখন লেখা পাবার জন্যে খোশামোদ করছে তাঁকে, যেসব সমকালীন লেখক পথে-ঘাটে তাঁকে দেখেও দেখতে না পাওয়ার ভান করে সরে পড়তেন, তাঁরা এখন তাঁর প্রতি একেবারে বিগলিত।

আসলে ভূতের গল্পে প্রাণকৃষ্ণ একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করে ফেলেছেন আজকাল। ভূত সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ভাষা, নিজস্ব ধারনা ও তত্ত্ব। প্রাণকৃষ্ণের ভূতেরা ভয়ংকর নয়। মানুষের ঘাড় মটকায় না তারা। ঘাড়ে-টাড়েও চাপে না। তারা নিরীহ, লাজুক, উপকারী, এমনকি ভীতুও। তাঁর গল্প পড়ে গা ছম ছম করে না, দাঁত কপাটি লাগে না ভয়ে। রাত-বিরেতে বুক গুড় গুড়ে হাড় হিম করা ভাবও হয় না কখনও। বরং ভূতগুলোর জন্যে কেমন একটা মায়া, একটা মন কেমন করা ভাব ফুটে ওঠে পাঠকের মনে। বেশ একটা সমবেদনায় ভরপুর ভালোবাসাও মনের মধ্যে খেলা করে বেড়ায় তাঁর লেখা পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক, পাঠক খাচ্ছে তাঁর গল্প এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এতটুকু। তাঁর ভূতের গল্পের বিক্রিবাটাও ভালোই। সেসব কথা বিবেচনা করে এই গণ্ডগ্রামের অনুষ্ঠানে না এলেও পারতেন

প্রাণকৃষ্ণবাবু, কিন্তু হিসেব-নিকেশ করেই না বলেননি তিনি ছেলেগুলোকে। আসলে পাঠক ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করতে পারলে আখেরে লাভ হয় তিনি দেখেছেন। জনপ্রিয়তা বাড়ে, সঙ্গে বাড়ে বই-এর বিক্রিও। কিন্তু অনুষ্ঠানটা এতখানি লম্বা হয়ে যাবে উদ্যোক্তারা নিজেরাও বুঝতে পারেননি আগে থেকে।

অনেকক্ষণ থেকেই উঠি উঠি করেও ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল তাঁর। বারুইপুর স্টেশনে যখন ট্রেন থেকে নামলেন হাতঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটা ছুঁই-ছুঁই। অটো স্ট্যান্ডে অটো নেই আর। খানিকটা হেঁটে একটা রিকশা পেলেন বটে, কিন্তু মওকা বুঝে এমন ভাড়া হাঁকাল লোকটা যে প্রাণকৃষ্ণবাবুর মেজাজটাই গেল খিঁচড়ে। এখান থেকে তাঁর বাড়ি বড়জোর দেড় কিলোমিটারের পথ। রাস্তাটা নির্জন ঠিকই, কিন্তু চুরি-ছিনতাই-এর ভয়-টয় তেমন নেই। অতএব প্রাণকৃষ্ণবাবু ফাঁকা রাস্তায় একা একাই হাঁটা শুরু করলেন বাড়ির দিকে।

স্টেশন রোড পেরিয়ে, শ্রীগুরু পুস্তক ভান্ডার বাঁয়ে ফেলে নস্করদের বিশাল দিঘিটা পার হয়ে যেই ঝুপসি খিরিশ গাছটা বেড় দিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়েছেন তিনি, অমনি আচম্বিতে ঘটনাটা ঘটল। খিরিশ গাছটার আবছা অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে যেন চাপা খসখসে গলায় ডেকে উঠল, 'স্যার, একটু যদি সময় দেন, কটা কথা ছিল...'

প্রথমটা শোনার ভুল মনে করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু। এই রাতে এখানে কে ডাকবে তাঁকে! কিন্তু দু-পা এগোতে না এগোতেই ডাকটা আবার শুনতে পেলেন তিনি, 'স্যার, প্লিজ। বেশিক্ষণ না, সামান্য সময় নেব আপনার। যদি একটু দাঁড়িয়ে যান কষ্ট করে...'

প্রাণকৃষ্ণবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। থতমত গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আমাকে বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ছাড়া এ তল্লাটে আর কেউ তো নেই স্যার। সেইজন্যেই ভরসা করে আপনাকে আজ ডাকলাম। অনেকদিন ধরেই আপনাকে সুযোগ সুবিধে মতন পাবার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। সুযোগটা আজই বলতে গেলে ঠিকঠাক পেলাম স্যার'। খসখসে গলাটা সাবধানী গলায় বলে উঠল।

'কে আপনি? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না কাউকে...' প্রাণকৃষ্ণবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন।

'পাবেন স্যার, নিশ্চয়ই পাবেন। একটু সময় দিন। বায়বীয় শরীর তো, চেহারাটাকে দৃশ্যমান করতে এখনও একটু সময় লেগে যায়। ঝপ করে নিজেকে তৈরি করে ফেলতে পারি না। ট্রেনিং এ আছি অবশ্য। মাস দুয়েকের মধ্যে আশা করি স্যার ব্যাপারটা সড়গড় হয়ে যাবে। তখন চক্ষের নিমেষে আস্ত একটা শরীর ধারণ করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেতে পারব প্রয়োজন মতন। এই যেমন ধরুন আপনাদের পাড়ার যদুদা দিব্বি যখন তখন শরীর ধারণ করতে শিখে গেছে এখন...'

'মানে', প্রায় আঁতকে উঠলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু, 'যদু, মানে হালদার বাড়ির যদু, যে গেল বছর রেলে কাটা পড়ল শুঁলিপোতায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

প্রাণকৃষ্ণের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। তাঁদের বাড়িতে কাজ করতে আসে কমলার মা। সে প্রায়ই বলে যদু নাকি ভূত হয়ে দেখা-টেখা দেয় মাঝে মাঝে। গ্রামে-মফসসলে এমন ভূতুড়ে গল্প নিত্যিদিন হাওয়ায় ভাসে। এ কোনো নতুন কথা নয়। প্রাণকৃষ্ণবাবু এসবে বিশ্বাস-টিশ্বাস করেননি কখনও। এখন কথাটা শুনে কেমন খটকা লাগল। সন্দেহের সঙ্গে বলে উঠলেন তিনি, 'যদুর নিত্য দেখা পাওয়া আপনার পক্ষে তো সম্ভব নয়?'

'আজ্ঞে আমার পক্ষেই তো দেখা পাওয়া সম্ভব।' খসখসে গলা ভারি অমায়িক ভঙ্গীতে হাসে। তারপর খিরিশ গাছের পিছন দিক থেকে একটু দুলতে দুলতে সামনের দিকে এগিয়ে এসে প্রাণকৃষ্ণবাবুর চেয়ে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রাণকৃষ্ণ স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন একটুক্ষণ। ছেলেটা খুব বেশি হলে বছর পঁচিশেক বয়েসের। লম্বা। একটু বেশি রোগা। পরনে ট্রাউসার। ফুলহাতা শার্ট গুঁজে পরা। চাঁদের আলোয় মনে হল গলায় টাই রয়েছে ছেলেটার।

'কেন?' তার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

'আমিও যে স্যার আর বেঁচে নেই।'

'যাহ, আপনি কি ইয়ার্কি করছেন নাকি?' অবিশ্বাসী গলায় বলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

'আজ্ঞে না', ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলে ছেলেটা। 'স্যার আমায় দয়া করে আপনি বলবেন না। আপনি সম্মানীয় ব্যক্তি। আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন ভূত। অল্প পারিশ্রমিকের চাকরি করে কোনোক্রমে মাথা গোঁজার একটা আশ্রয় পেয়েছি এ অঞ্চলে। তবে আমি পরিশ্রমী। কাজের প্রতি ডেডিকেশনেরও অভাব নেই আমার...'

'সত্যিই তুমি ভূত?'

'যে আজ্ঞে?'

'তবু তোমায় চাকরি করতে হয়?'

'হ্যাঁ স্যার। যা কম্পিটিশন আজকাল। সাধারণ রোগে ভোগা মানুষ তো মরতই আগে। কিন্তু আজকাল ভাবুন চতুর্দিকে কত নাশকতা, গণহত্যা, তারপর বাসে-ট্রেনে জলে-আকাশে-হাজারো দুর্ঘটনা...এ পারে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। অথচ থাকার জায়গা কমছে। জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে, পোড়ো বাড়ি উধাও হয়ে ফ্ল্যাট গজিয়ে উঠছে। শ্মশান-টশানগুলো পর্যন্ত অত্যাধুনিক হয়ে সেজেগুজে যেন টুরিস্ট স্পট একেকটা। অনেকে তো সন্ধেবেলা শ্মশানে এমনিই ঘুরতে আসে আজকাল। সেকেলে ভূতেরা এসব পরিবর্তন মানিয়ে নিতে পারেন না চট করে। আমরা বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছি। এরই মধ্যে একটু ভালোভাবে থাকতে হলে বা ধরুন একটা ব্রাইট কেরিয়ার তৈরি করতে চাইলে এইসব প্রতিকূলতাকে তো জয় করতেই হবে বলুন...'

'এখানেও কেরিয়ার, এখানেও কম্পিটিশন?'

'হ্যাঁ স্যার। আর সে জন্যেই আমি আজ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।'

'আমি কী করতে পারি বাপু এক্ষেত্রে?'

'আপনিই পারেন স্যার। অন্যদের দিয়ে হবে না'।

'মানে?'

'স্যার আমরা জানি আপনি আমাদের নিয়ে প্রচুর গল্প লেখেন।'

'তোমরা এ খবরও রাখো?'

'রাখতে হয় স্যার। নিজেদের ভালো মন্দের কথা মৃত্যুর আগেও যেমন ভাবতে হয়, মৃত্যুর পরেও ভাবতে হয় বৈকি। যাইহোক রাত বাড়ছে। আপনাকে বেশি দেরি করাব না আর। আসল কথায় আসি বরং।'

'সে কথাটা কী বলো দেখি?'

'দেখুন আপনার গল্পে আপনি আমাদের বড় হ্যাটা করছেন। মজা-টজা করে এমন করছেন যে আমাদের সম্পর্কে ভয়-টয়ের ব্যাপারটা একেবারে মুছে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে। এতে আমাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে। কে কত ভয় পাওয়াতে পারল মানুষকে এ নিয়ে আমাদের চার বছর অন্তর ভলিম্পিক, আই মিন ভূতুড়ে অলিম্পিক পর্যন্ত চালু আছে। আমরা মানুষের ক্ষতি করতে চাই না, কিন্তু তারা যে আমাদের ভয় করে, শ্রদ্ধা-সম্মান করে এমন জানলে আমরা বড় খুশি হই। আমাদের এ জগতে ওইটুকুই তো বিনোদন বলুন...আর কী আছে আমাদের...মানুষকে একটু ভয়-টয় দেখিয়ে সমাজে কলার তুলে ঘোরা। দুঃখের বিষয় আপনার মতন মানুষেরা আমাদের সেটুকু আমোদ—আহ্লাদও কেড়ে নিচ্ছেন...'

'কিন্তু এই লেখা আমার পাঠকেরা চাইছে যে...'

'চাইলেই করতে হবে? এই যদি আমার ইচ্ছে করে মট করে আপনার ঘাড়টা মটকে দিই, করব আমি, বলুন? সমাজে উচিৎ, অনুচিত এইসব শব্দগুলো কি তাহলে উঠেই যাবে নাকি একেবারে বলুন...কাজেই আপনি দয়া করে ভয় পাওয়ানো ভূতের গল্প লিখুন এবার থেকে।'

'আমি একা লিখলেই হবে', মরিয়া হয়ে বলেন প্রাণকৃষ্ণ, 'আরও অনেকেই তো ভূত নিয়ে মজার গল্প লিখছেন। তাঁদের অনেকেই কিংবদন্তি লেখক...'

'আমাদের কোম্পানির রিপ্রেসেন্টেটিভরা তাঁদের সকলের কাছেই পৌঁছে যাচ্ছে বা যাবে। আমাদের কোম্পানি এই অ্যাসাইনমেন্টটা অনেক কষ্টে পেয়েছে। এটা বড় একটা প্রজেক্ট। আমরা একটা টিম হিসেবে কাজটা করছি। মানুষের মনে ভূত নিয়ে ছেলেমানুষি ঠাট্টা তামাশা বা ধরুন অবজ্ঞা কিংবা ফাজলামি এসব দূর করে আগেকার সেই গা ছমছমে ভয়-ভয় ভাবটা ফিরিয়ে আনতে চাইছি আমরা। আমাদের কাজের সাফল্যের ওপরে ভবিষ্যতে অনেক কিছু নির্ভর করে আছে স্যার...'

'কিন্তু তোমাদের কথা ভেবে আমি আমার এমন একটা তৈরি জায়গা ছাড়ব কেন? আমারও তো লেখক হিসেবে একটা ভবিষ্যৎ আছে। আমিও তো অনেক কষ্টে এই জায়গাটা তৈরি করেছি...'

'স্যার প্লিজ', ছেলেটার গলায় বিষণ্ণতা ঝরে পড়ে, 'স্যার, বেঁচে থাকতে প্রায়শই একটা স্বপ্ন দেখতাম আমি। আমার দুর্ভাগ্য, সে স্বপ্নটাকে কিছুতেই আর বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি। মরার পর আচম্বিতেই আমার সামনে সেই স্বপ্নটা সত্যি করার একটা সুযোগ এসেছে, কিন্তু আপনি আমার কথায় রাজি না হলে এ বারেও স্বপ্নটাকে আর সত্যি করে তোলা হবে না আমার। আর সত্যি বলতে

কি সুযোগটা এবারেও যদি কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমার এই ভূতজন্মটাও বেকার হয়ে যাবে একেবারে। একবার মরলে আর মরা যায় না। তা নাহলে এই ব্যর্থতার জন্যে আমাকে, মানে আমাদের দুজনকে হয়ত আরো একবার মরণের পথটাই বেছে নিতে হত...' ছেলেটা মাথা ঝুঁকিয়ে খুবই দুঃখিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে।

'তোমার স্বপ্নটা কী?' কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

'সে কথা বলতে গেলে একটু আগে থেকে বলতে হয়', ছেলেটা লাজুক গলায় বলে, 'আপনার কি আর অত কথা শোনার সময় হবে?'

কনুই থেকে বাঁ হাত ভাঁজ করে রিস্ট ওয়াচের দিকে নজর বোলালেন একবার প্রাণকৃষ্ণ। রাত্তির বারোটা বাজতে চলেছে। সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে এইবার। তাছাড়া কদিন ধরে বাড়িতেও একটা বিচ্ছিরি ক্যাচাল চলছে। তাঁর মেয়ে বাবলিকে নিয়ে বেশ একটা ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই চলছেন তিনি। কিন্তু ছেলেটার গল্পটা শোনার লোভও সামলাতে পারছেন না উনি।

প্রাণকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে বোঝালেন শেষমেশ, ট্রেনে উঠে বাড়িতে তো ফোন করে বলেই দিয়েছেন যে ফিরতে অনেকই দেরি হবে, কাজেই বাড়িতে চিন্তা করার কিছু নেই। তাছাড়া বাবলিকেও নিশ্চিত চোখে চোখে রেখে দেবে ওর মা। অতএব ছেলেটার কথাগুলো শুনেই নেওয়া যাক আপাতত। তাছাড়া ছেলেটার ওপর কেমন যেন মায়াও পড়ে যাচ্ছে একটা। ওর আচরণে এমন একটা শিষ্ট অথচ বিষাদের ভাব আছে যে চট করে ওর ওপরে যেন কেমন একটা দুর্বলতা এসে যায় মনের মধ্যে। প্রাণকৃষ্ণবাবু একবার কেশে নিয়ে বলে উঠলেন, 'বলেই ফেল হে। তবে খুব বেশি বিশদে যেও না।'

'যে আজ্ঞে', বলে বলতে শুরু করে ছেলেটা, 'মরার আগে আমার নাম ছিল ঋষভ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করে একটা চাকরি পেয়েছিলাম চেন্নাইতে। খুব লুক্রেটিভ কিছু না, তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়ে আমি ধীরে ধীরে অনেক ওপরে চলে যাব একদিন। যাবই। কিন্তু অন্বেষার বাবা কিছুতেই এটা মানতে পারল না জানেন...'

'অন্বেষাটা কে? তোমার গার্লফ্রেন্ড বুঝি?'

'হ্যাঁ', খুব লজ্জা পাওয়া গলায় উত্তর দেয় ঋষভ। 'সেই ক্লাশ ইলেভেন থেকেই স্টেডি রিলেশন আমাদের। অলক স্যারের ব্যাচে ফিজিক্স পড়তে গিয়ে আমরা ভালোবেসেছিলাম দুজন দুজনকে...আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তখনই বলেছিলাম ওকে,' 'দেখিস, একদিন অনেক বড় হব আমি। মস্ত চাকরি পাব। তোকে নিয়ে বিদেশে হনিমুন করতে যাব। সে যদি বিয়ের অনেক পরেও হয়, তবুও সেটা আমাদের অ্যানাদার হনিমুন হবে...' ও এই কথায় লজ্জা পেত খুব। প্রথম প্রথম বিশ্বাসই করত না। তারপরে আমি যখন চাকরি পেয়ে চেন্নাই গেলাম তখন একদিন বলল আমার কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে...'

'তারপর?'

'তারপর...' বিষাদে বুজে এল ঋষভের গলা, 'অন্বেষার বাবা আমাদের রিলেশনটাকে মেনে নেওয়া দূরের কথা, পাত্তাই দিলেন না। জোর করে ওর বিয়ে ঠিক করলেন কোন এক বিশাল ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে। অন্বেষা বিষ খেয়েছিল। কোথা থেকে যোগাড় করেছিল কে জানে...আমি দিন-চারেক পরে খবর পেয়েছিলাম। অন্বেষা নেই, আমি কী করে বেঁচে থাকি বলুন? সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়লাম। এই যে গলার দাগটা রয়েছে এখনও। দেখবেন নাকি সত্যি বলছি কিনা?' বলে প্রাণকৃষ্ণের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল ঋষভ। নিজের অজান্তেই এই প্রথম প্রাণকৃষ্ণবাবু ভয় পেয়ে দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'না, না আমি দেখতে চাই না। আমি বিশ্বাস করছি তোমার কথা...' চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই প্রাণকৃষ্ণের মনে হল ঘটনাটা যেন চেনা ঠেকছে তাঁর। তারপরেই মনে পড়ল খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। সেই ছেলেটা, সেই ঋষভই তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আজ এই রাতে? গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তাঁর।

'এই তো আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছেন আপনি', উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে ঋষভের গলায়। 'এই ভয়টাই এবার থেকে যদি আপনার গল্পগুলোতেও চারিয়ে দেন তাহলে আমি প্যাকেজটা পেয়ে যাব।'

'প্যাকেজ মানে? কিসের প্যাকেজ?' প্রাণকৃষ্ণবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন।

কোম্পানির অফার আছে যদি আপনাকে ভূতে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা আর আপনার গল্পে ভূতকে ভয় পাওয়ানোর বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে পৃথিবীর যে কোনো শ্মশান বা গোরস্থানে থ্রি ডেজ ফোর নাইট থাকা খাওয়া ফ্রি। কাজেই আপনি যদি কথা দেন যে এবার থেকে ভয়ের গল্প লিখবেন এবং সত্যিই সে লেখা শুরু করেন তাহলে অন্বেষাকে দেওয়া কথাটা রাখতে পারি...'

'অন্বেষা এখানে?'

'না হলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে গেলাম কেন? কী কষ্ট যে হয়েছিল সেই সময়...একটু বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস অবস্থা...অক্সিজেনটা যে কী মারাত্মক আরামের তখনই তো বুঝলাম। যাক গে এখানে এসে অন্বেষাকে পেয়ে সে কষ্ট ভুলে গেছি স্যার। দুটিতে বেশ মিলেমিশে আছি একসাথে। এবার আপনি যদি এখন পাওয়া ভয়টা ধরে রাখতে পারেন...'

একটা ভয়-ভয় ভাব সত্যিই কাজ করছিল প্রাণকৃষ্ণের মনে। শিড়দাঁড়ার কাছটা শির-শির করছিল। কথা বলতে গিয়ে দেখলেন জিভ শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। তবু জিগ্যেস করলেন তিনি কাঁপা গলায়, 'কোথায় যাবে কিছু ভেবেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে অন্বেষা তো ইংরেজি নিয়ে পড়েছিল। ওর বড় শখ একবার ইংল্যান্ডে যাবার। ওই যে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি আছে, ওখানেই ক'টা দিন ওর প্রিয় কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে কাটিয়ে আসব দুজনে। আমি ইংরেজিতে অবশ্য খুব ফ্লুয়েন্ট নই তবু কাজ চালিয়ে নিতে পারব...তাছাড়া...'

প্রাণকৃষ্ণবাবু তার কথা শেষ করতে দিলেন না আর। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন ক্রমশই হাতের তেলো আর পায়ের পাতা ঠান্ডা হয়ে আসছে তাঁর। আপন মনে বিড় বিড় করে তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমাদের ভালো হোক। সুখি হও তোমরা দুজনে। আমি তোমার কথা রাখব। ভয় পাওয়ানো ভূতের গল্পই লিখব এবার থেকে। নিশ্চিন্তে থেকো তুমি।'

ঋষভের মুখের দিকে তাকানোর কথা আর মনে পড়ল না প্রাণকৃষ্ণবাবুর। মাথা নামিয়ে ভারী পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি আনমনে। একটা মারাত্মক জরুরি কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। আজ এত রাতে আর সম্ভব নয়। তবে ব্যাপারটা নিয়ে গড়িমসি করার সময়ও আর একটুও নেই। কাল রবিবার। ইউনিভার্সিটি ছুটি। বেদানুষা, মানে বাবলি বাড়ি থাকবে কাল। ওর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা দরকার। খোলা মনে। কয়েকমাস আগেই প্রাণকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী খুব উদবেগ নিয়ে জানিয়েছিলেন তাঁকে যে বেদানুষা ওরই ইউনিভার্সিটির একটি ছেলেকে ভালোবাসে। ভবিষ্যতে তাকেই বিয়ে করতে চায় সে।

ছেলেটি সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণবাবু খোঁজ-খবর নিয়েছেন। ছেলেটা এসেওছে দু-একবার এ বাড়িতে। একটু ভোলেভালা। উস্কোখুস্কো একমাথা চুল। গালে নরম দাড়ি। উদাস ভাসা-ভাসা চোখ। কবিতা লেখে। রবি ঠাকুরের গান গায়। বেশ গলা। সুরও ভারি ভালো খেলে ছেলেটার গলায়। কিন্তু বেদানুষাকে তার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি তাঁর। তাঁর স্থির বিশ্বাস স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত হবার মতন উপার্জন করার ক্ষমতা ও ভালো সংসারি হবার গুণ এ দুটোর কোনোটাই ছেলেটার নেই। স্ত্রীকে নিজের আপত্তির কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন প্রাণকৃষ্ণবাবু। বাবলিকেও জানিয়েছেন।

প্রাণকৃষ্ণবাবু দু-একটি ভালো সম্বন্ধের কথা বাড়িতে বলছেনও কদিন ধরে। বাবলির মধ্যে অবশ্য এইসব সম্বন্ধ নিয়ে কোনো উৎসাহ বা কৌতূহল চোখে পড়েনি তাঁর। তবু হাল ছাড়েননি তিনি একদিনে। কিন্তু আজ প্রাণকৃষ্ণের মনে হল আপত্তির পাশাপাশি মেয়েটার চোখে সে সময় অন্যরকম একটা অন্ধকারও দেখেছিলেন তিনি। প্রাণকৃষ্ণের বুকের মধ্যেটা ভারি হয়ে গেল। কাল সকালেই বেদানুষাকে বলতে হবে ছেলেটাকে একদিন বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে। লিখুক না কবিতা, গাক না গান। কী এমন ক্ষতি। ছেলেটার মুখখানা তো খারাপ নয়। আর ভাসা-ভাসা চোখদুটোর মধ্যে যে স্বপ্নগুলো সে এঁকে রেখেছে তাঁর অলক্ষে, চেষ্টা করে দেখাই যাক না সবাই মিলে, সেগুলো জীবনের এ পারেই সত্যি করে তোলা যায় কিনা...



নগেন গোঁসায়ের নিদান



সকালে উঠে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস কস্মিনকালেও ছিল না হরেন হালদারের। এমনিতেই এলাকায় অলস বলে তার বেশ নামডাক আছে। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু ছিল বলে চাকরি-বাকরির ধার দিয়েই যায়নি সে। একজন জ্যোতিষী একবার কুষ্ঠি বানিয়েছিল হরেনের। এই গ্রামেই থাকতেন ভদ্রলোক। জীবন গোস্বামী। হস্তরেখা বিচার আর মানুষের জন্মছক বানানোর ব্যাপারে এই অঞ্চলে তাঁর ছিল বেজায় সুনাম। হরেনের কপালের দিকে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে রায় দিয়েছিলেন জীবন গোস্বামী, 'না হে কিছু করার নেই। ওই ধরো আটচল্লিশ, কিংবা ঊনপঞ্চাশ।'

'আজ্ঞে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল হরেন।

'তোমার আয়ু। অনেক হিসেব নিকেশ করেও ওটা আর বাড়াতে পারলুম না বাপু'। আক্ষেপের সুরে বললেন জীবন।

'মানে পঞ্চাশ কিছুতেই আর পেরব না বলছেন?' বেশ উৎফুল্ল ভঙ্গীতে বলে হরেন, 'বেশি বাঁচার অনেক হ্যাপা।'

'কেন?' অবাক হয়ে বলেন জীবন, 'আমার তো বাপু বাঁচতে বেশ লাগে।'

'আচ্ছা বেশি বেঁচে লাভটা কী বলুন দেখি?'

'আমার নলেন গুড়ের পায়েসের খুব লোভ জানো তো, কিন্তু শীতকাল তো আর বারোমাস থাকে না। বছরে মাত্র একবার শীতকাল আসে আর তখন নলেন গুড়। সেই গুড়ে সন্দেশ, মোয়া, পায়েস...তারপর ধরো গিয়ে আমাদের দক্ষিণের বাগানের ল্যাংড়া আম। যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। আর বাগানের এক্কেবারে বাঁ-দিকের কাঁঠাল গাছটা...আহা কাঁঠালের কোয়াগুলো যা না, এক্কেবারে খাজা। কচকচ করে চিবিয়ে খেতে হয়। আর কী মিষ্টি! মনে হয় প্রতিটা কোয়ার মধ্যে যেন লিচুর মধু ভরে রাখা রয়েছে। ভাবো দিকিনি একবার, ফট করে মরে গেলে এসব জিনিসের মজাটাও মরে যাবে আমার সঙ্গে। মরণের পরে তো আর জিভ নেই, স্বাদ গ্রহণের উপায়ও নেই। তাছাড়া মনে করো...'

'বুঝতে পেরেছি', হরেন হাসে, 'আমার অমন খাওয়ার লোভ নেই। বাঁচারও লোভ নেই। বেশি বাঁচলে বেশি খরচ। আর বেশি খরচ মানেই গায়ে-গতরে খেটে উপার্জন করা। অত খাটুনি আমার সইবে না। শরীরটা মন্দির বুঝেচেন, যে কদিন আছে, তাকে আগলে রাখতে হবে। গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেওয়া যাবে না। আপনি আমায় আজ ভারি নিশ্চিন্ত করলেন। মনে বড় ভয় ছিল। ভাবতাম বেশিদিন বেঁচে গেলে শেষে জমা আমানতে টান পড়বে না তো? আজ সে ভয়টা কাটল। আর কার্পণ্য করার দরকার নেই। মনে মনে হিসেব কষে দেখলাম যা আছে পঞ্চাশ বছর অব্দি দিব্বি চলে যাবে। আপনি ঊনপঞ্চাশ বলেছেন, আমি সেফ থাকতে আরো একবছরের বাড়তি হিসেব ধরলাম।'

'তবু...' আমতা আমতা করে কিছু বলতে গেলেন জীবন। হরেন থামিয়ে দিল তাঁকে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গণনায় ভুল নেই তো জেঠু?'

'হয়নি আজ অব্দি। তবে মানুষের হিসেব তো। ভুল হয়েও যেতে পারে...'

'হবে না', হরেন হাসে। ভারি নিশ্চিন্তির হাসি। মন থেকে আজ যেন একটা বিশমনি পাথর নেমে গেল।

সেই থেকে হরেন দিব্বি খেলিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। শুয়ে বসে আরাম করে হই হট্টগোল করে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে জম্পেশ দিন কাটাচ্ছে সে।

প্রথম প্রথম দিব্বি খরচ খরচা করেছে সে দু হাতে। সেই খরচে অনেক সময়েই লাগাম থাকত না। সেইসব সময়ে হরেনের বেশ কিছু বন্ধু ছিল। নিত্য যোগাযোগ ছিল তাদের হরেনের সঙ্গে। এখন হরেনের জমা টাকা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। কাজেই বন্ধুরা বড় একটা আজকাল আর আসে না তার কাছে। তার জন্যে অবশ্য হরেনের দুশ্চিন্তা নেই আর। সে জানে তার এই পৃথিবীর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। হিসেব মতন এই মাসেই উনপঞ্চাশ পূর্ণ হবার কথা তার। আত্মীয়-স্বজন হরেনের বড় একটা নেই। যে দু-চারজন আছে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই কোনো। নিজের লোক বলতে তাদের বাড়ির পুরনো কাজের লোক গৌরদা। কম বয়েসে বাবা মা গত হবার পরে এই গৌরদাই বলতে গেলে আগলে রেখেছে দু-হাতে। গৌরদার বয়েস হয়েছে, তবু বাড়ির যেটুকু প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম ওই সারে এখনও পর্যন্ত।

কদিন আগে সঞ্চয়ের অবশিষ্ট যেটুকু ছিল তা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে গৌরদার হাতেই তুলে দিল হরেন। সে চোখ বুজলে এই লোকটারই মুশকিল। গৌরদা চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী বলো দেখি? আমায় হঠাৎ টাকা পয়সা দিচ্ছো কোন মতলবে? এই বুড়ো বয়েসে কাজ থেকে বরখাস্ত করছ নাকি হে?'

'ধুস, কী যে বলো গৌরদা', হরেন হাসে। 'মানুষের জীবনে কী ভরসা আছে বলো...আজ আছি, কাল তো না থাকতেও পারি। কাজেই এইটুকু রেখে দাও তোমার কাছে। কখন কী কাজে লেগে যায়...'

'থামো দিকিনি, শুধু অলুক্ষুনে কথা', মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে গৌর। 'সে আমিও তো চোখ বুজুতে পারি যখন তখন। এ টাকা কি কাজে লাগবে তখন আমার? কাজেই তোমার টাকা তুমিই বাপু রেখে দাও যত্ন করে।' আসল কথাটা গৌরদাকে আর মনে করাতে ইছে করেনি হরেনের। টাকাটা তুলেই রেখেছিল। সেইদিন থেকে মনে চাপা অস্বস্তিটা যেন রয়েই গেছে।

আজ সারাদিনই ভ্যাপসা গরম। মাথার ওপরে পাখা বন বন করে ঘুরছে, কিন্তু আরাম হচ্ছে না একটুও। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল হরেন। কেমন যেন একটা অজানা অস্বস্তি হচ্ছে। জল খাবার জন্যে বিছানায় উঠে বসল সে। আর তখনই লোকটাকে চোখে পড়ল তার।

বিছানা থেকে খানিক তফাতে তারই হাতলঅলা কাঠের চেয়ারটায় লোকটা বসেছিল। পরনে খাটো ধুতি। খালি গায়ে সুতির চাদর জড়ানো। লোকটাকে দেখে ভারি হকচকিয়ে গেল হরেন। চোর-টোর নাকি? কিন্তু পরক্ষনেই মনের মধ্যে খটকা লাগল। ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে খিল দিয়ে আটকানো। নাইট ল্যাম্পের আলোয় খিলটা দেখাও যাচ্ছে আবছা আবছা। হ্যাঁ, ওই তো এখনও আটকানোই রয়েছে। তাছাড়া লোকটা যদি চোরই হবে তবে অমন নিরুদ্বিগ্ন ভাবে চেয়ারে বসে আছে কেন চুপটি করে? কথাটা মনে এসেছে কি আসেনি অমনি নিজের থেকেই শান্ত গলায় লোকটা বলে উঠল, 'তোমার বাপু বিবেচনা আছে। যতটা অবিবেচক ভেবেছিলাম তোমায়, তুমি সত্যিই ততটা নও।

ঠিকই ধরেছো। আমি চোর নই। চোর হতে যাবই বা কেন বাপু? সাত কূলে কেউ কখনও চোর হয়নি আমাদের বংশে। চোর হোক আমার বংশের শত্তুরে।'

'কে আপনি?' বলে হাতের কাছের বেড সুইচ টিপে বড় আলোটা জ্বালিয়ে দিল হরেন।

'আহা করো কী, করো কী', বলে সিঁটিয়ে গেল লোকটা। তারপর একটু লাজুক ভঙ্গীতে বলে উঠল, 'আলোটা নেভাও বাছা। কাঁচা শরীর তো, চড়া আলোয় ফস করে গলে যেতে পারে।'

'মানে?' অবাক হয়ে বলে হরেন।

'নগেন গোঁসাই কি আজকের মানুষ রে ভাই? আমার রক্ত মাংসের আসল শরীরটা তো বহুকাল আগেই গত হয়েছে, তোমার সঙ্গে দুটি কথা বলার তাড়সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই শরীরটা তোমার চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছি বাপু। বেশি আলোয় এ শরীর স্থির হয়ে থাকতে চায় না। বেঁকেচুরে, খসে যায়। ধোঁয়া হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশেও যায় অনেক সময়ে। তাও এই শরীরটা বানাতেই কি কম কসরত করতে হয়েছে বাছা? কত বছর লেগে গেল এই বিদ্যেটুকু শিখতে। তাও রক্ষে, চেষ্টা ছিল বলে এইটুকু অন্তত হয়েছে। জীবন তো বহু চেষ্টাতেও এ বিদ্যে আয়ত্তে আনতে পারেনি এখনও। নইলে তোমার কাছে আমার তো আসার কথা নয়। ত্রুটি তার। কাজেই তারই এসে ভুলটা ঠিক করে দিয়ে যাবার কথা...'

হরেনের মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, 'জীবন মানে আপনি কি জীবন জেঠুর কথা বলছেন? মানে জীবন গোস্বামী?'

'আবার কে?' নগেন মৃদু হাসে, 'জীবন আমার নাতি। ছোট্টবেলা থেকে কোলে বসিয়ে জ্যোতিষের গূঢ় বিদ্যে শিখিয়েছি তাকে। হাতে ধরে দেখিয়েছি, বিচার ঠিকঠাক হলে এ শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত কেমন অভ্রান্ত হয়...ছেলেটা বিদ্যেটা শিখেও নিয়েছিল। কিন্তু ওই যে বললাম বিচার ঠিক হওয়া চাই। অংকে সামান্য ভুল হলেই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চলে যাবে...'

'তাতে কি খুবই অসুবিধা?'

'বলো কী হে', নগেন গোঁসাই বলে ওঠে মাথা নাড়াতে নাড়াতে, 'গণনার সামান্য ভুল হলে দিন যে রাত হয়ে যাবে গো...ভাবতে সামান্য ভুল। কিন্তু ধর সামান্য একটা ফুটকির ভুলে রামভক্ত যদি বামভক্ত হয়ে যায় তবে কী কেলেংকারি বলো দেখি...'

'তা ঠিক।' হরেন মাথা নাড়ে।

'এমন একটা ভুলই যে জীবন তোমার সঙ্গে করে বসে আছে বাবা...'

'অ্যাঁ আমার সঙ্গে?' থতমত খেয়ে বলে হরেন।

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে।'

'কী ভুল?'

'ওই যে তোমার আয়ু বেঁধে দিয়েছে সে ঊনপঞ্চাশ, ওইখানে।'

'সে কী?' আতঙ্কিত গলায় বলে হরেন, 'আয়ুটা কী তবে এখন আবার বাড়িয়ে দেবেন নাকি আপনি দুম করে?'

'আমি বাড়ানোর কে?' নগেন গোঁসাই বলে, 'সে তো বেড়েই আছে। আরে মানুষ তো স্প্রিং-এ দম দেওয়া পুতুল। যদ্দিন দম আছে তোমায় ঘুরতেই হবে। থামব বললেও কেউ শুনবে না সে কথা।'

'কিন্তু এখন আমার আয়ু ফস করে বেড়ে গেলে আমি যে খুব বিপদে পড়ে যাব দাদু', হরেন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

'আজব কথা শোনালে ভাই', নগেন গোঁসাই হেসে ওঠে। 'বাঁচার জন্যে মানুষ হাঁকপাঁক করে মরছে সর্বক্ষণ আর তুমি এমন যাই যাই করছ কেন বলো দেখি?'

'এই পৃথিবীতে কীসের টানে যে বাঁচব সেটা খুঁজে পাইনি আজ অব্দি। তাছাড়া...'

'তাছাড়া?'

'ঊনপঞ্চাশ বছর আয়ু ধরে নিয়ে সেইভাবেই হিসেব কষে তো জীবনটাকে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। এখন আর সঞ্চয় কিছু নেই। অনেকদিন বাঁচতে হলে না খেতে পেয়ে মরতে হবে।'

'কিন্তু নব্বই-এর কাছাকাছি যে আয়ু তোমার।'

'টিকব না। তার ঢের আগেই না খেয়ে মরে যাব।'

'তুমি চাকরি বাকরি কর না?'

'নাহ।'

'ব্যবসা বানিজ্য?'

'ধুস।'

'জমি জিরেত তো ঢের আছে। বাগান-আগান, চাষবাস?'

'উঁহু।'

'কেন?'

'ভাল্লাগে না। কাজ করতে বড় আলস্য আমার।'

'তালে তো সত্যিই বড় বিপদ তোমার। চেষ্টা করেও মরা তোমার নব্বইয়ের আগে হচ্ছে না। কিন্তু এমন ভাবে বাঁচতে গেলে তোমার তো ভোগান্তির একশেষ।'

'মহা গেরোয় ফেললেন তো আপনি', চিন্তাক্লিষ্ট গলায় বলে হরেন। 'দিব্বি হেসেখেলে আর মজা করে শেষ করে ফেলছিলাম জীবনটা, আপনি এসে সব গোলমাল পাকিয়ে দিলেন। এখন কী করা যায় নিদেন দিন দেখি একখানা।'

'ভাবছি', বলে গালে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে খানিক বসে থাকে নগেন গোঁসাই-এর বুড়ো ভূত। তারপর বলে ওঠে, 'ভিটের পুব দিকে কাঠা বারো জমি আছে না তোমার বাপ ঠাকুদ্দার?'

'তা আছে। তবে পুরো জমিটা এখন জঙ্গল আর আগাছায় ভরে আছে।'

'আর সেই পুকুরটা?'

'কচুরিপানায় ভর্তি। পুকুর শরার উপায় নেই।'

'কিন্তু ওখানেই যে ছিল জিনিসটা।'

'কী ছিল?' কৌতূহলী গলায় জিগ্যেস করে হরেন।

'মোহর গো, মোহর', চাপা গলায় বলে নগেন।

'যাহ, গুল মারছেন আপনি।' হরেন বলে।

'না হে। জায়গাটা ঠিক মনে নেই। তবে ছিল। ওই জমিতে বা পুকুরের মাঝে। মাটিতে পুতে রাখা ছিল জানি।'

'সত্যি থাকলে তা দিয়ে তো আমার বাকি জীবন পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়েই দিব্বি চলে যাবে।'

'তা তো যাবেই।'

'তাহলে ব্যাপারটা তো দেখতে হচ্ছে।'

'দেখো। তবে ব্যাপারটা পাঁচকান কোরো না। দিনকাল তো ভালো নয়...'

'ওই নব্বই বছরের হিসেবেটা ভুল নয় তো?'

'এক্কেবারে নির্ভুল। নিয্যস সত্যি। নগেন গোঁসাইয়ের গণনা বলে কথা।'

নগেন গোঁসাই উঠে পড়ে চেয়ার থেকে। শরীরটা ঝুরো ঝুরো হয়ে ধুলো হয়ে যেতে থাকে। সেই ধুলো ধুলো অবস্থাতেই মিহি গলায় হেসে ওঠে নগেন গোঁসাই। একবার দুলে উঠে বলে, 'আসি হে।'

'আসুন', বলে আনমনা হরেন আবার বিছানায় এসে বসে পড়ে। বুকের মধ্যে একটা কেমন অন্য রকমের অনুভূতি হচ্ছে তার। হরেন বুঝল শুয়ে লাভ নেই। আজ আর কিছুতেই ঘুম আসবে না তার।

বাইরে ভালো করে আলো ফোটার আগেই হাত মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল হরেন। পুব দিকের পড়ে থাকা জমিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আগাছায় ভরে আছে জায়গাটা। চারদিকে শব্দ নেই কোনো। হাতের কোদাল আর বড় দা-টা দিয়ে প্রাণপনে আগাছা পরিস্কার করতে লাগল সে। পরিশ্রম হচ্ছে যথেষ্ট। গা ঘেমে উঠছে। শ্বাস দ্রুত হচ্ছে। তবু কাজ করতে বড় ভালো লাগছিল হরেনের। নিজের দু-হাতের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল হরেন। এই দু-হাতের মধ্যে কত শক্তি মজুত রয়েছে, অথচ এতদিন সেই শক্তি কাজেই লাগায়নি সে!

গাছেদের গা থেকে ভারি সুন্দর গন্ধ বেরচ্ছে। সেই গন্ধ ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে এসে হরেনের নাকে লাগছিল। বড় করে শ্বাস টেনে সেই গন্ধ বুকে টেনে নিল সে। আগাছার আড়ালে বহু আগে লাগানো ফুল গাছগুলোকে চোখে পড়ল তার। এত অবহেলাতেও এখনও ফুল ফুটিয়ে রেখেছে তারা। পাখিরা গাছের ডালে ডালে হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছে নতুন দিনকে স্বাগত জানাতে একসঙ্গে জড়ো হয়ে।

এত ভোরে আগে কোনোদিন ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি হরেন। আজ পুরো প্রকৃতি এক অদ্ভুত মায়ায় যেন ধীরে ধীরে জড়িয়ে নিচ্ছিল তাকে। হরেনের ভালো লাগছিল। কেন যে এমন ভালো লাগছে কে জানে, কিন্তু হরেন স্পষ্ট বুঝতে পারল এমন ভালো আর কখনও লাগেনি তার এর আগে। পুব দিকের আকাশে ঠিক এই সময়েই এক অদ্ভুত রঙের খেলা শুরু হল। আকাশ জুড়ে নানা রঙের কৌটো উপুড় করে যেন ঢেলে দিয়েছে কে। সেই আশ্চর্য সুন্দর সদ্য জেগে ওঠা আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল হরেন। চোখের পাতাটি অব্দি ফেলতে ইচ্ছে করল না তার।

আজ এই প্রথম তার মনে হল পৃথিবী জায়গাটা বড় সুন্দর। হরেনের প্রাণ আকুল করে বাঁচতে ইচ্ছে করল আজ। এই সময়েই গৌরদা ডেকে উঠল তাকে পিছন থেকে, 'ছোটবাবা, কী হয়েছে তোমার? এই সাত সকালে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছো যে আজ! ঘুম থেকে উঠে তোমায় দেখতে না পেয়ে কী যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম...খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখি ভূতে পাওয়া মানুষের মতন হাঁ মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো তুমি...'

'সত্যিই আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ গৌরদা', কেমন ঘোর লাগা গলায় বলে ওঠে হরেন। 'বড় আফশোস হচ্ছে গো এই ভূতটা এতদিন কেন আমার ঘাড়টাকে এড়িয়ে গেল...'

হরেনের কথার মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারল না গৌর। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইল হরেনের দিকে। হরেন তার মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলায় বলে, 'তুমি তো বহুদিন এ বাড়িতে আছো গৌরদা?'

'তা তো আছিই', আকাশের দিকে চেয়ে বলে গৌর, 'সেই ছোট্টবেলায় বাবার হাত ধরে এসেছিলুম এ বাড়িতে। আর ফেরা হল না...'

'এই বাড়ির মধ্যে কোথাও কোনো লুকনো সম্পত্তির কথা জানো তুমি?'

'সম্পত্তি?' হাঁ করে হরেনের মুখের দিকে চেয়ে বলে গৌর।

'হ্যাঁ। গুপ্তধন', আবার বলে হরেন। 'এই পুবের জমি বা পুকুরের আশেপাশে? ওটা পাবার আমার ভারি দরকার গৌরদা। এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে আমায়। বাঁচতেই হবে। আর সেই বাঁচার জন্যে ওই সম্পত্তি আমার বড্ড প্রয়োজন।'

'মাটির চেয়ে বড় সম্পত্তি আর কি কিছু আছে গো?' গৌর হাসে। 'এই পুবের জমির মাটি বহু ফসলি। আর ওই পুকুরের জল চিরকাল মিষ্টি। গায়ে-গতরে খেটে এগুলোকে সেবা যত্ন করলে এরা তোমাকে সত্যিই সোনার মোহর ফেরত দেবে। কিন্তু কথাটা হল সেই পরিশ্রম করার মানুষ কি আর তুমি গো?'

'কেন নয়? আমি কি পারব না বলছ?'

'কে জানে', ঠোঁট উলটে বলে গৌর, 'একদিনে কি পালটে যায় সব? এ দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফল। এতদিন ধরে শরীরকে বসিয়ে বসিয়ে তুমি যে তাকে অপক্ক করে ফেলেছ...'

'সেই আমি আর নেই গো', হরেন হাসে। 'সেই অলস হরেন কাল রাতে মারা গেছে। আজ সকালে একটা নতুন হরেন জন্ম নিয়েছে। সে সব পারে। পাহাড় ফাটিয়েও জল বের করতে পারে সে।'

অবাক হয়ে হরেনের দিকে তাকিয়ে থাকে গৌর। ছেলেটাকে সত্যিই আজ কেমন অচেনা মনে হচ্ছে তার। এই কণ্ঠস্বর এই আত্মপ্রত্যয় আগে তো কখনও দেখেনি সে হরেনের মধ্যে। আজ তার সামনে সত্যিই যেন অন্য একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আনমনে ভাবতে থাকে গৌর এমন সত্যিই কি হয়? একটা রাতের মধ্যে একজন মানুষ মরে গিয়ে নতুন করে বেঁচে উঠতে পারে?

নিজের প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে চেপে রেখেই বলে সে, 'তাহলে কী বলছ, এই জমিকে মেরামত করা হবে? আর ওই পুকুর?'

'আলবাত।' জোর দিয়ে বলে হরেন।

'কাল থেকে কাজে লেগে পড়ি চলো দুজনে।'

'কাল নয়, আজ', বলে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে হরেন। কথাটা গৌরদা মিথ্যে বলেনি। মোহর কি শুধু ঘড়ায় করে মাটিতে পোঁতা থাকে? এই মাটিই যে সোনার তাল দিয়ে তৈরি। মনে মনে নগেন গোঁসাইকে একবার প্রণাম করে নেয় হরেন। সঙ্গে প্রণাম করে নেয় জীবন জেঠুকেও। জীবন জেঠুর গণনাও একেবারে ভুল ছিল না। এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়েসে সত্যিই তো মৃত্যু হল সেই পুরোনো অলস হরেনটার...



ডায়মন্ডহারবার লোকালের সেই লোকটি



সকাল থেকেই আকাশ গোমড়ামুখো। মাঝে মাঝে টিপটিপে বৃষ্টিও চলছিল। তবু আজ কলেজ কামাই করার উপায় ছিল না। আসলে কলেজে একটা ছোট-খাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল, যার আয়োজকদের মধ্যে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যগ্যবশত আমাকেও থাকতে হয়েছিল কাজকর্ম্ম করার লোক হিসেবে। অন্যদিন হলে নিশ্চিত ডুব মারতাম কিন্তু আজ দায়ে পড়ে আসা। কেননা বি.এড কলেজে এইসব অনুষ্ঠানে থাকাটা বাধ্যতামূলক। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান যে আমার ভালো লাগে না তা নয়, কিন্তু কলেজটা আমার উল্টোদিকে হয়েই যত বিপত্তি।

আসলে কলকাতা থেকে আমাদের এদিকে আসা যাওয়ার যে সুবিধা ডায়মন্ডহারবার থেকে তা নয়। এখান থেকে ফিরতে হলে একমাত্র ট্রেন ভরসা। আর একটু ভারি বৃষ্টি-টৃষ্টি হলে এই সিঙ্গল লাইনে প্রায়শই গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে সে এক ভীষণ চিত্তির। তখন তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। আর সে অপেক্ষার পর অবশেষে যখন আবার ট্রেন চলতে শুরু করে তখন আর এক বিপদের শঙ্কা কড়া নাড়তে থাকে বুকের মধ্যে। রাত একটু ঘন হলেই ট্রেন ডাকাতি লেগেই থাকে এদিকে।

আজও তাই হল। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান শেষ হবার পর যখন স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম তখন শুনলাম ট্রেন বন্ধ। অবশ্য আজকে ট্রেন বন্ধ হবার কারণ বৃষ্টি নয়। বাসুলডাঙ্গা স্টেশন ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়ে নাকি কে একজন ট্রেনে কাটা পড়েছে খানিকক্ষণ আগে। সেজন্যই নাকি বাসুলডাঙ্গায় আটকে আছে ডাউন ট্রেন। অগত্যা আমরা পাঁচ ছয়জন বন্ধু মিলে স্টেশনেই আড্ডা জুড়লাম।

অবশেষে ট্রেন যখন ছাড়া পেয়ে ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে এসে ঢুকল তখন রাত আটটা বেজে গেছে। প্ল্যাটফর্মেও ফিরতি মানুষের ঢল। সেই প্রাণপণ হুড়োহুড়িতে পাত্তা না পেয়ে আমার বন্ধু দিবাকর একটু পিছিয়ে এল। আমায় বলল,

'কি রে কী করবি বল—'

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, 'করব আর কী—যেতে তো হবেই। এই ট্রেন তো আর ছেড়ে দেওয়া যাবে না।' অন্যরাও স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে সহমত। আসলে ভিড়ের জন্য ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার বিলাসিতা এই পরিস্থিতিতে চলে না।

দিবাকর একটু হতাশ হয়ে গেল।

'সারাদিন পরিশ্রমের পর আবার এই ঠেলাঠেলি, তায় আবার এই ওয়েদার—'

দিবাকরের কথাটা মিথ্যে নয়, কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই। এই সময় প্রশান্ত বলল, 'তোরা দাঁড়া। আমি দেখে আসি কোথায় ভিড়টা একটু হাল্কা আছে—'

মিনিট দুই বাদে ছুটতে ছুটতে প্রশান্ত ফিরে এল। তারপর বেশ উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠল, ব্যবস্থা হয়েছে। চ।'

'কোথায়?' আমরা অবাক।

'একটা কামরা আছে একদম ফাঁকা। লোকজন ভয়ে ওঠেনি।'

'কিসের ভয়ে?'

'অন্ধকারের—' প্রশান্ত হাসল। 'কম্পার্টমেন্টটায় আলো নেই।'

দিবাকর হাসল। বলল, 'ভালোই হয়েছে। হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে যাওয়া যাবেখন।'

আমি বললাম, 'তাছাড়া দুটো একটা স্টেশন পেরোলেই দেখবি আমাদের মতন অন্যরাও এই কামরাটাকেই টার্গেট করতে শুরু করেছে—'

প্রশান্ত একটু ঝুঁকে সিগন্যালটা দেখে বলল, চল উঠে পড়ি। আলো হলুদ হয়েছে—

কামরাটায় উঠে আমরা হাত-পা খেলিয়ে বসতে না বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেনটা স্টেশন পার হবার সঙ্গে সঙ্গে নিকশ অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কামরার মধ্যে। আর অন্ধকারের সঙ্গে ছুটে এল একটা বিশ্রী অস্বস্তি— আমাদের সকলের মধ্যেই।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আমি বললাম, 'মানস একটা গান ধর বরং—' অন্য সময় হলে কী করত জানি না, আজকে কোনো ধানাই পানাই না করে গান ধরল ও। কিন্তু গাড়ির আওয়াজের আড়ালে হারিয়ে গেল ওর গলা। ব্যাপারটা জমছে না দেখে মানসই বলল, 'আয় তার চেয়ে সবাই মিলে কোরাস গাই—'

গান গাইতে গাইতে ভালোই সময় কাটছিল। তিন চারটে স্টেশন কখন পেরিয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। মাঝে ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমেছিল। কাজেই জানলাও বন্ধ। কিন্তু হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে আমরা গান থামালাম—

'কী চেঁচামেচি জুড়েছো—একটু শান্তিতে থাকতে দেবেনা আমায়—'

চমকে আমরা কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে কিছুই দেখতে পেলাম না অন্ধকারে—লোকটা আবার বলে উঠল, 'চুপ করে থাকো অথবা নেমে যাও এ কামরা থেকে—'

'ক্যানো নেমে যাব?' দিবাকর লোকটার শেষ কথায় বিরক্ত হয়ে বলল।

'উঠলে কেন এই কামরায়—অন্ধকারে?'

'আপনি কেনো উঠলেন?'

'আমি তো উঠিনি—আমাকে তোলা হয়েছে'—লোকটা হাসল ক্যামন ফ্যাঁসফেঁসে গলায়, মনে হল কষ্ট করে—

'মানে?'

লোকটা উত্তর দিল না।

আমাদের অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। লোকটার কথায় বার্তায় কী যেন একটা আছে যেটা আমাদের শরীরে মনে একটা কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা।

ট্রেন একটা স্টেশনে ঢুকছে। কামরার মধ্যে আলো এসে পড়েছে। আর সেই আলোয় লোকটাকে দেখা গেল এবার। সিটের ওপর পা তুলে উঁচু হয়ে বসেছে লোকটা। মাথা দু-হাঁটুর ওপর নোয়ানো। একটা চাদর ওপর দিয়ে ঢাকা—

কিন্তু চাদরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে যে দাগটা কালচে মতন, ওটা—ওটা কি? সিটের নীচে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরতে ঝরতে এখন গড়াতে শুরু করছে যেটা—যার ওপর ভন ভন করে উড়ছে

একপাল মাছি—

অ্যা তো রক্ত—অ্যা তো রক্ত—

আমার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ব্যাপারটা ওরাও দেখেছে এবং মুখ ওদের ফ্যাকাশে।

ট্রেনও চলতে শুরু করেছে আবার।

'আপনি কি অসুস্থ?' জিগ্যেস করল মানস। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওর গলা কাঁপছে। বুক কাঁপছিল আমারও। লোকটা ডাকাত-টাকাত নয়তো? হয়তো পুলিশ বা কারো সঙ্গে এনকাউন্টারে আহত হয়েছে লোকটা। মাঝে এমন গল্পও শুনেছিলাম যে এই ট্রেনে সদ্য কাটা গয়না সমেত মহিলার হাত নিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এক ডাকাত—আর সেও ধরা পড়েছিল তার হাতের চটের ব্যাগের মধ্যে থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তের ফোঁটা দেখে সহযাত্রীদের সন্দেহ হওয়ায়। তবে কি এই লোকটাও—

সাহস সঞ্চয় করে আমি জিগ্যেস করলাম 'কে আপনি?'

অন্ধকার থেকে কোনো উত্তর এল না।

'আবার জিগ্যেস করলাম আমরা সবাই একসঙ্গে, 'বলুন আপনি কে? এত রক্ত কেন আপনার চারপাশে?

'আমাকে একা থাকতে দাও। বিরক্ত কোরো না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার—'

আমাদেরও জেদ চেপে যাচ্ছে তখন।

'চালাকি করবেন না। ভুলে যাবেন না আপনি একা আর আমরা ছ'জন—'

লোকটা উত্তর দিল না। শুধু গোঙানির মতন অদ্ভুত আওয়াজ এল একটা।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছি এখন। অন্যরাও। স্টেশন আসছে। দূরে আলোর রেখা—সেই আলো ক্রমশ কাছে আসছে এখন। বাইরেও দুটো একটা বাড়ি আর ছোটখাটো দোকান চোখে পড়ছে। ট্রেনের মধ্যে ঠিকরে আসছে হালকা আলোর রেখা—

আমরা লোকটার দিকে এগোতে শুরু করলাম—বিরক্ত হয়ে লোকটা এবার উঠে দাঁড়াল। হিসহিসে ঠান্ডা গলায় বলল, 'সত্যি জানতে চাও কে আমি?'

'চাই', আমরা এখন ভীষণ উত্তেজিত।

'সহ্য করতে পারবে?'

'চালাকি রাখুন—'

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সম্ভবত হোটর। লোকটা গায়ের চাপা সরিয়ে ছুঁড়ে দিল—আর আমরা দেখলাম লোকটার মাথার একটা অংশ প্রায় নেই— আর বাকি অংশটা দোমড়ানো থ্যাঁতলানো—বীভৎস—বীভৎস—সে বীভৎসতা বলে বোঝানো যায় না—

ট্রেনের হুইসেলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এখন লোকটার ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হাসি—

'বাসুলডাঙ্গায় একটু আগে এই ট্রেনটা, এই ট্রেনটাই আমাকে এই জগৎ থেকে ছিটকে ফেলে দিল পরলোকে—অথচ আমি এখানে থাকতে চাই— থাকতে চাই—'

গাড়ি দুলে উঠেছে। লোকটা এখন মুর্তিমান পিশাচের মতো এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। গাড়ি গতি বাড়াবার আগেই ঝড়ের মতো পরপর প্ল্যাটফর্মের ওপর লাফিয়ে পড়লাম আমরা—চলন্ত ট্রেন থেকে অন্য সব শব্দ ছাপিয়ে তখনও ভেসে আসছে এক ক্রুর হাসি। আর ট্রেনে শেষবারের মতো ভেসে উঠল সেই বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর মুখ, যে মুখ কখনও ভোলা যাবে না এ জীবনে।



নতুন আনা রেডিও



আজকাল রেডিও আর তেমন শোনাই হয় না প্রিয়নাথের। অথচ একটা সময় ছিল যখন রেডিও ছাড়া একটা সারাদিনের কথা ভাবতেই পারতেন না তিনি। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে রাতের বেলা রেডিওর খবর না শুনলে খাবার হজমই হত না সে সময়। এ ছাড়া গান নাটকের আকর্ষণ তো ছিলই। এসব কথা মনে পড়লে আজকাল নিজেই অবাক হয়ে যান প্রিয়নাথ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোই শুধু নয় তাদের যাবতীয় অভ্যাসও সব ক্যামন পাল্টাতে থাকে।

টেলিভিশনের যুগে এমনকী প্রিয়নাথেরও আর রেডিও শোনার কথা সারাবছরে মনেই পড়েনা তেমন। শুধু যখন বর্ষা পেরিয়ে আকাশের নীল শরীরে সাদা সাদা মেঘের দল ভাসতে শুরু করে, আর শিউলি গাছ থেকে টুপ টাপ ঝরতে শুরু করে শিউলিফুল, তখন রেডিওটাকে আবার বের করে আনেন প্রিয়নাথ। ওটার ঝাড়পোঁছ শুরু হয়, ব্যাটারি পালটে যত্ন করে বসানো হয় শোবার ঘরে মাথার পাশের কাঠের টুলটার ওপরে। আসলে মহালয়ার ভোরে আকাশবানী থেকে প্রচারিত প্রভাতি অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলায় চন্ডীপাঠ না শুনলে এখনো পুজো এসেছে বলে বিশ্বাসই হয় না প্রিয়নাথের। সেই কোন ছেলেবেলা থেকেই এই অনুষ্ঠানটা শুনে আসছেন। তবু আজো ওটা পুরোনো হল না একটুও। পুজোর মাস এসে যেতেই যথারীতি রেডিওটা আবার তাক থেকে নামালেন তিনি। ধুলো ঝাড়লেন মনোযোগ দিয়ে। তারপর নতুন ব্যাটারি পরিয়ে চালু করলেন ওটাকে প্রতি বছরের মতন।

কিন্তু এ বছর রেডিওটা আর চালু হল না। প্রিয়নাথ রেডিওটা চালু করার বিস্তর চেষ্টা করলেন। চাপড়-চোপড় মারলেন খানিক রেডিওটার গায়ে। তবু কোনো আওয়াজ বের করতে পারলেন না ওর মধ্যে থেকে। প্রিয়নাথের স্ত্রী একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা চুপচাপ দেখছিলেন এতক্ষণ। এবার বলে উঠলেন, 'কতবার বলেছি ওটার মায়া কাটাও এবার। দরকার মনে করলে ছোট একটা নতুন সেট কিনে নাও দোকান থেকে। কস্মিনকালে কোনো কথাই তো তুমি শুনলে না আমার।'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন দুদিকে, 'কী করে তোমাদের বোঝাই বলো দিকিনি, আসলে রেডিওটার মূল্য আমার কাছে অন্য কারণে অনেকখানি। বাবার আদরের জিনিস, তাছাড়া সেই শৈশবকাল থেকে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এটার সঙ্গে—'

'তাহলে স্মৃতি নিয়ে বসে থাকো আর মাঝে মাঝে চড়-থাপ্পড় কষাও ওটার ওপর', হালকা হেসে বললেন তাঁকে সুতপা।

'দেখা যাক', বলে উঠে পড়লেন প্রিয়নাথ। আলনা থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে গলালেন। তারপর রেডিওটা হাতে নিয়ে বললেন, 'যাই, জিনিসটা শম্ভুদাকে দেখিয়ে আনি একবার—'

শম্ভু মুখুজ্জে এলাকার পুরোনো দোকানদার। আজকাল রেডিও সারানোর ভালো মিস্ত্রী পাওয়া খুবই মুশকিল। এসব দোকান উঠেই যাচ্ছে ক্রমশ। তার মধ্যে শম্ভু মুখুজ্জে এখনও দোকানটাকে টিকিয়ে রেখেছেন কোনওমতে। খদ্দেরপাতি তেমন আসে না। তবু অন্য কোনো ব্যবসাপত্তরের কথা তিনি ভাবেননি কখনও। শম্ভুবাবুর বয়েস প্রিয়নাথের বাবার থেকে এমন কিছু হয়ত কম নয়। তবু কেন কে জানে ওর বাবাকে তিনি কাকাবাবু বলে ডাকতেন চিরকাল। আর প্রিয়নাথও ছেলেবেলা থেকে তাঁকে

বলেন শম্ভুদা। শম্ভুদা মানুষটা খুব সৎ, প্রিয়নাথকে ভালোও বাসেন। অতএব তাঁর কাছে গেলে রেডিওটার নিশ্চিত হিল্লে হবে ভেবে তাঁরই শরনাপন্ন হলেন প্রিয়নাথ।

শম্ভু মুখুজ্জে রেডিওটা অনেকক্ষণ নাড়লেন চাড়লেন। স্ক্রু ট্রু খুলে ভেতরটা দেখলেন মন দিয়ে। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'ভরসা দিতে পারছি না ভায়া, তবু বিকেলে একবার খোঁজ নিয়ে যেয়ো। দেখি ব্যাটাকে দিয়ে কথা বলাতে পারি কিনা।'

বিকেলে কাজ ছিল একটা। সেটা মিটিয়ে দোকানে আসতে সন্ধে হয়ে গেল। শম্ভু মুখুজ্জে একলাই বসে ছিলেন দোকানে। প্রিয়নাথ বেশ আশা নিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'শম্ভুদা রেডিওটা হয়েছে?'

'না হে বাপু', ব্যাজার মুখে বললেন শম্ভু মুখুজ্জে, 'এবার কাকাবাবুর রেডিওর মায়া তোমায় ছাড়তেই হবে মনে হচ্ছে।'

'সারা গেল না?' বিমর্ষ গলায় বলেন প্রিয়নাথ।

'সারা গেল না নয়, সারা যাবে না আর', শম্ভু ম্লান হাসেন। 'আগেকার আমলের জিনিস বলে এতকাল সার্ভিস দিল একটানা। এখন বিগড়েছে। কিন্তু এর স্পেয়ার পার্টস আর তো ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া যাবে না ভায়া।'

'তাহলে উপায়?' হতাশ গলায় বলেন প্রিয়নাথ, 'মহালয়ার অনুষ্ঠানটা শুনতে সত্যিই তাহলে নতুন রেডিও কিনতে হবে এবার!'

'অগত্যা', বলে একটু কী ভাবেন শম্ভু মুখুজ্জে। তারপর প্রিয়নাথের দিকে চেয়ে বলেন, 'আপাতত একটা কাজ তুমি করতে পারো ভায়া।'

'কী বলুন দেখি?' উৎসাহিত হয়ে বলেন প্রিয়নাথ।

'আজ সকালে একজন আমায় একটা রেডিও দিয়ে গেছে। লোকটা আমার যে খুব পরিচিত তা নয়, তবু বিশ্বাস করে পুরোনো রেডিওটা আমার জিম্মায় রেখে সে বলল যে ওটা নাকি সে বেচতে চায়। তার নিজের বাড়িতে ওটার কোনো প্রয়োজন নেই, কাজেই আমার কাছে দিয়ে গেছে। বলেছে বিক্রি হলে তাকে কিছু দেবার হলে দিতে, বিক্রি না হলে আমার কাছেই রেখে দিতে।'

'অদ্ভুত তো—'

'আর বলো কেনো, কত কিসিমের লোকজন যে রয়েছে দুনিয়ায়', শম্ভুদা চোখ গোল গোল করে বলে। 'এ রেডিও পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না আর। কী সাউন্ড, নিজে কানে না শুনলে ভাবতে পারবে না। এ জিনিসের এমন অযত্ন করে কেউ—একসময় কারও শখের জিনিস ছিল নিশ্চয়ই।'

'তা তো বটেই', প্রিয়নাথ সায় দেন তাঁর কথায়।

'আমি বলি কি ওই রেডিওটাই বরং তুমি নিয়ে যাও, আপাতত শোনো টোনো, পরে পছন্দসই মনে হলে নামমাত্র দামে কিনে নিও আমার থেকে।'

ব্যবস্থাটা মনে ধরে গেল প্রিয়নাথের। রেডিওটা বাড়ি এনে ব্যাটারি ভরে একবার চালিয়ে দেখে নিলেন তিনি। শম্ভুদার কথা মিথ্যে নয়। রেডিওটার আওয়াজ সত্যিই ভারী সুন্দর। মহালয়ার আগে

কদিন চালিয়ে টালিয়ে নিলে আওয়াজটা আরও খোলতাই হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। বিছানার পাশে কাঠের টুলের ওপরে ওটাকে অন্যান্য বছরের মতনই জায়গা করে দিলেন প্রিয়নাথ।

সাধারনত রাতে প্রিয়নাথ ভালোই ঘুমোন। এক ঘুমে রাত কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠে জানলার ওপাশে। অথচ আজ ঘুমটা ভেঙে গেল। গত প্রায় দশ বছর রাতে একাই ঘুমোন তিনি। তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর এ ঘরে কেউ ঢোকে না কখনও। কিন্তু আজ বার বার মনে হচ্ছে কে যেন ঘরে ঢুকেছে। আলো নেভানো। জানলা দিয়ে বাইরের স্ট্রিট লাইটের আবছা আলো ঢুকে এসেছে ঘরে। একটুখানি চোখ চেয়ে থাকার পর ঘরের ভেতরটা এখন ভালোই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কাউকেই দেখতে পেলেন না প্রিয়নাথ। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা। খিল দেওয়া নেই অবশ্য। থাকেও না কখনও। তাঁর ঘরে আসবাবপত্রের এমন বাহুল্য নেই যে তার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে কেউ। প্রিয়নাথ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। এমন তো আগে কখনও হয়নি। সন্তর্পণে বিছানা থেকে তিনি উঠলেন। ঘরের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি বোলালেন। জল খেলেন। তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লেন বিছানার ওপর। আর ঠিক তখনই আওয়াজটা শুনতে পেলেন তিনি। একটানা। কর্কশ। ঘড়ঘড়ে গলায় কে যেন একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে প্রাণপনে। প্রথমটা ভারি ঘাবড়ে গেলেন প্রিয়নাথ। ভয়ও পেয়ে গেলেন খানিকটা। সাধারণত এ বয়েসে ভূতের ভয় পাওয়ার কথা নয়। তাই ওই ভয়টাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। ভয়টা অবশ্যি মনের মধ্যে রয়েই গেল।

ভূত নেই এ কথাটা প্রাণপনে ভাবতে ভাবতে তিনি আজ আবার আবিষ্কার করলেন ভূতকে বিশ্বাস করা এবং ভয় পাওয়া দুটোই মনের মধ্যে দিব্বি রয়ে গেছে তাঁর এখনও পর্যন্ত। আর এই সময়েই রেডিওটার দিকে নজর পড়ল তাঁর। ঘটনার আকস্মিকতায় ওটার কথা মনেই পড়েনি এতক্ষণ। ভুল নেই বিটকেল শব্দটা রেডিওর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসছে। প্রিয়নাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। সাহসটাও ফিরে এল আবার। তিনি রেডিওটার কাছে এগিয়ে গেলেন। ঘুমনোর আগে কি ওটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিলেন? আপন মনে মাথা নাড়লেন প্রিয়নাথ। উঁহু, এমন ভুল তো হবার কথা নয়। তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে নব ঘুরিয়ে বন্ধ করে তবে শুতে গিয়েছিলেন তিনি। তাহলে কে চালাল রেডিওটা—ভাবনাটা মাথায় আসতেই চলে যাওয়া ভয়টা আবার ফিরে এল মনের মধ্যে। চিন্তাটা মাথা থেকে সরাতে নিজেই নিজেকে বোঝালেন তিনি, পুরোনো জিনিস, কানেকশন লুজ টুজ আছে নিশ্চিত।

আওয়াজটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। সে রাতে রেডিওটা আর সমস্যা করল না কোনো। কিন্তু একটা অস্বস্তি যেন মাথার মধ্যে থেকেই গেল প্রিয়নাথের। বার বার মনে হতে লাগল কাল রাতের ঘটনাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা বোধহয় নাও হতে পারে। কথাটা অবশ্য বাড়িতে আর কাউকে তিনি জানালেন না। অযথা অন্যদের দুশ্চিন্তায় ফেলে তো লাভ নেই। সকালে রেডিওটাকে নিজের ঘরে বিছানার পাশের টুলের ওপরে বসিয়ে রেখেই অফিসে রওনা দিলেন তিনি।

বাড়ি ফিরতেই সুতপা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথকে। অফিস থেকে ফিরে বাইরের জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে সবে এসে বিছানায় বসেছেন, তাঁর হাতে চায়ের কাপটা ধরিয়ে দিয়েই জিগ্যেস করলেন সুতপা, 'লোকটা কে ছিল গো, শম্ভুদার দোকানের কেউ?'

'কোন লোকটা?' প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন প্রিয়নাথ, 'কার কথা বলছ বলো দিকিনি?'

'কোন লোকটা আবার, যে সকালে তোমার ঘরে বসে রেডিওটা নাড়াচাড়া করছিল। বয়স্ক মানুষ, ধুতি আর ফতুয়া পরা, মাথায় টাক। তুমি তখন বাথরুমে। লোকটাকে ঘরে দেখে আমি আর ওদিকে যাইনি বাপু। কখন চলে গেলেন তাও খেয়াল করিনি। তারপর তুমি অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পরেও আবার একসময় দেখলাম রেডিওটা হাতে নিয়ে বসে আছেন। আমি চা খাবেন কিনা জিগ্যেস করতে মৃদু হেসে মাথা নেড়ে না বললেন।'

'কই আমি তো জানি না কিছু', অবাক হয়ে বললেন প্রিয়নাথ। 'তোমার ভুল হচ্ছে না তো কোথাও, ঠিকঠাক দেখেছ তো?'

'কি যে বলো, ভুল হবার উপায়ই নেই কোথাও। আমি যে ভদ্রলোকের সাথে কথা বললাম—'

প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়ল। মুখে আর কোনো কথা না বলে গম্ভীর হয়ে রইলেন তিনি। রাতে খাবার সময়েও আজ আর বিশেষ কথা-টতা বললেন না। দরজা ভেজিয়ে রেডিওটা ঠিক মতন অফ করা হয়েছে কিনা আর একবার দেখে নিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। সারাদিন অফিসে খাটাখাটনি গেছে, কাজেই ঘুম আসতে দেরি হল না। প্রিয়নাথ ঘুমিয়ে পড়লেন অঘোরে। কিন্তু আজ আবারও রাত দুটো নাগাদ ঘুমটা ভেঙে গেল তাঁর। ঘরের মধ্যে ঘড়ঘড়ে গলায় কে যেন একটা কিছু বলতে চাইছেন প্রাণপনে। প্রিয়নাথ সাহসী মানুষ, তবু আজ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তাঁর। সকালে সুতপাও একটা লোককে এই ঘরের মধ্যে দেখেছিল। এই জড়ানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজটার সঙ্গে ওই বুড়ো লোকটার কি কোনো সম্পর্ক আছে?

প্রিয়নাথ চোখ না খুলেই কানদুটোকে সজাগ করলেন। আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন মন দিয়ে। একটুখানি শোনার পরেই প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। আওয়াজটা স্পষ্ট নয় ঠিকই, তবু কান খাড়া করে শুনলে দিব্বি বোঝা যাচ্ছে একজন বয়স্ক মানুষ কাকে যেন বার বার মিনতি করে বলার চেষ্টা করছেন, 'কাজটা তুমি ঠিক করছ না রমেশ। কটা টাকার লোভে এ ভাবে খুন করছ তুমি আমায়। পাপ কিন্তু কিছুতেই চাপা থাকেনা। তুমি হয়ত ভাবছ আমার এই মৃত্যু বৃদ্ধ বয়েসের স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ঠিক চালিয়ে দেবে, আর তোমার শাকরেদ ওই ডাক্তার ছোঁড়াটাকে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেটও লিখিয়ে নেবে টাকার ভাগ দেবার লোভ দেখিয়ে। তবু বলছি তোমায় সত্যি কিন্তু প্রকাশ পাবেই।' একটা বিকট হাসিতে বয়স্ক মানুষটার গলা চাপা পড়ে গেল।

প্রিয়নাথ লাফিয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসলেন। রেডিওটা থেকে একটা হালকা চোঁ-ওও—করে আওয়াজ বের হচ্ছে এখন। প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। রেডিওটা বন্ধ করলেন নব ঘুরিয়ে। তারপর ভাবতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে। রেডিওয় কি কোনো নাটক চলছিল?

রহস্য গল্প-টল্প কিছু পাঠের অনুষ্ঠানও হতে পারে। পরক্ষণেই নিজের মনে উদয় হওয়া সম্ভাবনা নিজেই খারিজ করে দিলেন তিনি। তা কি করে হবে! এত রাতে রেডিও স্টেশন খোলা থাকার তো কথা নয়। তার চেয়েও যেটা বড় কথা রেডিওটা অন করল কে? রাত্তিরে শুতে যাওয়ার সময় রেডিওটা নিজে হাতে বন্ধ করেছেন প্রিয়নাথ, এমনকী শেষ মুহূর্তে আরো একবার দেখেও নিয়েছিলেন আগের রাতের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে। তাহলে!

পাখার ঠিক নীচে বসেও প্রিয়নাথ ঘামতে শুরু করলেন। রেডিওটার দিকে চোখ পড়তেই গা ছমছম করে উঠল তাঁর। রেডিওর মধ্যে থেকে ভেসে আসা কথাগুলোকে মনের মধ্যে আর একবার ঝালিয়ে নিলেন তিনি। রমেশ নামটা মনে মনে দুবার আওড়ে নিলেন প্রিয়নাথ। কাল অফিস ফেরত শম্ভুদার দোকানে গিয়ে রেডিওর মালিক সম্পর্কে একটু বিশদ খোঁজ খবর করাটা বড্ডই জরুরী বলে মনে হল তাঁর।

প্রিয়নাথের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন শম্ভু মুখার্জী। বার কয়েক মাথা নাড়লেন চিন্তান্বিত মুখে। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে তো ভাবতে হচ্ছে ভায়া। তুমি বললে বলে মনে পড়ল যেদিন অচেনা লোকটা এসে রেডিওটা গছিয়ে গেল আমায় সেদিন লোকটা চলে যেতেই দেখি দোকানের ওপাশের ফুটপাতে বয়স্ক একজন মানুষ স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সারাদিন কত মানুষই তো কত ফিকিরে ঘুরছে চারদিকে, কাজেই আমি গুরুত্ব দিইনি ব্যাপারটায়। একটু পরে লোকটাকে দেখতেও পাইনি আর। আবার দেখলুম তোমায় রেডিওটা দেবার পর। মনে হল তোমার পিছন পিছন লোকটাও যেন হেঁটে গেল রাস্তা দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল তোমারই চেনা জানা কেউ হয়তো—'

'কেমন দেখতে বলুন তো লোকটা?' উত্তেজিত হয়ে জিগ্যেস করেন প্রিয়নাথ।

'যেমন তুমি বললে হুবহু সে রকমই, বউমার বিবরণের সঙ্গে এক্কেবারে মিলে যাচ্ছে হে—'

'এখন কী করা উচিত বলুন দিকিনি তাহলে?' খুবই চিন্তাগ্রস্ত গলায় বলেন প্রিয়নাথ।

'দাঁড়াও, সেই ছোঁড়াটার দেওয়া ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করি আগে', বলে একটা ক্লিপ বোর্ডে আটকে রাখা গুচ্ছের কাগজ পত্র হাঁটকাতে শুরু করলেন শম্ভুবাবু। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে একটা কাগজ হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই মারাত্মক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন শম্ভু মুখজ্জে। গোল গোল চোখে প্রিয়নাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'এ যে সব্বোনেশে ব্যাপার হে প্রিয়নাথ।'

'কেনো, কী হল শম্ভুদা?' প্রিয়নাথ কৌতূহলী কণ্ঠে জিগ্যেস করেন।

'ছোঁড়াটা নিজের নাম তো রমেশ বলেই লিখেছে হে, রমেশ তপাদার। চাম্পাহাটির দিকে বাড়ি। মোবাইল নম্বরও দিয়ে রেখেছে একখানা।'

'ওই নাম্বারে কি ফোন করে দ্যাখা হবে একবার?'

'ক্যানো?'

'বয়স্ক মানুষটার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় যদি।'

'মাথাটা গেছে বাপু তোমার,' চাপা গলায় বললেন শম্ভু মুখুজ্জে।

'কী বলতে চাচ্ছেন বলুন তো শম্ভুদা?' অবাক হয়ে বলেন প্রিয়নাথ। মাথা সত্যিই আর কাজ করছিল না তাঁর। সব ক্যামন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। বুড়ো লোকটা সত্যি সত্যিই তাহলে—প্রিয়নাথের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বইতে শুরু করল হঠাৎ। হাত পা ঝিন ঝিন করছে। দোকানের একটা টুলের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন প্রিয়নাথ। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়েছে তখন। প্রিয়নাথের মনে হতে লাগল সেই বৃদ্ধ লোকটা রাস্তার ও পারে দাঁড়িয়ে তাঁকে একদৃষ্টিতে যেন দেখছে সর্বক্ষণ। প্রিয়নাথ ভয়ানক ভয় পেলেন। ভয় পাওয়া গলাতেই বলে উঠলেন শম্ভু মুখুজ্জেকে, 'বুড়ো লোকটা সত্যিই তাহলে খুন হয়েছে বলছেন ওই রমেশের হাতে?'

'খোঁজ নিতে হবে,' তার দিকে চেয়ে আশ্বাসের ভঙ্গীতে বললেন শম্ভু মুখুজ্জে। 'হতেই পারে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের কল্পনা হয়তো।' প্রিয়নাথ অবশ্য আশ্বস্ত হলেন না বড় একটা। কল্পনার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর কান যে ভুল শোনেনি তা তো প্রমাণিত। ছেলেটার নাম সত্যিই যে রমেশ। আর সুতপার চোখও তো ভুল দেখেনি। তাঁর দেখার সাথে শম্ভুদার দেখা হুবহু মিলে যায় কী করে যদি তাঁর চোখ ঠিক না দেখে থাকে। শরীরের অস্বস্তিটা আবার ফিরে এসেছে এখন প্রিয়নাথের। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ঢক ঢক করে তিনি জল খেলেন খানিক। তারপর শম্ভুদার দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতন মুখ করে বলে উঠলেন, 'শম্ভুদা, আমায় আজ একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন?'

বাড়ি ফিরতেই সুতপা মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'কী যে কর না, বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখে যাচ্ছ, বলেও যাও না কিছু, আমরা যে কী মুশকিলে পড়ি—'

'কী হল আবার, কাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে রেখে গেলাম?' কাঁপা গলায় জিগ্যেস করেন প্রিয়নাথ।

'সেই বুড়োটা,' সুতপা হেসে বলেন, 'তুমি বেরিয়ে যেতেই তোমার ঘরে সেই রেডিওটা নিয়ে পড়লেন। আমি ঘরে উঁকি মারতেই নিজে থেকেই ভারি গলায় বললেন চা লাগবে না—'

'আর কিছু বললেন?' সুতপাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন প্রিয়নাথ।

'বললেন। তবে সব কিছু মাথায় ঢুকল না আমার।'

'যেমন?'

'বলছিলেন রেডিওটা ওঁর খুব প্রিয় তবু তোমায় দিয়ে দেবেন যদি রমেশের দুষ্কর্মের শাস্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারো তুমি। সেই আশা নিয়েই উনি নাকি তোমার কাছে আসেন। ওই রমেশ না কে তার ওপরে ওনার খুব রাগ জানো তো, ওই নাকি—'

'ওই নাকি'—আতঙ্কিত গলায় বলে ওঠেন প্রিয়নাথ। সুতপা কতখানি জানে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছিলেন না তিনি। সুতপা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। চেনা মানুষটাকে আজ ক্যামন যেন অন্যরকম লাগছে। খুব চিন্তাগ্রস্ত, ভয় পাওয়া। প্রিয়নাথকে আগে কখনও এমন দেখেননি সুতপা। নিজের কথা থামিয়ে তাঁকে জিগ্যেস করেন তিনি, 'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছু না,' হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন প্রিয়নাথ, 'ওই ভদ্রলোকের সাথে বেশি কথা-টথা বোলো না আর।' নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকেন প্রিয়নাথ। সুতপা আর জিগ্যেস করেন না কিছু। তবে প্রিয়নাথের চেহারা আর কথাবার্তায় একটা অজানা রহস্যের আঁচ পান তিনি। রহস্যের গন্ধ রয়েছে ওই বৃদ্ধ মানুষটাকে নিয়েও। কে ওই লোকটা, ক্যানো ওই রেডিওটার কাছে এসে বসে থাকে সে। প্রিয়নাথ থাকতে লোকটা আসে না কেনো?

সকাল হতে না হতেই শম্ভুদা এসে হাজির। প্রিয়নাথ নিজের ঘরেই বসে ছিলেন। আজ অফিসে যাবার মেজাজ নেই। শরীরটাও যেন বড় অবসন্ন লাগছে। সারা রাত ঘুম নেই চোখে। রেডিওটার দিকে তাকালেই গা ঘেমে উঠছে ভয়ে। মনে হচ্ছে এখুনি ওটাকে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতে। শম্ভুদার ওপরেও রাগ হচ্ছিল খুব। কী দরকার ছিল যেচে এ রেডিওটা তাঁর হাতে গছিয়ে দেবার। কাল রেডিওর মধ্যে থেকে সটান তাঁর চোখের সামনে হাজির হয়েছিল লোকটা। প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারেননি তিনি। রেডিওটা চুপ ছিল। আগের দুদিনের মতন আচমকা বেজে ওঠেনি মাঝ রাত্তিরে। তবুও একটা দমবন্ধ করা অস্বস্তির মধ্যে ঘুমটা ভেঙে গেল তাঁর। জল খাবার জন্যে বিছানায় উঠে বসতেই লোকটাকে চোখে পড়ল। রেডিওটা কোলে নিয়ে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। লোকটাকে দেখে এমন চমকে উঠলেন প্রিয়নাথ যে আর একটু হলে হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যেত। লোকটা স্থির চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে অস্বাভাবিকভাবে। গলার কাছটা কে যেন টিপে ধরেছে মনে হচ্ছে দু-হাত দিয়ে। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তাঁর। অতি কষ্টে বলে উঠলেন তিনি লোকটার দিকে চেয়ে, 'কী চান আপনি?'

'রমেশের শাস্তি।' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে ওঠেন সেই বৃদ্ধ চাপা স্বরে।

'আপনি আমার কাছ পর্যন্ত যখন ধাওয়া করেছেন এ শাস্তি আপনি নিজেই তো তাকে দিয়ে দিতে পারেন।' মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করেন প্রিয়নাথ, 'আমার জীবন এমন বিপন্ন করে তুলেছেন আপনি, আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি—'

'পারি', খসখসে গলায় উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। 'শাস্তি তাকে নিজে হাতে দেবোও হয়তো, কিন্তু তাতে জগত এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারবে না। আমি তার কুকীর্তি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই।'

'আমি কী করতে পারি এ বিষয়ে বলুন—'

'পুলিশকে ইনফরম করুন আসল সত্যিটা।'

'পুলিশকে আমি বললেই শুনবে কেনো তারা, আমার হাতে তো প্রমাণ নেই কোনো।'

'লাগবে না। আপনারা সোনারপুর থানার বিপ্লব বোসের সাথে যোগাযোগ করুন। ছেলেটা ভালো। আমায় চিনত। আমার নাম হরিচরণ মিত্র। ওকে সব কথা বলুন', বলতে বলতে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে

গেলেন ভদ্রলোক। প্রিয়নাথ অনেক কষ্টে চেতনাটা জিইয়ে রেখেছিলেন এতক্ষণ। লোকটাকে চোখের সামনে হাওয়ায় মিশে যেতে দেখে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইলেন বিছানার ওপরে। জ্ঞান ফিরল সকালের দিকে। নিজেই উঠে বসলেন তিনি। জল খেলেন। জানেন সুতপাকে এসব জানতে দেওয়া যাবে না। একটু পরে হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে এসে বসলেন তিনি। তখনি সুতপা খবর দিলেন যে শম্ভু মুখুজ্জে এসে বসে আছেন বাইরের ঘরে। একেবারে তৈরি হয়েই বাইরে এলেন প্রিয়নাথ। সোনারপুর থানায় যেতে হবে আজই। ব্যাপারটা যত দ্রুত সম্ভব হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে।

তাঁকে বাইরে আসতে দেখে উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন শম্ভুবাবু। বললেন, 'ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড ভায়া, রেডিওটা রমেশবাবুর কাকা হরিচরণ মিত্তিরের। কদিন আগেই হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক। চাম্পাহাটিতে আমার এক পুরোনো কাস্টোমার আছে, তার কাছে খবর নিয়ে জানলুম।' প্রিয়নাথ অবাক হলেন না। সুতপার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'একটু চা খেয়ে নিয়ে বেরোতে হবে শম্ভুদা, সোনারপুরে। চলুন দুজনে মিলে ঘুরে আসি।'

'এখুনি?' শম্ভু মুখুজ্জে ইতস্তত করছিলেন, 'বাড়িতে জানে না, তাছাড়া দোকানে কিছু আরজেন্ট কাজ ছিল—'

'পরে হবে ওসব, এখন আর দেরি করার মতন সময় হাতে নেই দাদা। আর দেরি করলে আমার পৈতৃক প্রাণটা নিয়েই না টানাটানি পড়ে যায়।'

'ঠিক আছে', শম্ভু মুখুজ্জে বললেন, 'তবে বেরোনোর আগে বাড়িতে বলে যাই একটু। বয়েস হয়েছে তো, বাড়িতে চিন্তা করবে না বলে কয়ে হুট করে কোথাও চলে যাই যদি।'

বিপ্লব বসু মানুষটা সত্যিই ভারি ভালো। সব শুনে গম্ভীর মুখে প্রিয়নাথ আর শম্ভু মুখার্জীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'ভেরি স্যাড। যদিও এক্ষুনি আইনের চোখে ব্যাপারটা স্ট্যান্ড করানো যাবে না। হরিচরণবাবুকে আমি চিনতাম। ভারি ভালো মানুষ ছিলেন। আমি কথা দিচ্ছি বিষয়টা গুরুত্ব দিয়েই দেখব আমি।'

রমেশ তপাদার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন হরিচরণ মিত্রের খুনের মামলায়। অবিবাহিত কাকার বিপুল টাকার এল.আই.সি.-র নমিনি ছিলেন তিনিই। ভদ্রলোক লোভে পড়ে অপেক্ষা করতে পারেননি আর। তাঁর বন্ধু ডাক্তারও নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন পুলিশি জেরায়। তিনি এখন জেলে।

তবে রমেশ তপাদারকে জেলে রাখা যায়নি। শাস্তি ঘোষনার পরদিনই কোনো এক অজ্ঞাত কারনে তিনি পাগল হয়ে যান। অজানা আতঙ্কে সবসময়েই কুঁকড়ে রয়েছেন তিনি, কার কাছে আপন মনে ক্ষমা চাইছেন সর্বক্ষণ। চিকিৎসার কারণে রমেশ তপাদারকে আপাতত মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখা

হয়েছে। হরিচরণ সুতপাকে বলেছিলেন রমেশের শাস্তির বন্দোবস্ত করলে রেডিওটা প্রিয়নাথকেই দেবেন।

সোনারপুর থানায় বিপ্লব বসুর সাথে কথা বলার পর থেকে সত্যি-সত্যিই হরিচরণ মিত্তির তাঁর ধারে কাছে আসেননি আর। তবু রেডিওটা প্রিয়নাথ আর নিজের কাছে রাখতে রাজি হননি। শম্ভু মুখুজ্জে বললেন, 'আমিও জেনেশুনে ও জিনিস আর কাছে রাখব না ভায়া।' কাজেই সেটা অফিস যাওয়ার পথে একদিন গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছেন প্রিয়নাথ। এ বছরই প্রথম মহালয়ার দিন ভোরে রেডিওর প্রভাতি অনুষ্ঠান শোনা হয়নি তাঁর। দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। শম্ভু মুখুজ্জে অবশ্য এই বলে অভয় দিয়েছেন তাঁকে যে কয়েকটা দিন সবুর করলে নিজে হাতে একটা বাঘের বাচ্চার মতন রেডিও বানিয়ে দেবেন, অন্তত দু-পুরুষ হেসে খেলে চলে যাবে ওটায়। নতুন রেডিও কেনার হ্যাপায় অন্তত প্রিয়নাথকে আর এ জীবনে অন্য কোনো বিপদে পড়তে হবে না কোনোদিনই।





আত্মারামের নামের শেষের ওই রাম শব্দটিতে প্রবল আপত্তি ভূতেশ স্যারের। তাঁর সাফ কথা এই স্কুলে রামান্তক কোনো শব্দ দিয়ে নাম ব্যবহার করা যাবে না। আত্মারাম তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, সত্যি সত্যি তো আর রামনাম উচ্চারণ করতে কোনো কষ্ট হয় না তাদের। তাছাড়া যখন বেঁচেছিল তখন একটা গল্পের বইতে নিধিরাম নামে একজন ভূতের কথা পড়েছিল সে। ভূতেশ স্যার কিছুতেই এ কথা মানবেন না। আত্মারামের কানে কটাং করে একটা চিমটি কেটে বললেন তিনি, 'কদিনের ভূত তুমি হে যে অত লম্বা চওড়া কথা কইছো? ভূতেদের নিয়ম কানুন, আদব কায়দা ঐতিহ্য সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি! এখনও গাল টিপলে মানুষের গন্ধ বেরোয়, আর তুমি এলে কিনা আমায় জ্ঞান দিতে—'

আত্মারাম অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে মাথা চুলকোয়। তারপর মিনমিন করে বলে, 'জ্ঞান দেওয়া নয় স্যার, ওই গল্পে পড়েছিলাম একসময়, তাই—'

'গল্পে কিনা হয়,' তাকে থামিয়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেন ভূতেশ স্যার, 'গল্প মানেই তো ঝুড়ি-মুড়ি মিথ্যে কথা। আর সে গল্প যদি ভূতের গল্প হয় তাহলে তো কথাই নেই। পড়লে মনে হয় যেন গুলগাপ্পির বান ডেকেছে।'

'কিন্তু স্যার রাম শব্দটা তো সত্যিই উচ্চারণ করতে পারি আমরা—'

'তবু করব না।'

'ক্যানো?'

নিয়ম। ঐতিহ্য। রীতি। তাছাড়া ওই বিটকেল শব্দটুকু বাদ দিলে কী মিষ্টি নাম হয়ে গেল তোমার। আত্মা। আহা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে কী মানানসই নাম-কাজেই আত্মারাম নয়, আজ থেকে তুমি শুধুই আত্মা।

আত্মা, আত্মা, আত্মা—সারা ক্লাস হই হই করে ডেকে উঠল তার নাম ধরে।

আত্মারাম চুপ করে বসে পড়ল। প্রতিবাদ করার সাহস হল না তার। এমনিতেই সে ভীতু প্রকৃতির। কেউ জোরে হাঁক মারলেই হাড়ে হাড়ে খটখটি লেগে যায় তার। আর ভূতেশ স্যার তো অত্যন্ত রাগী ভূত। পান থেকে চুন খসলেই এমন শাস্তি দেন যে তার চেয়ে আর একবার মরে যাওয়া সহজ। গাছের ডালে বসে পা-টাকে লম্বা করে মাটিতে ঠেকানোর পরীক্ষায় একটা বাচ্ছা-ভূত ফেল করেছিল বলে ভূতেশ স্যার তার একটা পা খুলে রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। তিনদিন এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার পরে নিজের পা ফেরত পেয়েছিল সে। তাছাড়া মাঝে মাঝেই ভূতুড়ে কলা-কৌশল শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদের এমন সব গা ছমছমে মানুষের গল্প শোনান তিনি যে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে ভয়ে। একলা পথে বেরোনোই দায় হয় তখন। রাতের আঁধার ফিকে হলেই একটু দূরের ঝাঁ-চকচকে ঘরবাড়িগুলো যেন গিলতে আসে। ভয়ের চোটে ঝুপসি গাছের ডালে, পাতার আড়ালে

কিংবা পোড়োবাড়ির আনাচে-কানাচে জমা অন্ধকারের আবডাল ছেড়ে বাইরে বেরোনোর আর সাহস থাকে না। সব সময় ভয়, এই বুঝি মানুষে ধরল।

মানুষে ধরার কথাটা মাথায় এলেই ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। তেমন তেমন মানুষে যদি ধরে তাহলে সত্যি সত্যিই বিপদের একশেষ। মানুষের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া সোজা কথা নয়। একবার তাদেরই পাড়ার সিধেসাদা গোছের একজন ভূত বেখেয়ালে এক বেয়াড়া মানুষের পাল্লায় পড়েছিল কয়েকমাস আগে। লোকটা ভয়ানক। মন্ত্র তন্ত্র জানত বিস্তর। বাগে পেয়ে ভূতটাকে কাচের বোতলে পুরে রেল লাইনের পাশে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে। ওইটুকু বোতলের মধ্যে কী কষ্টেই যে ছিল সে, শুনতে শুনতে দুঃখে আত্মার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ট্রেন যাবার সময় পাথর ঠিকরে এসে বোতলটা ভেঙে গিয়েছিল বলে সে যাত্রা রক্ষে পেয়েছিল ভূতটা।

তার পাড়ার বেচারা ভূতটার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আত্মারাম। ভূতেশ স্যারের পড়া আর কানে ঢুকছিল না তার। ভুতেশ স্যার কড়া প্রকৃতির। আত্মার অন্যমনস্কতা তাঁর নজর এড়াল না। রাগে গরগর করতে করতে আত্মরামের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। বজ্রকণ্ঠে ডাক ছাড়লেন, 'আত্মা—'

চিন্তা ছুটে গিয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল আত্মারাম।

কোটরে ঢোকা গোল গোল চোখ লাল করে ভূতেশ স্যার জিগ্যেস করলেন, 'কী পড়াচ্ছিলাম বল —'

আত্মারাম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কথার উত্তর দিচ্ছিস না যে বড়? ক্রমশ গলা চড়তে শুরু করল ভূতেশ স্যারের, 'পড়াশুনোর সময় মনটা কোথায় পড়ে থাকে?'

আত্মারামের হাত পা কাঁপতে লাগল। কী শাস্তি যে কপালে আছে এখন তার কে জানে। সারা ক্লাস চুপ। এমন সময় ছুটির ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে। আত্মারাম চুপি চুপি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। আজ তাহলে বোধহয় বেঁচেই গেল সে।

অন্য ভূতেরা সারি দিয়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হই হই করে। আত্মা তাদের পিছু নিতে যেতেই খপাৎ করে তার বাঁ-হাতটা ধরে ফেললেন ভূতেশ স্যার। কড়া গলায় বললেন, 'চললি কোথায়?'

'আমাদের আর ক্লাস নেই।' আমতা আমতা করে বলে আত্মারাম।

'তোর এখন ছুটি হবে না। দু-ঘণ্টা বসে থাকতে হবে স্কুলে। এই তোর অন্যমনস্কতার শাস্তি।'

মানুষের চেয়ে আত্মারামদের গা-হাত-পা এমনিতেই বেশি ঠান্ডা। এ কথা শুনে তা আরও ঠান্ডা হয়ে গেল। এখন গ্রীষ্মকাল। রাত ছোট। দু-ঘণ্টা স্কুলে আটকে থাকলে রাত প্রায় শেষই হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সূর্যের আলো নেমে আসবে চারধারে। স্কুল থেকে তার বাড়ির পথটাও কম নয়। একা একা ফটফটে আলোয় অতটা পথ যাবে কী করে সে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। কান্না পেয়ে

গেল। ভূতেশ স্যার এসব দেখেও দেখলেন না। দয়ামায়া বরাবরই তাঁর অন্যদের চেয়ে কম। উপায়ন্তর না দেখে ধপাস করে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল আত্মারাম।

আত্মারাম যখন ছুটি পেল শেষমেশ, রাত শেষ হতে খুব বেশি বাকি নেই। আত্মারাম হিসেব কষে দেখল স্কুল থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে আজ সূর্যের আলো ফুটে যাবে। বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। আজ সঙ্গী-সাথী পাওয়া যাবে না একজনকেও। এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গাছে-গাছে, হাটে-মাঠে, ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে খেলাধুলো সেরে তার বন্ধুরা আস্তানায় ঢুকে পড়েছে। এবার একটু পড়াশুনো। তারপর দিন একটু গভীর হলেই খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম। আবার ভর-সন্ধেয় ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসা। তারপর স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি। আত্মারামের দু'একজন বন্ধু অবশ্য দিন-জেগে পড়াশুনা করে। ভরদুপুর পর্যন্ত একলা একলা জেগে বসে থাকতেও একটুও ভয় পায় না তারা। আত্মারাম অত সাহসী নয়। দিনের আলোয় গা ছমছম করে তার। আর চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষ দেখলে হয়ত ভিরমিই খাবে সে ভয়ে।

আত্মারাম স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সোজা পথটা ছেড়ে আজ ঘুরপথ ধরল। যে পথে রোজ বাড়ি ফেরে সে, সে পথটা আগে জঙ্গলে মোড়া ছিল। মানুষজনের যাতায়াত এদিকে ছিল না। ইদানীং জঙ্গল কেটে এখানে একটা চওড়া রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল শুরু হয়নি ঠিকই, কিন্তু অনেক মানুষ আজকাল ভোরবেলা এদিকে হাঁটতে আসে। তাদের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে হল না আত্মারামের। যে পথটা সে ধরল আজ, সে পথটা বাস্তবিকই নির্জন। মানুষজনের বসবাস তো নেই-ই, এদিকে লোকজনের আসা যাওয়া নেই, বললেই চলে। তাছাড়া পথের দুপাশটা ভারি মনোরাম। এ পথের দু'ধারে যে মস্ত মস্ত গাছগুলো তার ডালে ডালেই এ অঞ্চলে ভূতেদের সবচেয়ে বড় ও পুরোনো কলোনী। সেই কলোনী পার হলেই পুরোনো পরিত্যক্ত একটা শ্মশান। শ্মশান পেরিয়ে আর একটু এগোলেই রাস্তার দু'পাশে গোরস্থান। তারপরেও অবশ্য বাড়ি পৌঁছনোর আগে অনেকটা পথ তাকে হাঁটতে হবে। তবু আগের পথের চেয়ে এ পথটা তার বেশি নিরাপদ মনে হল। সরু সরু পা চালিয়ে আত্মারাম দ্রুত পথ চলতে শুরু করল।

শ্মশান গোরস্থান পেরিয়ে হরজাই গাছের ঝোপজঙ্গলের পাশ দিয়ে নিরাপদে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছিল আত্মারাম। মন থেকে মানুষের ভয়টাও ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছিল তার। কিন্তু হঠাৎই ঝুপসি অশ্বত্থ গাছটার পাশ দিয়ে ডানদিকে বাঁক নিতেই বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আত্মারামের। ভয়ে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল তার। উল্টোদিক থেকে লাঠি হাতে ধুতি পাঞ্জাবি পরা যে অবয়বটা ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে সেটা তো কোনো ভূত-প্রেতের শরীর নয়। চোখের সামনে এ যে জলজ্যান্ত মানুষ একটা। খুব বিপদের সময় নিজের শরীরটাকে ভেঙেচুরে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে আত্মারামেরা। পরে সময় মতন শরীরটাকে আবার গড়ে পিটে তৈরি করে নিতে হয় আগের মতন। এর জন্যে প্রত্যেক ভূতেরই একটা নিজস্ব পাসওয়ার্ড থাকে। চোখের সামনে জলজ্যান্ত মানুষটাকে দেখে আত্মারাম কিছুতেই তার পাসওয়ার্ডটা মনে করতে পারল

না। অথচ মানুষটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে তার দিকে। উপায়ন্তর না দেখে মানুষের মুখোমুখি হওয়ার বিপদ এড়াতে অশ্বত্থ গাছটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল আত্মারাম।

২

ভুবনপুর হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই প্রবাল স্যারকে ছাত্ররা চিরকাল আড়ালে আবডালে পাগলস্যার বলে ডাকত। স্কুলের ক্লাসটুকুর বাইরে কিছুতেই তারা প্রবাল স্যারের মুখোমুখি হতে চাইত না। অথচ প্রবাল স্যার মানুষটা খারাপ নন। ছাত্রদের কটুকথা বলা বা মারধর করার পথেও কোনোদিন হাঁটেননি তিনি। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই। সব ছেলেকে অঙ্কে চৌখস করে তুলবেন তিনি। লক্ষ্যটা মহৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সারাজীবন মাস্টারি করেও একটা ছেলেরও সহযোগিতা পাননি তিনি এ বিষয়ে। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে নিজের উদ্যোগে কিছু ছেলেকে বাড়িতে ডেকে নিয়েছেন তিনি মাঝে মাঝে। তাদের যত্ন-আত্তি, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন, তাঁর কাছে এসে ভালোভাবে অঙ্ক কষার জন্য চকোলেট -চিপস এর টোপ দিয়েছেন তিনি বহুবার, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। দু'দিনের বেশি কোনো ছেলেকেই তাঁর বাড়িমুখো করা যায়নি। যতদিন স্কুলে ছিলেন, প্রবাল স্যারের ছিল অঙ্কের পাগলামি। স্কুল থেকে রিটায়ার করার পর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পরিবেশ সুরক্ষার পাগলামি। পথেঘাটে ছেলে বুড়ো যাদের সঙ্গেই দেখা হোক প্রবাল স্যার পাকড়াও করেন তাদের, চলো গ্রামের পথের দু'পাশে গাছ লাগাই, এসো পচা ড্রেনগুলোকে সাফ সুতরো করি, কিংবা পুকুরগুলোকে সংস্কার করি সবাই মিলে। এসব কাজে খুব বেশি লোক কখনই পাওয়া যায় না। প্রবাল স্যার একজনকেও পেলেন না। শেষমেশ তো প্রবাল স্যারের মুখোমুখি পড়লে নানান ব্যস্ততার অজুহাতে সরে পড়ত সবাই। কেউ বলত, হাঁড়িতে জল চেপে গেছে, এক্ষুনি চাল না আনলেই নয়, কারো মনে পড়ে যেত কোন দোকানে ছাতা ফেলে এসেছে, কেউ জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলত, 'স্যার, আপনার সাথে কথা বলতে যে কী ভালো লাগে অথচ উপায় নেই, আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি ভরে আছে, এক্ষুনি না গেলেই নয়—' প্রবাল স্যার আজকাল আর কারো ওপরেই ভরসা করতে পারেন না। গ্রামের মানুষগুলোর দিকে তাকাল মনখারাপ লাগে। এত কর্মব্যস্ত সবাই, অথচ সে কাজের সিকিভাগও সামনের দিনগুলোকে সুন্দর করার তাগিদ থেকে নয়। চোখের সামনে মানুষগুলো যেন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

মনের দুঃখে লোক লস্কর এড়িয়েই থাকেন এখন প্রবালবাবু। গ্রামের একপ্রান্তে একটেরে হয়ে দিন কাটান একলা একলা। দোকান-বাজার যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া মানুষজনের ডাকে আর বেরোন না। ভোরবেলা হাঁটতে বেরোনোর অভ্যাসটা বহুদিনের। সেটা আর ছাড়তে পারেননি। ভালো করে আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। একলা একলাই হাঁটেন শ্মশানঘাট, কবরস্থানের পাশের নির্জন রাস্তা ধরে। গাছপালা দেখেন। আকাশ দেখেন। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে কলরব করতে

করতে পাখির ঝাঁক উড়ে যায়। প্রবালবাবু তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে। মনে হয় এরাই যেন প্রকৃত বন্ধু তাঁর। একেকদিন একলা হাঁটতে হাঁটতে ভারি অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হয়। মনে হয় গাছপালার আড়ালে আড়ালে কারা যেন ফিস ফিস করে কথা কইছে। আগে সেই ফিসফাস শুনে তিনি চমকে উঠতেন। ভয় পেতেন। আজকাল আর গা ছমছম করে না। কাঁটা দেয় না গায়ে। ব্যাপারটা বেশ গা সওয়া হয়ে গেছে।

আজ ঘুমটা একটু তাড়াতাড়িই ভেঙে গিয়েছিল। কাজেই তাড়াতাড়িই হাঁটতে বেরিয়েছিলেন আজ প্রবাল স্যার। বেশ কিছুটা হাঁটার পর অশ্বত্থতলার কাছাকাছি আসতেই সামনে তাকিয়ে ভারী অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা রোগা পটকা ছেলে একা একা হেঁটে আসছে হনহন করে। এদিকে মানুষজন বড় আসেনা। এসব জায়গার বেশ বদনামই আছে গ্রামেগঞ্জে। ভূতপ্রেতের নাকি আখড়া এই অঞ্চলে। ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতনতা আছে। আলস্য নেই। ভোররাতে উঠে হাঁটতে বেরিয়েছে একা একা। প্রবালবাবু মনে মনে বেশ খুশি হলেন। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করা দরকার। এমন ছেলেই তো চাই তাঁর, দু-চার কদম এগোতেই ছেলেটা মুখ তুলে একবার চাইল তাঁর দিকে। তারপরেই সাঁৎ করে অশ্বত্থ গাছটার পিছন দিকে লুকিয়ে পড়ল তাঁর নজর এড়াতে।

ছেলেপুলেরা তাঁকে দেখে লুকিয়ে পড়ছে এমন ঘটনা প্রবালবাবুর কাছে নতুন নয়। বরং এমন ঘটনা দেখতে দেখতেই বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু আজ, ছেলেটার লুকিয়ে পড়ার ধরনটা ক্যামন যেন অন্যরকম লাগল তাঁর। অন্যেরা তাঁকে এড়িয়ে যাবার জন্যে লুকোয়, কিন্তু এ ছেলেটার চোখেমুখে যেন অন্য একধরনের আতঙ্ক দেখলেন আজ। ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন প্রবাল স্যার। তাঁর সান্নিধ্য কি সত্যিই এমনই ভয়ঙ্কর, নাকি তাঁর চেহারাটার মধ্যেই—

কী হল কে জানে, আজ প্রবালবাবুর মনে জেদ চেপে গেল। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার। ধুতির কোঁচাটা হাতে ধরে দৃপ্ত পায়ে অশ্বত্থ গাছটার দিকে এগোতে লাগলেন তিনি।

৩

আত্মারাম অশ্বত্থ গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছিল। মানুষেরা ভূতের ভয়ে অনেকসময় ভগবানকে ডাকে। কিন্তু ভূতেরা মানুষের ভয়ে কাকে ডাকবে? আত্মারাম এই ঘোর বিপদে কোনো উদ্ধারকারীর নাম মনে করতে পারল না। তার ঘাম হতে লাগল। কান্না ঠেলে উঠতে লাগল বুকের মধ্যে। সাধারণত ভূতেদের ঘাম হয় না, কাঁদেও না তারা চট করে। ছোটবেলায় আত্মারামের একবার এমনটা হয়েছিল। পাড়ার মাতব্বর ভূতেরা বলেছিল, ছেলেটার বাতাস লেগেছে। মানুষের বাতাস। ভালো করে ঝাড়াতে হবে ওকে। তারপর একটা চিমড়ে মতন ভূত এসে খুব মারধর করেছিল তাকে শেওড়াগাছের ডাল দিয়ে। ভয়ে আত্মারামের বুক শুকিয়ে গেল। এবারে কী

হবে কে জানে। ধরতে পারলে তাকেও নিশ্চয়ই বোতলে পুরে ফেলবে লোকটা। অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ঝুপসিমতন যে আসশ্যাওড়ার ঝোপটা, তার মধ্যে ঢুকে বসে পড়ল আত্মারাম।

অশ্বত্থগাছের কাছে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন প্রবালবাবু। ছেলেটা গেল কোথায়? তাঁকে দেখে হাওয়া হয়ে গেল নাকি? হঠাৎ সামনের আসশ্যাওড়ার ঝোপটা সামান্য নড়ে উঠতেই সেদিকে চোখ গেল প্রবালবাবুর। আর তখুনি ছেলেটাকে দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর নজর এড়াতে ছোঁড়াটা ঝোপের মধ্যে ঘাড় গুঁজে বসে আছে চুপটি করে। এতক্ষণে আর একটা সম্ভাবনার কথাও উঁকি মারল তাঁর মনে। ছেলেটা ছিঁচকে চোর-টোর নয়তো? তা নাহলে তাঁকে দেখে এমন মরিয়া চেষ্টা কেন লুকোনোর! তাছাড়া এই নির্জন পথে তো সাধারণ মানুষজন বড় একটা আসে না!

প্রবালবাবু ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লেন, 'এই ছেলে বেরিয়ে আয় ঝোপ থেকে।'

আত্মারাম ইতস্তত করতে লাগল।

প্রবালবাবু আবার বললেন, 'বেরিয়ে আয় বলছি—'

আত্মারাম ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবালবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

প্রবালবাবু ছেলেটাকে আপাদমস্তক দেখলেন। কালচে রঙ। রোগা হাড়গিলে চেহারা। দেখলেই মনে হয় ভালো করে খাওয়া জোটেনি অনেকদিন। মনটা নরম হয়ে গেল তাঁর। একটু নীচু গলায় খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'চুরি-চামারি করিস বুঝি?'

হঠাৎ অ্যামন প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল আত্মারাম। তবে মুখে কথা না বললেও প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘন ঘন দু'দিকে মাথা নাড়াতে লাগল সে।

প্রবাল স্যার খুশি হলেন। ছেলেটার সঙ্গে যেহেতু ব্যাগ বা পুঁটলি টুটলি নেই, সে সত্যি কথা বলছে বলেই মনে হয় তাঁর। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন তিনি, 'হাঁটতে বেরিয়েছিলি বুঝি?'

ছেলেটা আবার দুদিকে মাথা নাড়াল।

'তবে?' প্রবালবাবু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

'আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম—' কাঁপা কাঁপা রিনরিনে গলায় উত্তর দিল আত্মারাম।

'এত সকালে গিয়েছিলি কোথায়?'

'স্কুলে—'

'অ্যাঁ—বলিস কী—রাত-বিরেতে স্কুল? তুই কি ইয়ার্কি মারছিস নাকি আমার সঙ্গে?

'উঁহ—' আবার দু'দিকে মাথা নাড়ায় আত্মারাম।

প্রবালবাবু অবাক চোখে ছেলেটাকে জরিপ করেন খানিক। রোগা, গোবেচারা চেহারা। মিথ্যে বলছে বলে মনে হয় না। অথচ—ছেলেটাকে ঘিরে ক্যামন যেন একটু রহস্যের গন্ধ পান প্রবালবাবু। ওর আর একটু কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করেন, 'তোর বাড়ি কোথায়?'

'ওই দিকে' হাত উঁচু করে একদিকে দেখায় আত্মারাম। প্রবালবাবু ধন্দে পড়লেন। 'ওদিকটা তো বাড়িঘর আছে বলে জানা নেই রে—' চুপ করে থাকে আত্মারাম।

প্রবালবাবু আবার বলেন, 'বাড়িতে আর কে আছে তোর, মা, বাবা ভাই বোন—'

'কেউ নেই।'

'কেউ নেই?'

'আমাদের কেউ থাকে না। আমরা সকলেই একা একা—'

ছেলেটার কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না প্রবাল স্যার। তবে এটুকু বুঝতে পারেন যে তাঁরই মতন এ ছেলেটারও তিনকূলে কেউ নেই। ছেলেটার জন্যে ভারি মায়া হয় তাঁর। স্নেহমাখা গলায় তিনি বলেন, 'কিছু খেয়েছিস সকাল থেকে?'

'উঁহু—'

তবে চল আমার সঙ্গে—' বলে খপ করে ছেলেটার ডানহাতের কব্জিটা চেপে ধরেন প্রবাল স্যার। ছেলেটার হাত ঠান্ডা। কব্জিটাও বেশ সরু।

আত্মারাম ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তার কপালে যে কী আছে কে জানে। শরীর আনচান করতে লাগল তার। নেহাত ভূতেরা অজ্ঞান হতে জানে না। নাহলে কবেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত আত্মারাম। মানুষটার হাত থেকে আর নিস্তার নেই বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল সে, 'কোথায় যাব আমি?'

'আমার বাড়ি।'

'ক্যানো?'

'আমার সাথে থাকবি খাবি—'

'ক্যানো?'

'আমি তোকে অঙ্ক শেখাবো—'

'অ্যাঁ—'

'হ্যাঁ। অঙ্ক শিখবি, মানুষ হবি।'

'মানুষ হতে হবে আমায়?' আঁৎকে উঠে বলে আত্মারাম।

'আলবাৎ। তারপর দু'জনে মিলে দেখিয়ে দেব যে সদিচ্ছে থাকলে দু'জনে মিলেই কাজ করে দেখিয়ে দেওয়া যায়—'

'কী কাজ?'

'ভালো কাজ—আমরা রাস্তার আবর্জনা সাফ করবো, পুকুরগুলো পরিস্কার করব, গাছ লাগাব, মাটি কেটে নদীতে বাঁধ দেব—' বলতে বলতে চোখ চকচক করে ওঠে প্রবাল স্যারের। আত্মারাম এসব কথায় একটুও খুশি হয়না। তবে প্রতিরোধও তৈরি করতে পারে না নিজেকে বাঁচানোর জন্যে। প্রায় সম্মোহিতের মতন এক বুক ধুকপুকুনি নিয়ে বাধ্য ছেলের মতন সে হাঁটতে থাকে প্রবাল স্যারের পিছু পিছু।

ভূতেদের সত্যিকারের মা-বাবা দাদা-দিদি কাকা-পিসি মামা-মাসি কিছুই হয়না। আসলে হঠাৎ করেই তো একদিন মানুষ থেকে ভূত হয়ে যায় তারা। সত্যিকারের আত্মীয়স্বজন তখন অনেক দূরে সরে যায়। মরার আগে যে ছিল হয়ত হরিহর আত্মা, জীবনের সুতোটা ছিঁড়ে গেলেই তাকে আর আপনজন বলে ভাবা যায় না। বরং তাকে দেখে গা ছমছম করে তখন। হঠাৎ চোখের সামনে পড়ে গেলে আঁৎকে উঠতে হয় ভয়ে। আর বেঁচে থাকতে যাদের কথা ভাবলে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেত, মরার পরে তারাই সব নিকটজন, আত্মীয়-বন্ধু। এমনই সব হঠাৎ পাওয়া নিকটজনের সঙ্গে বাস করত আত্মারাম। তাদের অনেকেই বেশ বয়োজ্যোষ্ঠ, আবার কেউ কেউ তার সমবয়েসি, সহপাঠী। সাধারণত রাত গড়িয়ে ভোর নামার অনেক আগেই ফিরে আসে আত্মারাম। আজ সে ফিরল না। অন্য ছেলে ছোকরারা ফিরে এসে বলেছিল বটে যে ভূতেশ স্যার শাস্তি দিয়ে স্কুলের শেষে আটকে রেখেছেন তাকে, তবুও এতটা দেরি হবার তো কথা নয়। রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে গেল। ভোর গড়িয়ে সকাল। এলাকার অন্য ভূতেরা চিন্তায় পড়ে গেল খুব। আত্মারাম এমনিতেই ভীতু। মানুষের ভয়ে অস্থির। তার ওপর চারদিকে এমন বিচ্ছিরি ফটফটে আলো বেরিয়ে গেল। সত্যি সত্যিই কেনো বদ মানুষের পাল্লায় পড়ে গেল না তো ছেলেটা? বেশ সাহসি ভূতেদের একটা দল এই দিনেদুপুরেই আত্মারামকে খুঁজতে বেরোবে বলে ঠিক করল। তবে বয়স্করা বললেন, বেলা একটু পড়লেই বরং মানুষের সমাজে ঢোকা উচিত। আলো মরে গেলে মানুষেরা মনের দিক দিয়ে দুর্বল থাকে। আমাদের তখন কাজে কর্মে সুবিধা হয় একটু।'

অতএব দিন ফুরিয়ে সন্ধে নামতে না নামতেই আত্মারামের খোঁজ তল্লাশ শুরু হল। মন্দির-মসজিদ, রেললাইন, পাকারাস্তা সর্বত্র তার খোঁজ করে বেড়াতে লাগল প্রতিবেশী ভূতেরা।

ভূতনাথ মাত্র ক'দিন হল ভূত হয়ে এসেছে এ তল্লাটে। তবে অল্প কদিনেই বেশ নাম করে ফেলেছে এলাকায়। এমনিতেই ডাকাবুকো চেহারা তার। মানুষ-টানুষে ভয়-ভীতি নেই একটুও। তাছাড়া কিছুদিন আগে পাশের পাড়ার এক উঠতি তান্ত্রিককে এমন ভয় দেখিয়েছিল সে যে তান্ত্রিক বাবাজি একেবারে গ্রাম ছাড়া। সেই থেকে এলাকায় ছেলে-ছোকরা ভূতেরা তাকে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখে। আত্মারামও খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিল তার অল্পদিনের মধ্যেই। প্রায়ই তাকে দুঃখ করে বলত ছেলেটা, 'ভুতনাথদা, আমিও যদি তোমার মতন সাহসি হতাম, বড় ভালো হত তাহলে।'

'কী করতিস?' হেসে বলে ভূতনাথ।

'দিনের পৃ,থিবীটাকেও ভালো করে দেখতে পারতাম—'

'দেখে কী হত—'

'জানি না। তবে আমার খুব কৌতূহল।'

'ক্যানো?'

'আমার না খুব শখ একবার মানুষের মুখোমুখি হতে—'

'হ না। আটকাচ্ছে কে?'

'কিন্তু আমি যে বড় ভীতু ভূতনাথ দা—'

'তা বললে তো চলবে না—ভালো ভূত হতে গেলে অত মানুষের ভয় করলে কি চলে? বলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল ভূতনাথ।

অন্ধকারের সাথে মিশে হাওয়ার মতন মিহি শরীর নিয়ে পথ চলছিল ভূতনাথ। আত্মারামের জন্যে মনটা বড় খারাপ লাগছিল তার। ছেলেটা বড় ভালো। বড় সরল। মনটাও খুব নরম। সত্যি সত্যি কোনো বদ মানুষের পাল্লায় পড়লে বিপদে পড়ে যাবে ছেলেটা। আত্মারামের কথা ভাবতে ভাবতেই ঝুপসি অশ্বত্থ গাছটা পেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে ভূতনাথ। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ এসে পড়ে গ্রামের প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে। কী ভেবে পায়ে পায়ে বাড়িটার একটু কাছে এগিয়ে যেতেই চেনা-চেনা ভূত-ভূত গন্ধটা নাকে এসে লাগে ভূতনাথের। হাওয়ায় শরীরটাকে ভাসিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে বাড়িটার একটা খোলা জানলার পাশে চলে আসে সে। তারপর চোখ রাখে বাড়ির ভেতরে। আর তখনই আত্মারামকে দেখতে পেয়ে যায় ভূতনাথ। ঘরের মেঝের ওপর মাদুর পেতে বসে মাথা নীচু করে কাগজ কলম নিয়ে একমনে কী সব লিখছে সে। বিস্মিত ভূতনাথ জানলা গলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর ঢুকে পড়তেই প্রবাল স্যারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার।

৫

প্রবাল স্যারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছনোর পর প্রথমটা বেশ ভয়ে ভয়েই ছিল আত্মারাম। মানুষটার কী মতলব কে জানে। সত্যি সত্যিই এ মানুষটা তাকে বোতলের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করবে নাকি? আত্মারাম ঘরের চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বোলাতে লাগল। তেমন কোনো খালি বোতল টোতল অবশ্য নজরে পড়ল না তার। প্রবাল স্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মানুষ সম্পর্কে ভয়টাও যেন ক্রমশ ফিকে হয়ে এল। আত্মারাম মনে মনে বেশ ভালোই বেসে ফেলল মানুষটাকে। আর ভালোবাসতে পেরে মনটা এমনই খুশি খুশি হয়ে উঠল যে তার আবার আফশোসও হল। ভূতসমাজের আদব-কায়দা মানতে মানতে ভালোবাসায় যে এমন সুখ তা তারা ভুলেই গেছে। বেলা একটু ঘন হতে চোখের পাতা বুজে আসছিল তার। আসলে দিন জাগার অভ্যাস তো বড় একটা নেই তার। শেষমেশ মাদুরের ওপর শুয়ে বেশ খানিকক্ষণ ঘুমিয়েই নিল আত্মারাম। প্রবাল স্যারই বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে বলে ডেকে তুললেন তাকে। ধড়মড় করে মাদুরের ওপর উঠে বসে দু-হাতে চোখ রগড়াতে লাগল আত্মারাম।

প্রবাল স্যার ভারি স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোলে হবে, বেলা পড়ে আসছে, খাবি কখন, ওঠ দুটো মুখে দে। এরপরে খেলে যে শরীর খারাপ করবে—'

আত্মারাম হাসে। বলে, 'এসময় তো খাই না আমরা—'

'জানি বাপু জানি,' প্রবাল স্যার বলেন, 'এত বেলায় কি কেউ খায়, কিন্তু এমন ঘুম ঘুমোচ্ছিলি তুই যে আমার মায়া হল—'

আত্মারাম খাবার-দাবারগুলো দেখছিল। এসব খাবার তাদের সমাজে অচল। কেমন খেতে হবে কে জানে। দোনামনা করে খাবারের থেকে একটু তুলে নিয়ে মুখে দিল সে। স্বাদটা মন্দ লাগল না। বরং তাদের খাবার-দাবারের থেকে এগুলো যেন আরো বেশি সুস্বাদু ঠেকল তার মুখে। মনের আনন্দে পেট ভরে খেয়ে নিল আত্মারাম।

দিনের আলো নিভতেই প্রবাল স্যার বললেন, 'এবার পড়তে বোস। কাকভোরে আর ভরসন্ধেয় পড়াশোনায় মন বসে ভালো। এজন্যে এই সময়টা নষ্ট করতে নেই—'

আত্মারাম বাধ্য ছাত্রের মতন পড়তে বসে গেল তাঁর কাছে।

প্রবাল স্যার বললেন, 'এতক্ষণে নামটাই তো জানা হয়নি তোর—'

'আমার নাম আত্মারাম—'

'বেশ নাম।'

আত্মারাম খুশি হয়। ভূতেশ স্যারের মতন এই মানুষটার নাম নিয়ে তেমন ওজর আপত্তি নেই। তাছাড়া আত্মার চেয়ে আত্মারাম নামটাই বেশি পছন্দ তার।

'সরল করতে পারিস? প্রবাল স্যার জিগ্যেস করলেন।

'আজ্ঞে না—' লাজুক, মুখে জবাব দেয় আত্মারাম।

'ল.সা.গু—গ.সা.গু?'

'উঁহু—'

'সমীকরণ, ফ্যাক্টর?'

'নাঃ—'

' সে কি কথা রে—' হতাশ গলায় বলেন প্রবালস্যার, ' তোদের স্কুলে অঙ্ক শেখায় না?'

'না।'

'শেখায়টা কি তাহলে সেখানে?'

'গাছে ঝুলে থাকা, হাত পা লম্বা করা, বিপদে আপদে শরীর হালকা করে বাতাসে মিশে যাওয়া, তাছাড়া মানুষকে ভয় দেখানোর নানারকম কলা-কৌশল—'

'তুই কি ইয়ার্কি করছিস আমার সঙ্গে?'

'আজ্ঞে না—'

'তবে—'

'সত্যিই এসব শেখানো হয় আমাদের স্কুলে। ভূতেশ স্যার খুব কড়া। একটু ফাঁকিবাজি করলেই কড়া শাস্তি—'

'ছি ছি ছি—' হতাশ গলায় বলেন প্রবালস্যার।

'কী হল?' অবাক হয়ে বলে আত্মারাম।

'আমার লজ্জা করছে—'

'ক্যানো?'

'আমিও যে শিক্ষক—ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে আমার যে এ কালেও কোনো কোনো স্কুলে এইসব ফালতু কাজে সময় নষ্ট হচ্ছে আসল পড়াশুনা শিকেয় তুলে—এসব চললে তোরা সব মানুষ হবি কী করে?'

'মানুষ হব?' ভয় পাওয়া গলায় ঢোক গিলে বলে আত্মারাম।

'আলবাৎ—'

'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কী—ওসব কিন্তু —টিন্তুতে কনফিডেন্স কমে যায়—'

'আমাদের মানুষ হওয়া পাপ, ওসব ভাবতে নেই আমাদের।'

'মানে?'

'আমরা একসময় মানুষ ছিলাম, এখন আর নেই। আমরা এখন আত্মা, মানে ভূত—'

'যাঃ—'

'সত্যি।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আচ্ছা দেখুন' বলে, হাতটাকে লম্বা করে দেয় আত্মারাম, মাথাটাকে বনবন করে দুপাক ঘুরিয়ে নেয় ঘাড়ের ওপর, অদৃশ্য হবার পাসওয়ার্ডটা মনে পড়তে একটুক্ষণ অদৃশ্য হয়েও দেখিয়ে দেয় প্রবাল স্যারকে।

প্রবাল স্যারের হাঁ মুখটা বুজতে একটু সময় লাগে। গা-টা একটু শিরশিরও করে ওঠে প্রথম চোটে। তবে একটুক্ষণের মধ্যেই ধাতস্থ হন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলেন, তিনি, 'এই বরং ভালো হল—'

'কী', ভয়ে ভয়ে বলে আত্মারাম, 'আমাকে বোতলে পুরে বন্দী করে রাখবেন নাকি?'

'দুর বোকা। ভূত মানে তো অতীত। অতীতকে বন্দী করতে আছে কখনও—বরং অতীতকে মর্যাদা দিয়েই তো বর্তমানের ভিত গড়তে হয়,' একগাল হেসে বলেন প্রবাল স্যার। ছেলেগুলোকে তো মানুষের মত মানুষ বানাতে পারলাম না, আমার কাছেই তো ঘেঁষতে চায় না ওরা। না শিখল অঙ্ক, না করল সমাজের কাজ। দরকার নেই। তোকেই বরং সব দিই। খেটেখুটে সত্যি সত্যি একটা ভূতের মতন ভূত হ দিকিনি দেখি বাবা—' খাতা কলম নিয়ে মাদুরে বসে অঙ্ক শিখতে শুরু করল আত্মারাম। প্রবাল স্যার বললেন, 'শোন একেবারে শুরু থেকে শেখানো শুরু করি তোকে। সবসময় মনে রাখবি জগতে যা কিছু ঘটে, সবকিছুর পিছনেই কিছু নির্দিষ্ট অঙ্ক থাকে, ক্যালকুলেশন বুঝলি—এই ধর তোর গাছে ঝুলে থাকা, তার জন্যেও ক্যালকুলেশন—কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঝুলবে শরীর, কত মিনিট পর পর টনটন করতে পারে হাত—'

আত্মারামের মন্দ লাগাছিল না। অন্তত ভূতেশ স্যারের ক্লাশের থেকে এই পড়াশুনাটা অনেক সহজ ও মনোগ্রাহী। প্রাথমিক অমনোযোগিতাটুকু কেটে যেতেই অঙ্কের মধ্যে একেবারে ডুবে গেল আত্মারাম।

কতক্ষণ এভাবে কাটল কে জানে। হঠাৎই একটা খুব পরিচিত ভূত ভূত গন্ধ নাকে এল তার। গন্ধটা বেশ চেনা। অঙ্ক থেকে মনটা বাইরে বেরিয়ে এল আত্মারামের। খাতা থেকে মাথা তুলল সে। আর তখনি দেখতে পেল ভূতনাথদাকে। শরীরটাকে সরু করে জানলা গলে ঘরের মধ্যে এসে নামল ভূতনাথদা।

ভূতনাথকে দেখে প্রথমটা আনন্দই হয়েছিল আত্মারামের। বিপদের মধ্যে হঠাৎ প্রিয়জনকে দেখলে যা হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আনন্দটা ফিকে হয়ে এল আত্মারামের। ভূতনাথদা বড় ভয়ঙ্কর ভূত। মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার দেদার কলা-কৌশল আয়ত্তে আছে তার। এমনকি মানুষের ঘাড়ে-টাড়েও চেপে পড়তে পারে সে। প্রবালস্যারের জন্যে ভারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। মানুষটাকে মনে মনে বেশ ভালোবেসে ফেলেছে আত্মারাম। আত্মভোলা অঙ্ক-পাগল মানুষটার যদি ভূতনাথদার সামনে পড়ে কোনো বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল তার।

তার থেকে একটু তফাতে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন প্রবালস্যার। আত্মারাম আড়চোখে দেখল চেয়ারে বসা প্রবাল স্যার মাথা তুলে সোজা চোখে তাকালেন ভূতনাথদার দিকে।

৬

জানলা গলে ঘরে ঢোকার সময় মনটাকে বেশ শক্ত করে নিয়েছিল ভূতনাথ। ঠিক করেই ফেলেছিল, আত্মারামের মতন এমন নিষ্পাপ গোবেচারা গোছের একটা পুচকে ভূতকে যে মানুষ অপহরণ করে এনে আটকে রাখে নিজের বাড়িতে তার উচিত শিক্ষা পাওয়া উচিত। কিন্তু ঘরে ঢোকার পরেই ক্যামন যেন হতোদ্দম হয়ে গেল সে। আত্মারামকে দেখে একটুও মনে হল না যে সে কষ্টে আছে। বরং তাকে দেখে বেশ খুশি খুশিই মনে হল তার। ঘরের চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি বোলাতে-বোলাতে হঠাৎই ভূতনাথের চোখ পড়ল চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে, আর মানুষটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। সেই রাগ রাগ মারকাটারি ভাবটা হারিয়ে গিয়ে হঠাৎ করেই ক্যামন যেন একেবারে মিইয়ে গেল সে। লোকটা যে আর কেউ নয়, স্বয়ং প্রবাল স্যার। অঙ্ক-পাগল মানুষটা একসময় তাকে অঙ্ক শেখানোর জন্যে কী চেষ্টাই না করেছিলেন। ভূতনাথ শেখেনি অবশ্য কিছুই। শেখার ইচ্ছেও বড় একটা ছিলনা তার। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যা হবার তাই হল, অঙ্কে ডাহা ফেল। পড়াশুনো বেশিদূর এগোয়নি আর ভূতনাথের। রুজি-রুটির চেষ্টাতেও তেমন একটা সুবিধা হল না। পথে পথে কাজ খুঁজে বেড়াতো সে মাসের পর মাস। তারপর একদিন বাসের ধাক্কায়—

আজ প্রবাল স্যারকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ভারী লজ্জা লাগছিল তার। ছোটবেলায় মানুষটার কথা শুনলে বেঁচে থাকাটা হয়তো অন্যরকম হতে পারত। এই সময়েই প্রবালবাবুর নজর পড়ল তার দিকে। চোখ সরু করে একটুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন ভূতনাথের দিকে। তারপর বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুই পুবপাড়ার ভূতনাথ না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিনীতভাবে জবাব দেয় ভূতনাথ।

'তুই না সেই বাসের ধাক্কায়—' চোখ গোল গোল করে বলে ওঠেন প্রবাল স্যার।

'হ্যাঁ স্যার। বছর সাতেক হল প্রায়।' মাথা নীচু করে বলে ভূতনাথ।

'হ্যাঁ তা তো হবেই, আনমনে বলেন প্রবাল স্যার, 'শুনে মনটা বড্ড খারাপ হয়েছিল রে,' গাঢ় গলায় বলে চলেন তিনি। 'আজ এতদিন পরে তোকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে যে কী ভালো লাগছে, আসলে শুধুই তো ছাত্র নোস, তোরা তো আমার সন্তানও—'

এমন হবার কথা নয়, তবু আজ বুকের ভেতরটায় ক্যামন যেন তোলপাড় হচ্ছিল ভূতনাথের। এতদিন মানুষকে ভয় দেখিয়ে আনন্দ পেত সে, আজ যেন তার মানুষকে বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করল। অদ্ভুতভাবেই, প্রবাল স্যার তাকে দেখেও যে ভয় পেলেন না এতে ভারি স্বস্তিবোধ করল সে।

আত্মারাম এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিল সবকিছু। এবার বলে উঠল নীচুগলায়, 'ভূতনাথদা, তুমি কি আমাকে খুঁজতে এসেছিলে এখানে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ে ভূতনাথ, 'কিন্তু এখানে এসে কী যে হল, তোকে নিয়ে যাবার কথা মনেই ছিল না আর—' লাজুক গলায় বলে ভূতনাথ।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে আত্মারাম। তারপর আব্দেরে গলায় বলে, 'আমার যে আর ফিরে যেতে ইচ্ছেই করছে না ভূতনাথদা—'

'আমারও—'

'তাহলে চলো না এখানেই স্যারের সঙ্গে থেকে যাই আমরা। তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করি একসঙ্গে, পড়াশোনা শিখি—'

'সত্যি থাকবি?' উজ্জ্বল মুখে বলে ওঠেন প্রবাল স্যার, মানুষগুলোকে কত খোশামোদ করলাম। কাজ তো তেমন হল না। শুধু মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে আয় বরং ভূতে-মানুষে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে কাজ করি। তাক লাগিয়ে দিই সকলকে। একদম নতুন একটা জগৎ গড়ে তুলব সবাই মিলে। কী রে রাজি?'

আত্মারাম বলল, 'রাজি।'

ভূতনাথ বলল, 'রাজি।'

পুরো ভুবনপুর জুড়েই হই চই পড়ে গেছে এখন। যারা আগে প্রবাল স্যারকে পাগলস্যার বলত, তারা এখন তাঁকে দেখলে নিজে থেকে এসে কথা বলে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পথে-ঘাটে। প্রথম প্রথম খবর রটেছিল গাঁয়ের লোককে না পেয়ে ভিন গাঁ থেকে লোক এনে রাস্তা ঘাট পুকুর আগাছা সাফ-সুতরো করাচ্ছেন প্রবাল-স্যার। প্রথমটা গা না করলেও ক্রমশ সকলেরই মনে হল যে কাজগুলো মন্দ তো নয়ই, বরং জরুরি। তাছাড়া চক্ষুলজ্জা বলেও একটা বস্তু আছে। কাজেই একজন দু'জন করে ক্রমশই তাঁর সহযোগী বাড়তে লাগল। এখন গ্রামের সকলেই এ ব্যাপারে স্বতস্ফূর্ত। একথাও অজানা নয় যে গ্রামের লোকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে অচেনা লোকগুলো কাজ করে নিত্যদিন তাদের বেশিরভাগই মানুষ নয়। বুড়ো চৌকিদার রামপদর খবর অনুযায়ী সপ্তায় অন্তত তিনদিন রাতদুপুরে প্রবালস্যার গ্রামের ও প্রান্তের জঙ্গলে ভূতেদের ইস্কুলে নাকি পড়াতে যান। সন্ধের পর দু-চারটে ছেলে ছোকরা ভূত আজকাল তাঁর কাছে অঙ্কের টিউশন নিতে আসে। বিনা বেতনে তিনি অঙ্ক শেখান তাদের। এমনকী ভুবনপুরের স্কুল পড়ুয়ারাও তাঁকে আর তেমন ভয়-টয় পাচ্ছে না। পাটিগণিতের সুদকষা কিংবা বীজগণিতের ফ্যাক্টর অথবা জ্যামিতির এক্সট্রা আটকালে তারাও আজকাল ছুটছে প্রবাল স্যারের কাছেই।



Table of Contents

Half Title Page	1
Title Page	2
Copyright Page	3
Dedication Page	4
লেখকের অন্য বই	5
শুরুর আগে	6
সূচিপত্র	7
চরণদাস	9
অঙ্কের ভূত	16
শেষ রাতের ট্রেন	23
বংশীবটতলার ওদিকে	33
হরেন সমাদ্দারের ম্যাজিক	41
ব্যবসায়ী বিপুলবাবু	50
পানু তান্ত্রিকের প্রায়শ্চিত্ত	61
জিতেন হেমব্রমের কলম	70
লাস্ট মিনিট সাজেশন	79
টমটম বাবার পাঠশালা	88
মাধো সর্দারের শেষ ডাকাতি	101
অশরীরী প্রহরী	112
ভূতবাবার মেলায়	118
নারায়ণগঞ্জে দু'রাত	126
হারায় না কিচ্ছুটি	137
একটু অন্তত ভয় পাওয়ান	149
নগেন গোঁসায়ের নিদান	158
ডায়মন্ডহারবার লোকালের সেই লোকটি	167
নতুন আনা রেডিও	173
অন্য ভূতের গল্প	184